শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৯ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ও তাফসীর ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা অনেকাংশে সহজ হলেও আরবী ভাষায় কম অভিজ্ঞ লোকদের সরাসরি শব্দে শব্দে অর্থ বুঝার মত অনুবাদের অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে সূরা আল ফাতিহা থেকে আলে ইমরান পর্যন্ত প্রথম ও শেষ পারা ১০ম খন্ড হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এখন ৯ম খন্ডও প্রকাশিত হচ্ছে- আলহামদুলিল্লাহ। তবে শব্দার্থ দ্বারা অনেক সময় মুল বক্তব্য জানা সম্ভব হয় না তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ)-এর তরজমা-এ-কুরআন থেকে নামকরণ, ভাবার্থ, শানেনুযূল, বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোগ করা হয়েছে। যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ চয়নের ক্ষেত্রে আমি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সীরগণের গ্রহণীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। এক্ষেত্রে শাহ্‌ রফিউদ্দিন দেহলভী (রঃ) এর শাব্দিক অনুবাদ (উর্দু) তফসীর মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত আল কুরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ)-এর তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ), মক্কাশরীফে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর **Vocabulary of the Holy Quran** (আরবী-ইংরেজী) তাফসিরে জালালাইন ও মিশরের প্রখ্যাত মুফতি হাসানাইন মুহাম্মদ মখলুদের 'কালিমাতুল কুরআন'-এর সহযোগিতা নিয়েছি। এ সত্বেও কোন ক্রটি যদি কোন গবেষকের সামনে ধরা পড়ে তা অনুবাদককে অবহিত করতে অনুরোধ রইল। বিদেশে অবস্থানের কারণে মুদ্রণ জনিত ক্রটিও রয়ে গিয়েছে। আগামীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বঙ্গানুবাদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে বাংলা শব্দার্থগুলোকে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে পড়ার পরিবর্তে আরবী শব্দের নীচে দেয়া বাংলা শব্দার্থ ও আয়াতগুলোর দেয়া ভাবার্থ পড়তে হবে। এভাবে শব্দার্থ ও ভাবার্থ বুঝে কিছুদুর অধ্যয়ন করতে পারলে পরবর্তীতে কুরআনের বাকী অংশের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এর পরও পূর্ণ কুরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্যে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সহযোগিতা নেয়াই উত্তম হবে।

এ কাজে জনাব মাওলানা সাঈদুর রহমান সাহেব সহ বেশ কিছু সংখ্যক সাথী ভাইয়ের সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি।

সব শেষে এ কাজে যা কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার এ ক্ষুদ্র মেহনত যাতে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন তার জন্য তারই দরগায় কাতরভাবে মোনাজাত করছি।

মতিউর রহমান খান

খুলনা

রবিউসসানি ১৪১৩ হি'

অক্টোবর ১৯৯২ইং

সূচীপত্র

সূরা আল–হাশর

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতের অংশ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ
এর 'হাশর' শব্দটিকে এ সূরা'র নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ এমন সূরা যাতে 'আল–হাশর' শব্দটি রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস–গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা হয়েছেঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর নিকট সূরা 'হাশর' সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ এ বনু–নযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল সূরা 'আনফাল।' হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের অপর একটি বর্ণনায়, ইবনে আব্বাসের এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ

অর্থাৎ–সূরা হাশর না বলে বল ঃ 'সূরা নযীর'। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়দ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপই বর্ণনা করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হ'ল এইঃ এ সূরায় যে–আহলি–কিতাব লোকদের বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা বনু–নযীর সম্পর্কেই বলা হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাকের বক্তব্য হ'ল ঃ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই গোটা সূরাটিই বনু–নযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বনু–নযীরের এ যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছে? ইমাম যুহরী এ প্রসংগে ওরওয়া ইবনে যুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ বদর যুদ্ধের ছ'মাস পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু ইবনে সা'আদ, ইবনে হিশাম ও বালাযুরীর বর্ণনায় এ ৪র্থ হিজরীর রবিউল–আউআল মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এটাই ঠিক। কেননা সর্ববর্ণনাই এ ব্যাপারে একমত যে, বীরে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনার পর এ ঘটেছিল। আর বীরে মা'উনার ঘটনা যে বদর যুদ্ধের পরেই সংঘটিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রমাণিত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরায় আলোচিত বিষয়–বস্তু ভালোভাবে বুঝবার জন্যে মদীনা ও হেজাযের ইহুদীদের ইতিহাস সম্পর্কিত সম্যক তথ্য সামনে রাখা আবশ্যক। কেননা, এ ছাড়া ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তার প্রকৃত কারণ জেনে নেয়া সম্ভব নয়। আরবের ইহুদীদের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তাদের অতীত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোকপাত করতে পারে এমন কোন রচনা তারা কোন কিতাব কিংবা শিলালিপিরূপেও রেখে যায় নি। আর আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক ও গ্রন্থপ্রণেতাগণও আরব দেশের ইহুদীদের সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করে নি। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, এ ইহুদীরা আরব উপদ্বীপে আসার পর তাদের স্বজাতির অন্যান্য লোকদের হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুনিয়ার অন্যান্য ইহুদীরা তাদেরকে নিজেদের সমাজের ও স্বজাতির লোক বলে মনেই করতো না। কেননা তারা ইবরীয় সভ্যতা, ভাষা এমনকি নামকরণও পরিহার করে সর্বক্ষেত্রে আরবতত্ত্ব গ্রহণ করে বসেছিল। হেজাযের প্রত্নতত্ত্ব পর্যায়ে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে আরব দেশে ইহুদীদের কোন নামচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ সময়ও মাত্র কয়েকটি ইহুদী নামই পাওয়া যায়। এ কারণে আরব–বাসীদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত বর্ণনাসমূহের ওপরই আরব দেশীয় ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ অংশ নির্ভরশীল। এরও অধিকাংশ বর্ণনা স্বয়ং ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত। হেজাযের ইহুদীদের দাবী ছিল–তারা সর্বপ্রথম হযরত মূসা'র জীবনকালের শেষ অধ্যায়ে এ দেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে তারা বলতো হযরত মূসা (আঃ) ইয়াসরিব অঞ্চল হতে আমালিকাদেরকে বহিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এ জাতির একটা লোককেও যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলীয় এ সৈন্য বাহিনী এখানে এসে নবীর আদেশকে বাস্তবায়িত করে। কিন্তু আমালিকা–

বাদশাহর একটি পুত্র ছিল খুবই সুশ্রী-সুদর্শন। তাকে তারা মারলো না, জীবিত রেখে দিল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে তারা ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এ সময় হযরত মূসা'র ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্তরা তাদের প্রতি খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ ও মূসা প্রদত্ত শরীঅতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা ও অমান্যতার অপরাধ। এ কারণে তাঁরা এ বাহিনীর লোকদেরকে নিজেদের জামা'আত হতে বের করে দিলেন। ফলে তারা ইয়াসরিব প্রত্যাবর্তন করতে ও এখানেই বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। (-কিতাবুল-আগানী ১৯ খন্ড, ৯৪ পৃষ্টা ঃ)। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরবের ইহুদীদের দাবী ছিল – তারা খৃষ্টপূর্ব চারশ' বছর হতে এদেশের বাসিন্দা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ এ কাহিনী তারা মনগড়াভাবে প্রচার করে দিয়েছিল, যেন আরবদের তুলনায় নিজেদেরকে প্রাচীন বংশজাত ও উচ্চতর বংশসম্ভূত প্রমাণ করে অন্যান্য সকলের ওপর নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে পারে।

এদেশে ইহুদীদের আগমন আরও একবার সংঘটিত হয়। স্বয়ং ইহুদীদের দাবী অনুযায়ী তা খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনের কথা। বেবিলনের সম্রাট বখ্‌তানাসার বায়তুল মাক্‌দিসকে ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, এ সময় আমাদের অনেক কবীলা এসে আরবের ওয়াদিউল কুরা, তাইমা ও ইয়াসরিবে পুনর্বাসিত হয়েছিল। (ফুতুহুল বুলদান- বালাদরী। কিন্তু এরও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এরূপ কাহিনী প্রচার করেও যে তারা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল তা মনে করা কিছুমাত্র অমূলক নয়।

বস্তুতঃ এ পর্যায়ে যে কথাটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা হ'ল ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করেছিল এবং পরে ১৩২ খৃষ্টাব্দে তাদেরকে এ ভূখন্ড হতে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত করেছিল সে সময় অসংখ্য ইহুদী গোত্র হেজায অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কেননা এ অঞ্চলটি ফিলিস্তিন হতে দক্ষিণ দিকে অতি নিকটেই অবস্থিত। এখানে এসে তারা যেখানে যেখানে পানির সঞ্চয় ও শস্য-শ্যামল বনভূমি ছিল সে সব স্থানেই অবস্থান করেছিল। পরে তারা নানা কৌশল ও ষড়যন্ত্র করে এবং সূদী কারবারের সুযোগে এ সব স্থানের ওপর স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। আইলা, মাক্‌না, তাবুক, তাইমা, ওয়াদিউল-কুরা, পাদাক ও খায়বার-এর ওপর তাদের আধিপত্য এ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর বনুকুরাইজা, বনু-নযীর, বনু বাহদল ও বনু কাইনুকা প্রভৃতি গোত্রগুলিও এ সময়ই এসে ইয়াসরিব এলাকা দখল করে বসে।

ইয়াসরিব এলাকায় বসবাস গ্রহণকারী গোত্রসমূহের মধ্যে বনু নযীর ও বনু কুরাইজা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল। কেননা তারা পুরোহিত বা গণকঠাকুর (Priests or Cohens) শ্রেণীর লোক ছিল। ইহুদীদের সমাজে তাদেরকে উচ্চ বংশজাত মনে করা হ'ত। তাদের নিজস্ব সমাজের ওপর ধর্ম-আত্মীয় কর্তৃত্ব তাদের করায়ত্ত ছিল। এরা যখন মদীনায় (ইয়াসরিব) এসে বসবাস শুরু করেছিল, তখন তথায় অন্যান্য কয়েকটি আরব গোত্রও বাস করতো। ইহুদীরা তাদেরকে নিজেদের অধীন বানিয়ে নিয়েছিল এবং কার্যত তারাই সে শস্য-শ্যামল সবুজ শোভাকাঙ্খিত অঞ্চলের মালিক হয়ে বসেছিল। এর প্রায় তিনশ' বৎসর পর ৪৫০ কিংবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেনের সেই মহা-প্লাবনের ঘটনা সংঘটিত হয় যার উল্লেখ সূরা 'সাবা'র দ্বিতীয় রুকূ'তে করা হয়েছে। এ প্লাবনের কারণে 'সাবা জাতির বিভিন্ন গোত্র ইয়েমেন হতে বের হয়ে আরবের বিস্তীর্ণ' অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। গ্যাস্‌সানীরা সিরিয়ায়, লাখ্‌মীরা হীরায় (ইরাকে), বনু খুজায়া জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে এবং আওস ও খাজরাজরা ইয়াসরিবে বসবাস করতে থাকে। ইয়াসরিবে যেহেতু ইহুদীরা আগে হতেই প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে রেখেছিল, সে কারণে তারা প্রথম দিক দিয়ে আওস ও খাজরাজকে নিজেদের কর্তৃত্ব চালাবার কোন সুযোগ দিল না। ফলে এ দুটি আরব গোত্র-ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক- অনুর্বর ও বন্ধ্যা জমির ওপর আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। সেখানে তাদেরকে জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খুব কষ্টের সঙ্গেই সংগ্রহ করতে হ'ত। শেষ পর্যন্ত তাদের গোত্র-সরদারদের মধ্য হতে একজন গ্যাস্‌সনী, ভাইদের নিকট সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করলো এবং সেখান হতে একটি সৈন্য বাহিনী ডেকে এনে ইহুদীদের শক্তি কিছুটা খর্ব করে দিল। এবং এভাবে ইয়াসরিবের আওস ও খাজরাজের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হ'ল। ফলে বনু নজীর ও বনু কুরাইজা- ইহুদীদের এ দুটি বড় গোত্রকে শহরের বাইরে গিয়ে বসবাস গ্রহণ করতে বাধ্য করা হ'ল। তৃতীয় গোত্রের নাম ছিল বনু-কাইনুকা। এদের ছিল উপরোক্ত দু'টি গোত্রের সাথে ভয়ানক অমিল ও মনোমালিন্য। এ কারণে এরা শহরের মধ্যেই অবস্থান করতে লাগলো। কিন্তু শহর-ভ্যন্তরে বসবাস করার জন্য খাজরাজ গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'ল। এর বিরুদ্ধে বনু নজীর ও বনু কুরাইজাকে আওস গোত্রের আশ্রয় নিতে হ'ল- যেন ইয়াসরিবের উপকণ্ঠে তারা নিরাপদে

বসবাস করতে পারে। নবী করীমের (সঃ) মদীনা আগমনের পূর্বে হিজরতের শুরু সময় পর্যন্ত সাধারণ ভাবে হেজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবের ইহুদীদের মোটামুটি পরিচয় নিম্নরূপ ছিল ঃ

– ভাষা, পোশাক–পরিচ্ছদ ও সভ্যতা–সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা পুরোপুরিভাবে আরবীয় ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। এমনকি, তাদের অধিকাংশের–ই নামকরণও আরবী হয়ে গিয়েছিল। হেজাযে যে ১২টি ইহুদী গোত্র বসতী স্থাপন করেছিল তন্মধ্যে বনু জায়ুরা ব্যতীত অন্য কোন গোত্রের নাম ইবরীয় ভাষায় রাখা হ'ত না। তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আলেম ছাড়া ইবরানী ভাষা আর কেউ জানতও না। জাহেলিয়াতের যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্য–গাথা পাওয়া যায়, তার ভাষা, বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা আরব কবিদের কাব্য–গাথা হতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। তাতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যার দৌলতে তারা স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তাদের ও আরবদের মাঝে বিবাহ–শাদীর সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুতঃ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে তাদের ও সাধারণ আরবদের মাঝে কোন পার্থক্যই ছিল না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়নি। তারা কঠোর সতর্কতা ও যত্ন সহকারে নিজেদের ইহুদী আত্মাভিমানকে অক্ষুন্ন রেখেছিল। বাহ্যতঃ আরবত্ব তারা গ্রহণ করেছিল কেবলমাত্র এ জন্যে যে, তা না করলে তারা আরবদের মধ্যে তিষ্টিতেই পারতো না।

– তাদের এ আরবত্ব গ্রহণের ফলে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা মস্তবড় ভুল বোঝা–বুঝির মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এরা বুঝি বনী–ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তারা মনে করেছেন, এরা বুঝি ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব ছিল, কিংবা অন্ততঃ তাদের অধিকাংশই বুঝি আরব–ইহুদী ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যে হেজাযে কখনও ধর্ম প্রচারমুলক কাজ করেছে, অথবা তাদের ধর্ম পন্ডিতরা খৃষ্টান পাদ্রী ও মিশনারীদের ন্যায় আরবদেরকে কখনও ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার আহবান দিয়েছে তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে আমরা দেখছি, তাদের মধ্যে ইসরাঈলী হওয়ার তীব্র আত্মাভিমান এবং বংশীয় অহংকার ও গৌরববোধ প্রচন্ডভাবে বর্তমান ছিল। আরবদেরকে তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলতো। এর অর্থ কেবল 'পড়া–লেখাহীন'ই নয় বর্বর ও মূর্খও। তাদের বিশ্বাস ছিল, ইসরাঈলীদের যে মানবীয় অধিকার আছে তা এদের নেই। এদের ধন–মান বৈধ–অবৈধ যে কোন উপায়ে কেড়ে নেয়া, ভোগ করা ইসরাঈলীদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র। তারা আরব সরদারদের ছাড়া সাধারণ আরবলোকদেরকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ক'রে তাদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার যোগ্য আদৌ মনে করতো না। কোন আরব গোত্র কিংবা বড় কোন আরব বংশ যে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে ইতিহাসে তার না কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, না আরব প্রচলনের মধ্যে এমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কতিপয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যে ইহুদী হয়েছিল, তার উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায়। আর আসলেও ধর্ম প্রচার অপেক্ষা নিজেদের কাজ–কারবারের দিকেই ইহুদীদের সর্বাধিক লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। এ কারণে হেজাযে ইহুদীবাদ একটা ধর্ম হিসাবে কখনো বিস্তার লাভ করেনি। তা কতিপয় ইস্রাঈলী গোত্রের গৌরব ও আত্মাভিমান প্রকাশের মূলধন হয়েছে। তবে ইহুদী আলেমরা দো'আতাবীজ–তুমার, ফাল লওয়া ও যাদুর কারবারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও আমলের একটা প্রতাপ বর্তমান ছিল।

–অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত মজবুত ছিল। যেহেতু তারা ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য এলাকা হতে এখানে এসেছিল, এ কারণে তারা এমন সব শিল্প বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন ছিল, যা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বাইরের জগতের সংগে তাদের ব্যবসায়ী সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। এ সব কারণে ইয়াসরিব ও হেজাযের উত্তর অঞ্চলে শস্য আমদানি এবং এখান হতে খেজুর রফতানি করার বাণিজ্য তাদেরই করায়ত্ব হয়েছিল। মোরগ পালন ও মাংস শিকারের ক্ষেত্রেও তাদের প্রাধান্য ছিল। বয়ন শিল্পের কাজও কেবল তারাই করতো। স্থানে স্থানে মদ্যপানের আড্ডাও তারাই বসিয়েছিল। সে সব কেন্দ্রে তারা সিরিয়া হতে মদ্য আমদানি করে বিক্রয় করতো। বনু কায়নূকা গোত্রের লোকেরা বেশীর ভাগই স্বর্ণকার, কামার ও তৈজসপত্র নির্মাণকারী ছিল। এ সমস্ত কাজ–কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক পরিমাণে মুনাফা লুট করতো। কিন্তু তাদের সর্বাপেক্ষা বড় কারবার ছিল সুদখুরীর। চারপার্শ্বের সমস্ত আরব জনতাকে তারা সুদী কারবারের জালে জড়িয়ে ফেলেছিল।

বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের সরদার ও শেখরা–এ জালে ফেঁসে গিয়েছিল, কেননা কর্জ নিয়ে বিলাসিতা ও জাঁকজ'মক করার রোগে এরা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে মোটা হারের সুদে কর্জ দেয়া হত এবং সূদের–চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য হ'ত। অবস্থা এমন ছিল যে, এর জালে একবার কেউ জড়িয়ে পড়লে তা হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হ'ত না। এভাবে ইহুদীরা আরবদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশুন্য করে

ফেলেছিল। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এ ছিল যে, সাধারণভাবে আরবদের মনে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন তীব্রভাবে জ্বলছিল।

–আরবদের মধ্যে কারও বন্ধু হয়ে অপর কারও সঙ্গে অমিল ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি না করা এবং আরবদের পারস্পরিক লড়াই–ঝড়গায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থানুকূল নীতি। অন্যদিকে এও তাদের স্বার্থানাকূল ছিল যে, তারা আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিবে না বরং তাদেরকে পারস্পরিক লড়াই–ঝগড়ায় লিপ্ত রাখবে। কেননা তারা জানতো যে, আরবগোত্রগুলি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হলেই তারা মুনাফাখুরী ও সুদখুরী করে যে বিপুল সম্পদ–সম্পত্তি, বাগ–বাগিচা ও শস্য–শ্যামল জমি–জায়গা করায়ত্ত করেছে, তা হতে তাদেরকে উৎখাত হতে হবে। উপরন্তু নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাদের প্রত্যেক গোত্রকে কোন–না–কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কও স্থাপন করতে হবে– যেন অপর কোন পরাক্রমশালী গোত্র তাদের ওপর কোনরূপ আক্রমণ চালাতে না পারে। এ কারণে তারা আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক লড়াই ঝগড়ায় বারংবার যে কেবল অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তাই নয়, অনেক সময় তাদের এক ইহুদী গোত্রকে স্বীয় মিত্র আরব–গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপর এক ইহুদী গোত্রের সঙ্গেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কেননা সেই ইহুদী গোত্রটি অপর এক আরবগোত্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিয়েছিল ও সে কারণে উক্ত মিত্র আরব গোত্রের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিল। ইয়াসরিবে বনু কুরাইজা ও বনু নযীর 'আওস্' গোত্রের মিত্র ছিল। আর বনু কাইনুকা ছিল খাজরাজের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'আওস' ও খাজরাজের মধ্যে 'বুয়াস' নামক স্থানে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়েছিল, তাতে এ ইহুদীরা নিজ নিজ মিত্র গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুগোত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল।

এরূপ অবস্থার মধ্যে মদীনায় ইসলাম উপস্থিত হ'ল। শেষ পর্যন্ত তথায় নবী করীমের (সঃ) আগমনের ফলে ও তার পরে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজ করলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, আওস ও খাজরাজ এবং মুহাজিরদের সমন্বয়ে একটি ভ্রাতৃসংঘ রচনা করলেন। আর দ্বিতীয় ছিল এই যে, এই মুসলিম সমাজ ও ইহুদীদের মধ্যে সুস্পষ্ট শর্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন। তাতে পরিষ্কার ভাষায় লিখে দিলেন যে, কেউই অপর কারও অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। আর বহিঃশত্রুর মুকাবিলায় এরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে, প্রতিরক্ষামূলক কাজে নিযুক্ত হবে। এগুলিই হ'ল এ চুক্তি নামার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ হতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইহুদী ও মুসলমানরা পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم- وان بينهم النصر على من حارب اهل هذا الصحيفه
وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم- وانه لم يأثم امرؤ بحليفه' وان النصر للمظلوم' وان
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين' وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفه....
وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل
والى محمد رسول الله..... وانه لا تجار قريش ولا من نصرها' وان بينهم النصر على من دهم يثرب
على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم (ابن هشام- ج ٢ ص ١٤٧ - ١٥٠)

- ইহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে, আর মুসলমানরা নিজেদের।
- এ চুক্তির অংশীদাররা আক্রমণকারীর মুকাবিলায় পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।
- তারা নিষ্ঠা ও ঐক্যান্তিকতা সহকারে পরস্পরের কল্যাণ ও মংগল কামনা করবে। তাদের মধ্যে কল্যাণ ও অধিকার পৌঁছে দেয়ার সম্পর্ক থাকবে, গুনাহ ও সীমালংঘনমূলক কাজের সম্পর্ক থাকবে না।
- কেউ নিজের মিত্রের সংগে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করবে না।
- মযলুম-নির্যাতিত ও অত্যাচারিতের সাহায্য করতে হবে।
- যুদ্ধ চলতে থাকা পর্যন্ত ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে তার ব্যয়-ভার বহন করবে।
- এ চুক্তির অংশীদারদের প্রত্যেকেরই পক্ষে ইয়াসরিবে কোন প্রকারের অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের পরস্পরের মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া বা মতবিরোধের সৃষ্টি হয় যাতে কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হতে পারে, তা হলে তার মীমাংসা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুহাম্মদ (সঃ) করবেন।
- কুরাইশ ও তাদের মিত্র সাহায্যকারীদের কিছু মাত্র প্রশ্রয় দেয়া হবে না।
- ইয়াসরিবের ওপর যেই আক্রমণ করবে, তার মুকাবিলায় চুক্তি-স্বাক্ষর কারীরা পরস্পরের সাহায্য করবে। প্রত্যেক পক্ষ নিজের দিকের প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে।

বস্তুতঃ এ এক সুস্পষ্ট ও অকাট্য চুক্তিনামা ছিল। এর শর্তাবলী ইহুদীরা নিজেরা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু খুব বেশী দিন যেতে না যেতেই তারা নবী করীম (সঃ), ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করে দিল। তাদের এ শত্রুতা উত্তরোত্তর তীব্র ও প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করলো। এর মূলে তিনটি বড় বড় কারণ নিহিত ছিল :-

একটি এই যে, তারা নবী করীম (সঃ) কে নিছক একজন 'নরপতি' রূপেই দেখতে চেয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক চুক্তি করেই ক্ষান্ত হবেন এবং নিজের লোকজনের কেবল বৈষয়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যেই ব্যস্ত থাকবেন, এই ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি তো আল্লাহ, পরকাল, নবুয়্যত-রিসালাত ও খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতেছেন (এতে অবশ্য স্বয়ং তাদের নিজেদের নবী-রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দা'ওয়াত-ও শামিল রয়েছে- এবং গুনাহ-নাফরমানী পরিত্যাগ করে খোদার সেইসব আইন-বিধান' পালন করার ও সেইসব নৈতিক সীমা রক্ষার বাধ্যবাধকতা গ্রহণের দা'ওয়াত দিচ্ছেন- যেগুলির দিকে স্বয়ং তাদের নবী-রসূলগণ-ও নিজ নিজ যুগে দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাতেন। কিন্তু এ জিনিসই ছিল তাদের পক্ষে অসহনীয়। তাঁরা আশংকাবোধ করলো যে, এ বিশ্বজনীন (universal) আদর্শভিত্তিক আন্দোলন যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে তার প্রচন্ড গতিবেগ তাদের বন্ধ্যা-ধার্মিকতা ও তাদের বংশভিত্তিক জাতীয়তাকে তৃণখন্ডের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় এই যে, আওস, খাজরাজ ও মুহাজিরদেরকে পরস্পরের ভাই হতে দেখে এবং আশে-পাশের আরব গোত্রসমূহ হতে যারাই ইসলাম কবুল করে তারাও যে মদীনার এই ইসলামী ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে একই মিল্লাতের শরীক হয়ে যাচ্ছে তা দেখে তাদের ভয় হ'ল যে, নিজদের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ভাঙ্গন ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সাধনের যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে, এ নূতন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা বোধ হয় আর চলতে পারবে না। এখন বরং তাদেরকে আরবদের এক সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হতে হবে। এ শক্তির মুকাবিলায় তাদের হীন অপকৌশল আর চলতে পারবে না।

তৃতীয় এই যে, নবী করীম (সঃ) সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যে সংশোধনী কার্য পরিচালনা করছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যাবতীয় অবৈধ উপায় বন্ধ করে দেয়া একটি বিশেষ লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। সর্বোপরি, সুদকে তিনি না-পাক উপার্জন ও হারামখুরী বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের ভয় ছিল, আরব জনগণ যদি নবী করীমের (সঃ) নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয় তাহলে তিনি তো সুদকে আইনের বলে বন্ধ করে দিবেন। আর তাতে তাদের (ইহুদীদের) অর্থনৈতিক মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত।

এসব করণে নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা করাকে তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়ার জন্য সম্ভাব্য কোন কৌশল, ষড়যন্ত্র বা উপায় অবলম্বনে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা প্রচার করে বেড়াত। সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ুক, এই ছিল তাদের বাসনা। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে তারা নানা রকমের সন্দেহ ও ভুল ধারনার সৃষ্টি করতো, যেন তারা দ্বীন-ইসলামই ত্যাগ করতে প্রবৃত্ত হয়। নিজেরা মিথ্যা-মিথ্যি ইসলাম কবুল করে 'মুর্তাদ'- ইসলাম ত্যাগকারী হয়ে যেত, যেন লোকদের মনে রসূলে করীম (সঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বেশী বেশী ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। নানারূপ সামাজিক অশান্তি ও দুর্যোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা মুনাফিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিনরাত ষড়যন্ত্র করতো। ইসলামের শত্রু,বিরুদ্ধবাদী প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গোত্রের সঙ্গে তাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি এবং তাদেরকে আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত করা এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে তারা প্রাণপণে চেষ্টা চালাত। আওস ও খাজরাজের লোকেরা এ দিক দিয়ে তাদের বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল; কেননা, তাদের সঙ্গে তাদের অনেক পুরাতন সম্পর্ক ছিল। তারা 'বুয়াস' যুদ্ধের তিক্ত ও মর্মান্তিক স্মৃতি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের পুরাতন শত্রুতার আগুন নতুন করে জ্বালাবার চেষ্টা করতো- যেন তাদের মধ্যে আবার অস্ত্র ঝনঝন করে ওঠে এবং ইসলামের নতুন বন্ধনে বাঁধা ভ্রাতৃত্ব যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতেও তারা নানারূপ ছলচাতুরী গ্রহণ করতো। যাদের সঙ্গে তাদের পুরাতন লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল তাদের কেউ ইসলাম কবুল করলে তার ক্ষতি সাধনে লেগে যেত। কারও নিকট কিছু পাওনা থাকলে সেজন্যে তাকাদার পর তাকাদা করে তাকে উত্যক্ত করে তুলতো। কারও নিকট কিছু দেনা থাকলে তা বেমালুম হজম করে ফেলতো। প্রকাশ্যভাবে বলে বেড়াত- তোমার সংগে যখন কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্য। এখন তুমি তোমার ধর্মই বদলে ফেলেছ, কাজেই এখন আমাদের ওপর তোমার কোন দাবীই চলতে পারে না। তফসীরে তাবারী, তফসীরে নীসাপুরী, তফসীরে তাবরুসী ও তফসীরে রুহুল মা'আনীতে সূরা আলে-ইমরানের ৭৫ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে।

বস্তুতঃ ইহুদীদের এ সব তৎপরতা স্বাক্ষরিত-চুক্তিনামার স্পষ্ট বিরোধী ছিল এবং বদর যুদ্ধের পূর্ব হতেই তারা এ আচরণ ও তৎপরতা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যখন নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানগণ সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলেন, তখন তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন তাদের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ; কেননা, কুরাইশদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসার ফলে মুসলিম শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের বড় আশা ও মনের ঐকান্তিক কামনা। এ কারণে তারা ইসলামের বিজয় লাভের খবর পৌছার পূর্বেই মদীনায় এ গুজব ছড়িয়ে দিল যে, রসূলে করীম (সঃ) শহীদ হয়েছেন এবং মুসলিম বাহিনী চরম পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর এক্ষণে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত ফলাফল যখন তাদের আশা-আকাঙ্খার সম্পূর্ণ বিপরীত হতে দেখা গেল, তখন ক্রোধ ও আক্রোশে তাদের বুকটা যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হ'ল। বনু-নজীর গোত্রের সরদার কায়াব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলে উঠলো : 'খোদার শপথ, মুহাম্মদ যদি আরব দেশের এই অভিজাত ও সরদার লোকদের হত্যা করেই থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য ভূগর্ভ ভূপৃষ্ঠ হতে উত্তম।' পরে সে মক্কায় উপনীত হ'ল এবং বদরে নিহত কুরাইশ সরদারদের নামে অতীব উত্তেজনাপূর্ণ মর্সীয়া গাথা গেয়ে মক্কাবাসীদের এর প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলো। এর পর মদীনায় ফিরে এসে নিজেদের মনের ঝাল মেটাবার জন্যে এমন সব গজল গাথা গেয়ে শুনাতে লাগল যাতে (অহেতুক) মুসলিম বধু-কন্যাদের সঙ্গে প্রকাশ্য প্রেম নিবেদনের কথাও বলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার দুষ্কৃতিতে অতিষ্ঠ হয়ে নবী করীম (সঃ) ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে দিলেন (ইবনে সায়াদ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

ইহুদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গোত্রটি বদর যুদ্ধের পরে সমষ্টিগতভাবে মৈত্রী চুক্তি ভংগ করেছিল, তারা ছিল বনুকাইনুকা এই লোকেরা মদীনা শহরেরই একটি মহল্লায় বসবাস করতো। তারা ছিল স্বর্ণকার, কামার এবং তৈজসপত্র নির্মাতা। এই কারণে তাদের বাজারে মদীনার লোকদেরকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হ'ত। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তাদের মনে খুবই গৌরব বোধ জাগরুক ছিল। কামার ও লৌহকার হওয়ার কারণে তাদের প্রত্যেকটি মানুষ ছিল সশস্ত্র। সাত শ' সামরিক পুরুষ তাদের মধ্যে ছিল। খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে তাদের পুরাতন মৈত্রী বন্ধন থাকা এবং খাজরাজ সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণেও তাদের কম গৌরব ছিল না। বদরের

ঘটনায় এরা এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়া এবং বিশেষ করে তাদের স্ত্রীলোকদেরকে সর্বসাধারণের সমক্ষে টানাটানি করা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমশঃ অবস্থার এতটা পতন ঘটলো যে, তারা একদিন তাদের বাজারে একজন মুসলিম মহিলাকে প্রকাশ্য ভাবে উলংগ করে ফেললো। এ নিয়ে প্রচন্ড ঝগড়ার সৃষ্টি হ'ল এবং সংঘর্ষে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী নিহত হ'ল। অবস্থার এতটা পতন ঘটার কারণে নবী করীম (সঃ) তাদের মহল্লায় উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করে ন্যায়, সত্য ও সততার পথে আসার জন্যে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উত্তরে তারা বললোঃ 'হে মুহাম্মদ,, তুমি হয়ত আমাদেরকেও কুরাইশই মনে করে নিয়েছ? তারা লড়াই করতে জানে না বলে তুমি তাদেরকে মারতে পেরেছ ; আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে পুরুষ কাকে বলে তা আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেব।"

বস্তুতঃ এ ছিল স্পষ্ট ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণা। শেষ পর্যন্ত ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে (কোন কোন বর্ণনা মতে যিলকা'দ মাসে) নবী করীম (সঃ) ইহুদীদের মহল্লা পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করেন। মাত্র পনের দিন পর্যন্ত এ অবরোধ চলতেই তারা অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হ'ল এবং তাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা সম্পন্ন সমস্ত লোকই বন্দী হ'ল। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সমর্থনে মাথা তুলে দাঁড়াল এবং বারবার দাবী জানাতে লাগল, তিনি (নবী) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন। নবী করীম সঃ) তার অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন এই শর্তে যে, বনু কাইনুকা নিজেদের সব মাল-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি রেখে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাবে (ইবনে সায়াদ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)

বনু কাইনুকাদের বহিষ্করণ ও কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা-এ দুটি কঠোর কার্যক্রমের পর কিছু দিন পর্যন্ত ইহুদীরা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে। অতঃপর কোন দুষ্কৃতি করতে তারা সাহস পেলনা। কিন্তু এর পর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যাপক প্রস্তুতি সহকারে মদীনার ওপর চড়াও হ'ল। এ ইহুদীরা দেখতে পেল-কুরাইশদের তিন হাজার সেনা-বাহিনীর মুকাবিলায় রসূলে করীমের (সঃ) মাত্র এক হাজার লোক লড়াই করবার জন্যে ময়দানে নেমেছে। আর তাদের মধ্য হতেও তিন শ' মুনাফিক বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছে। ঠিক এ সময়ই ইহুদীরা প্রথমবার চুক্তিনামার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে যোগদান করলো না, যদিও চুক্তি অনুযায়ী এ করা তাদের কর্তব্য ছিল। পরে ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা যখন কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হলেন তখন ইহুদীদের দুঃসাহস আরও বৃদ্ধি পেল। এমন কি, বনু-নযীর রসূলে করীম (সঃ) কে হত্যা করার জন্যে রীতিমত একটি কঠিন ষড়যন্ত্র করে বসলো, তবে তা যথাসময়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে বীরে মায়ুনা দুর্ঘটনার পর আমর ইবনে উমাইয়া জমীরী প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম হিসাবে ভুলবশতঃ বনুআমের গোষ্ঠীর দু' ব্যক্তিকে হত্যা করে। আসলে এ দুই ব্যক্তি একটা মৈত্রী-চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীর লোক ছিল। কিন্তু আমর তাদেরকে দুশমন গোষ্ঠীর লোক বলে সন্দেহ করেছিল। এ ভুলের কারণে ঐ দুই ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় আদায় করা মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হয়ে পড়লো। আর বনু আমেরের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে বনু-নযীরও শরীক ছিল। এ কারণে রসুলে করীম (সঃ) নিজে কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে তাদের বস্তীতে গমন করলেন। রক্ত বিনিময় আদায়করণে তাদেরকেও শরীক হবার জন্যে আহবান জানানোই উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে তারা নবী করীম (সঃ) কে মন ভুলানো কথাবার্তায় মশগুল করে রাখলো এবং ভেতরে ভেতরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে লেগে গেল। ষড়যন্ত্রটি ছিল এরূপ যে, যে বাড়ীর দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে নবী করীম (সঃ) আসন গ্রহণ করেছিলেন, একব্যক্তি তার ছাদ হতে তার উপর একটি বড় ভারী পাথর ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু সে তার এ কুকীর্তি শুরু করার পূর্বেই আল্লাহতা'আলা তাকে সতর্ক করে দিলেন ও সমস্ত ব্যাপার তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি সহসাই সেখান হতে উঠে পড়লেন ও মদীনায় চলে গেলেন।

এমন একটা হীন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে কোনরূপ দয়ার আচরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। নবী করীম (সঃ) অনতিবিলম্বে তাদের প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠালেন-'তোমাদের বিশ্বাস-ভংগমূলক ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছি, কাজেই বেশীর পক্ষে দশ দিনের মধ্যে তোমরা মদীনা ত্যাগ করে চলে যাও। এ সময়ের পরও যদি তোমরা এখানে থাক তাহলে তোমাদের বস্তিতে যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে।' অপর দিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে সংবাদ পাঠাল-দু হাজার লোক দিয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করবো এবং বনু কুরাইজা ও বনু-গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক! নিজেদের স্থান কিছুতেই ত্যাগ করবে না। এ মিথ্যা আশ্বাসবাণীর ওপর নির্ভর করে তারা নবী করীমের (সঃ) 'চূড়ান্ত নির্দেশের' জওয়াবে বলে পাঠাল ঃ 'আমরা এখান হতে চলে যাব না, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।' এর পর ৪র্থ হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসে রসূলে করীম (সঃ)

তাদেরকে অবরুদ্ধ করলেন। মাত্র কয়েক দিন পর্যন্ত অবরোধ চলবার পর (কোন কোন বর্ণনা মতে ছ'দিন, আর কোন কোনটির মতে পনের দিন) তারা মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হ'ল এ শর্তের ভিত্তিতে যে, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া আর যা কিছুই তারা নিজেদের উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে, তা নিয়ে যাবে। ইহুদীদের এ দ্বিতীয় দুষ্ট ও দুষ্কৃতকারী গোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হতে মদীনার ভূমিকে মুক্ত করা এভাবেই সম্ভবপর হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল। অবশিষ্টরা সিরিয়া ও খায়বরের দিকে চলে গেল। বর্তমান সূরায় এই ঘটনাই আলোচিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে, বনু-নযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। মোটামুটি চারটে বিষয় এ সূরাটিতে আলোচিত হয়েছে ঃ

১. প্রথম চারটি আয়াতে দুনিয়াবাসীকে বনু-নযীরের সদ্য লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। তারা ছিল একটি বিরাট গোষ্ঠী বা গোত্র। জনসংখ্যা সে সময়কার মুসলমানদের সংখ্যা হতে কিছুমাত্র কম ছিল না। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রও তাদের ছিল বিপুল পরিমাণ। তাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাত্র কয়েক দিনের অবরোধ সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। এবং কোন এক ব্যক্তির হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়া ছাড়াই শত শত বছরের অধিবাস ত্যাগ করে নির্বাসন দন্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'ল। এ প্রসংগে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ এ মূলত মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্যের ফলশ্রুতি নয়। এর আসল কারণ এ ছিল যে, ইহুদীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। আর যারাই আল্লাহর শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার দুঃসাহস করবে, তারাই যে এ নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হবে তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

২. ৫ম আয়াতে যুদ্ধ-আইনের ধারা হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সামরিক প্রয়োজনে শত্রু এলাকায় যে সব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা করা হয়, তা কুর'আনে নিষিদ্ধ 'ফাসাদ ফিল আরজ'-'পৃথিবীর বুকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ' পর্যায়ে গণ্য হয় না।

৩. ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে-যুদ্ধ কিংবা সন্ধির ফলে যেসব জমি-জায়গা ও বিত্ত-সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হবে, তার বিলিব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে, সেই বিষয়। একটি বিজিত অঞ্চল এই প্রথমবার মুসলমানদের করায়ত্ত হয়েছিল। এ কারণে এখানেই এ বলে দেয়া হ'ল।

৪. ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বনু-নযীর যুদ্ধ চলাকালে মুনাফিকদের গৃহিত নীতি ও আচরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। তাদের-এরূপ আচরণের মূলীভূত কারণ কি ছিল, তাও এখানে নির্দেশিত হয়েছে।

৫. সূরার শেষ রুকূ'টি পুরোপুরি একটি উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলিম সমাজে শামিল হয়েছে-অথচ ঈমানের আসল প্রাণশক্তি হতে রিক্ত ও বঞ্চিত, এমন সব লোককেই এতে সম্বোধন করা হয়েছে। ঈমানের আসল দাবী কি ; তাক্ওয়া ও ফাসেকীর মধ্যে পার্থক্য কি, যে কুর'আন মেনে নেবার তারা দাবী করে, তার আসল গুরুত্ব কি এবং যে খোদার প্রতি ঈমান আনার কথা তারা দাবী করে, তাঁর প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি- এ সব কথাই এ প্রসংগে বলা হয়েছে।

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

মহাবিজ্ঞ পরাক্রমশালী তিনিই এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু ও আকাশসমূহের মধ্যে যা কিছু আল্লাহ্‌রজন্যে তসবীহ করে

① هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

তাদের ঘরবাড়ীগুলো হতে কিতাবদের আহলে মধ্যে কুফুরি করেছিল যারা বের করেছেন যিনি তিনিই

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ

তাদেররক্ষাকারী তারা যে তারাধারণা করেছিল ও তারা বের হবে যে তোমরা ধারণা কর নাই সমাবেশেই প্রথম

حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۖ

তারা ভাবে ও নাই যেখানে (এমনদিক) হতে আল্লাহ তাদের (কাছে) আসলেন কিন্তু আল্লাহ হতে তাদের দুর্গগুলো

১· আল্লাহ'রই তসবীহ করিয়াছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে রহিয়াছে। আর তিনিই বিজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী।

২· তিনিই আহলি-কিতাব কাফেরদিগকে প্রথম আক্রমণেই তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন[১]। তাহারা যে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে তাহা তোমরা কখনই ধারণা করিতে না। আর তাহারাও মনে করিয়া বসিয়াছিল যে, তাহাদের দৃঢ় দুর্গ প্রতিষ্ঠানসমূহই তাহাদিগকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু আল্লাহ এমন দিক হইতে তাহাদের উপর আসিলেন, যে দিক সম্পর্কে তাহারা ধারণা পর্যন্ত করিতে পারিল না[২]।

১। এখানে আহলি-কিতাব কাফের বলতে, বনী নযীর ইহুদী গোত্রকে বুঝানো হয়েছে ; এরা মদীনার একাংশে বাস করতো। এ গোত্রের সংগে রসূলুল্লাহর (সঃ) সন্ধি-চুক্তি ছিল। কিন্তু এরা বার বার চুক্তি ভংগ করে। শেষে ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূল (সঃ) তাদেরকে জানিয়ে দেন যে-হয় তোমরা মদীনা ত্যাগ ক'রে চলে যাও নতুবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। তারা চলে যেতে অস্বীকার করলো। সুতরাং রসূল (সঃ) মুসলিম সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধার আগেই তারা বহিষ্কার দন্ড মেনে নিতে প্রস্তুত হলো, যদিও তাদের দুর্গগুলো খুব মজবুত ছিল, এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জামও ছিল তাদের প্রচুর।

২। তাদের উপর আল্লাহতা'আলার আসার অর্থ এ নয় যে-আল্লাহ্ অন্য কোন স্থানে ছিলেন তারপর সেখান হতে তাদের উপর আক্রমণ করেন। বরং এ মাত্র এক বাক-পদ্ধতি। এর আসল উদ্দেশ্য এই বুঝানো যে-মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে তারা এই ধারণায় নিশ্চিত ছিল যে বাহির থেকে যদি কোন আক্রমণ হয় তবে-আমরা নিজেদের গড়বন্দি দ্বারা তা প্রতিরোধ করবো। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এরূপ রাস্তা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার কোন আশংকা তাদের মনে ছিল না। আর সে রাস্তা হলো : আল্লাহতা'আলা ভিতর থেকে তাদের সাহস ও প্রতিরোধ শক্তি এরূপ শূণ্য-গর্ভ করে দিয়েছিলেন যে তারপর তাদের হাতিয়ার না কোন কাজে এসেছিল, আর না তাদের গড়।

তিনি তাহাদের দিলে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন। ফল এই হইল যে, তাহারা নিজেদের হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিতেছিল, আর মুমিনদের হাতেও ধ্বংস করাইতেছিল। অতএব শিক্ষা গ্রহণ কর হে দৃষ্টিবান ব্যক্তিরা।

৩· আল্লাহ যদি তাহাদের ভাগ্যে নির্বাসন লিখিয়া না দিতেন তাহা হইলে দুনিয়ায়-ই তিনি তাহাদিগকে আযাব দিয়া দিতেন[৩]। আর পরকালে তো তাহাদের জন্য দোযখের আযাব রহিয়াছেই।

৪· এইসব কিছু এই কারণে হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের সহিত প্রবল বিরোধিতা করিয়াছে এবং যে লোকই আল্লাহ'র বিরোধিতা করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে শাস্তিদানে বড়ই শক্ত ও কঠোর।

৫· তোমরা খেজুরের যে গাছ কাটিয়াছ কিংবা যেগুলিকে উহাদের শিকড়ের ওপর দাড়াইয়া থাকিতে দিলে, এই সবই আল্লাহ'রই অনুমতিক্রমে ছিল[৪]।

৩। দুনিয়ার শাস্তির অর্থ নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া। যদি তারা সন্ধি ক'রে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে যুদ্ধ করতো তবে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

৪। এখানে এই ব্যাপারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে বনী নযীর গোত্রের বসতির চুতর্দিকে যে খেজুরের বাগান ছিল তার মধ্যে অনেক গাছকে মুসলমানরা অবরোধ করার সূচনায় কেটে ফেলেছিল অথবা জ্বালিয়ে দিয়েছিল যাতে সহজে অবরোধ করা যায়; এবং যেসব গাছ সামরিক চলাচলে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি সেগুলিকে যথাযথ অবস্থায় বহাল রেখেছিল। এই ব্যাপারের উপর মুনাফেক ও ইহুদীরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল যে- "মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তোমরা দেখে নাও শ্যামল ফলবতী গাছগুলি এরা কেমন করে কেটে চলেছে। এর নাম 'ফাসাদফিল আরদ'-পৃথিবীতে বিপর্যয়-সৃষ্টি ছাড়া আর কি? এই প্রসংগে আল্লাহতা'আলা এই হুকুম অবতীর্ণ করেন যে-তোমরা যে গাছগুলো কেটেছো ও যেগুলি খাড়া থাকতে দিয়েছো এর মধ্যে কোন কাজই অবৈধ নয়, বরং উভয় কাজই আল্লাহ'র অনুমোদিত।

وَ لِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۵﴾ وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

এবং লাঞ্ছিত করার জন্যে ফাসেকদের এবং যা ফায় দিয়েছেন আল্লাহ নিকট তার রসূলের

مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ

তাদের থেকে নাই এ জন্য তোমরা দৌড়াও তার উপর কোন ঘোড়া এবং না উট কিন্তু আল্লাহ

يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

আধিপত্য দেন তাঁর রসূলদেরকে উপর যার তিনি ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ উপর সব কিছুর

قَدِيْرٌ ﴿۶﴾

ক্ষমতাবান

আর (আল্লাহ এই অনুমতি এই জন্য দিয়াছিলেন) যেন ফাসেকদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া দেন[৫]।

৬· আর যে-ধনমাল[৬] আল্লাহতা'আলা তাহাদের দখল হইতে বাহির করিয়া তাঁহার রসূলের নিকট ফিরাইয়া দিলেন[৭] তাহা এমন নয় যাহার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়াইয়াছ; বরং আল্লাহ তাঁহার রসূলগণকে যাহার ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করিয়া দেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই শক্তিশালী[৮]।

৫। অর্থাৎ আল্লাহ'র ইচ্ছা ছিল এই গাছগুলি কাটার মধ্য দিয়ে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা হোক, এবং এগুলি না কাটার মধ্যে দিয়েও তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা হোক। কাটার মধ্যে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতার বিষয় ছিলো গাছগুলি তারা নিজেদের হাতে রোপণ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে যে বাগানগুলির তারা মালিক ছিল তাদের চোখের সামনেই তার গাছগুলো কেটে যাওয়া হচ্ছিল, অথচ কর্তনকারীদের কোন প্রকার বাধা দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অপর পক্ষে গাছগুলো না কাটার মধ্যে হীনতার বিষয় ছিল এই যে-যখন তারা মদীনা থেকে বাহির হয় তখন তারা স্বচক্ষে দেখেছিল যে, কাল পর্যন্ত যে সরস-শ্যামল উদ্যান তাদের সম্পত্তি ছিল আজ তা মুসলমানদের অধিকারে চলে যাচ্ছে। তাদের ক্ষমতা যদি চলতো, তবে তারা এগুলিকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে তবে মদীনা ত্যাগ করতো এবং একটিও অক্ষত বৃক্ষকে তারা মুসলমানদের অধিকারে যেতে দিতো না। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় তারা সব কিছু যেমন ছিল তেমন অবস্থায় ত্যাগ করে হতাশা ও মনোবেদনার সংগে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

৬। এখানে সেই ধন-সম্পত্তির উল্লেখ করা হচ্ছে যা প্রথমে বনী নযীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ত্তে এসেছে। এ সম্পর্কে এখান থেকে ১০ম আয়াত পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা ধন-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কিরূপে করা হবে তা নির্দেশ করেছেন।

৭। এই শব্দগুলি স্বতঃই এই অর্থ প্রকাশ করে যে-এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু বস্তু পাওয়া যায় সে সবের উপর প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন হ'ক নেই, যারা মহিমান্বিত আল্লাহতা'আলার বিদ্রোহী। এই কারণে এক বৈধ ও ন্যায় যুদ্ধের ফলে যেসব ধন সম্পত্তি কাফেরদের অধিকার থেকে মু'মিনদের অধিকারে এসেছে সেসব সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা এই যে-সে ধনের মালিক আপন বিশ্বাস ঘাতক ও আত্মসাৎকারী কর্মচারীদের আয়ত্ত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজ অনুগত কর্মচারীদের প্রতি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী কানুনের পরিভাষায় এই ধন-সম্পত্তিকে 'ফাই' (প্রত্যাবৃত্ত ধন) বলা হয়।

৮। অর্থাৎ সংগ্রামী সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ বাহবলের ফলে মাত্র এই ধন মুসলমানদের কব্জায় আসেনি। বরং আল্লাহতা'আলা নিজ রসূল ও তাঁর উম্মত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন এ হচ্ছে তার সমষ্টিগত শক্তির ফল। তাই এ ধন যুদ্ধ-লব্ধ লুণ্ঠিত ধন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সংগ্রামকারী সৈন্য দলের মধ্যে এ ধন যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রীর মত বন্টন করে দেয়া যেতে পারে না; এ ধনের উপর সৈন্যদের এরূপ ভাগ পাওয়ার হক নেই। শরী'অতে 'ফাই' ও গণীমতের হুকুমকে এইরূপভাবে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে যে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাকে গণীমত বলা হয়। এ ছাড়া শত্রুদেশের ভূমি গৃহাদি ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গণীমত নয়, 'ফাই'-এর অন্তর্গত।

৭· যাহা কিছুই আল্লাহ্ এই জনপদের লোকদের হইতে তাঁহার রসূলের দিকে ফিরাইয়া দিলেন তাহা আল্লাহ ; রসূল এবং আত্মীয় –স্বজন,[৯] ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য ; –যেন উহা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হইতে না থাকে[১০] । রসূল তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর । আর যে জিনিস হইতে তিনি তোমাদিগকে বিরত রাখেন তাহা হইতে তোমরা বিরত হইয়া যাও । আল্লাহ'কে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা[১১] ।

৮· (উপরন্তু সেই মাল) সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যও যাহারা

৯। আত্মীয়–স্বজন বলতে এখানে রসূলুল্লাহর আত্মীয়–স্বজনকে বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব । রসূল (সঃ) যাতে নিজের, নিজ পরিবার পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়–স্বজনেরও হক যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা যাঁদের সাহায্য করা তিনি প্রয়োজন বোধ করেন–আদায় করতে পারেন সেজন্য এই অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল । নবী করীমের (সঃ) মৃত্যুর পর এ অংশ একটি পৃথক ও স্থায়ী অংশরূপে বর্তমান থাকেনি, বরং মুসলমানদের মধ্যেকার অন্যান্য দরিদ্র, পিতৃহীন ও মুসাফিরদের সাথে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের অভাবগ্রস্থ লোকদের হকও বায়তুল মালের (সাধারণ কোষাগারের) উপর ন্যস্ত হয় ; অবশ্য যাকাতে তাদের অংশ না থাকায় তাদের হক অন্যদের উপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছে ।

১০। এ কুরআন মজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী নির্দেশ । এর মধ্যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির এই বুনিয়াদী নিয়ম বিবৃত করা হয়েছে যে–ধনের আবর্তন সমগ্র সমাজে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে হওয়া চাই, ধন মাত্র ধনবানদেরই মধ্যে আবর্তন করতে থাকবে এবং ধনী দিন দিন অধিকতর ধনী ও দরিদ্র দিন দিন দরিদ্রতর হতে চলবে কোনমতে এরূপ যেন না হয় ।

১১। যদিও এ আদেশ বনী নযীরের সম্পত্তি–বন্টনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এ আদেশের ভাষা সাধারণ ; সে জন্যে এর মর্ম হচ্ছে–সমস্ত ব্যাপারে যেন মুসলমানেরা রসূলের আদেশ–নির্দেশের আনুগত্য করে । এই কথার দ্বারা এ মর্ম আরও সুস্পষ্ট হয়েছে যে–"যা কিছু রসূল তোমাদের দেয়"–এর মুকাবিলায় "যা কিছু তোমাদের না দেয়" এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়নি । বরং বলা হয়েছে "যে জিনিস হইতে তিনি তোমাদিগকে বিরত রাখেন তাহা হইতে তোমরা বিরত হইয়া যাও ।"

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ

আল্লাহ থেকে অনুগ্রহ তারা পেতে চায় তাদের সম্পদগুলো ও তাদের ঘরবাড়ী গুলো হতে বহিষ্কৃত হয়েছে

وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ ط أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ﴿٨﴾

সত্যবাদী তারাই ঐসবলোক তার রসূলকে ও আল্লাহকে তারা সাহায্য করে এবং সন্তুষ্টি ও

وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ

(তাদেরকে) যারা তারা ভালবাসে তাদের পূর্বে ঈমান (এনেছে) ও (এই)নগরীতে বসবাস করেছে যারা এবং

هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ

(যা) তা থেকে প্রয়োজনের (অনুভূতি) তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে তারাপায় না এবং তাদের দিকে হিজরত করেছে

أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ

তাদের সাথে আছে যদিও এবং তাদের নিজেদের উপর তারা প্রাধান্য দেয় এবং তাদের দেয়া হয়

خَصَاصَةٌ قف وَ مَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

সফলকাম তারাই ঐসব লোক অতঃপর তারনিজেকে কৃপণতা (থেকে) রক্ষা করবে যে এবং অভাব অনটন

নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিত্ত-সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই লোকেরা আল্লাহ'র অনুগ্রহ এবং তাহার সন্তুষ্টি পাইতে চাহে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের সাহায্য-সমর্থনের জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারাই সত্য পথের পথিক।

৯' (সেই ধনমাল সেই লোকদের জন্যও) যাহারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করিয়া দারুল হিজরাতেই বসবাসকারী ছিল[১২]। তাহারা ভালোবাসে সেই লোকদিগকে যাহারা হিজরাত করিয়া তাহাদের নিকট আসিয়াছে। তাহাদিগকে যাহাই দেওয়া হয় তাহার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত তাহারা নিজেদের দিলে অনুভব করে না এবং নিজেদের তুলনায় অন্যদিগকে অগ্রাধিকার দেয়-নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হউক না কেন। বস্তুতঃ যে সব লোককে তাহাদের দিলের সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা করা হইয়াছে তাহারাই কল্যাণ লাভ করিবে।

১২। আনসারদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই'-তে যে মাত্র মুহাজিরদের হক আছে তা নয়। বরং প্রথম থেকে যে মুসলমানরা দারুল ইসলামে বসবাস করছে তাঁরাও এ থেকে অংশ পাবার হকদার।

১০· (তাহা সেই লোকদের জন্যও) যাহারা এই অগ্রবর্তীদের পরে আসিয়াছে[১৩]। যাহারা বলে ঃ হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমাদান কর যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে। আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতাভাব রাখিও না,-হে আমাদের খোদা। তুমি বড়ই অনুগ্রহ-সম্পন্ন এবং করুণাময়[১৪]।

রুকূ ঃ ২

১১· তোমরা[১৫] কি দেখ নাই সেই লোকদিগকে যাহারা মুনাফেকীর আচার-আচরণ অবলম্বন করিয়াছে? তাহারা তাহাদের কাফের আহলি-কিতাব ভাইদিগকে বলে, "তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহা হইলে আমরাও তোমাদের সংগে বাহির হইব। উপরন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা কাহারো কথা কক্ষণই শুনিব না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমরা তোমাদের সাহায্য করিব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী এই লোকেরা নিশ্চয়-ই মিথ্যাবাদী।

১৩। অর্থাৎ 'ফাই'-এর ধনে যে মাত্র বর্তমান বংশধরদের হক আছে তা নয়; পরবর্তীদের হকও আছে।

১৪। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে-তারা যেন কোন মুসলমানের প্রতি নিজেদের অন্তরে হিংসা পোষণ না করে, এবং নিজেদের পূর্বে যে-সব মুসলমান গত হয়েছেন তাদের অনুকূলেও যেন দোয়ায়ে মাগফেরাত (অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে, তাঁদের প্রতি নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষণ করা যেন না হয়।

১৫। সমগ্র রুকূটিতে মুনাফেকদের মতিগতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর (সঃ) যখন বনী নযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য দশ দিনের নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের অবরোধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক দিন বাকী ছিল তখন মদীনার মুনাফেক লিডাররা তাদেরকে বলে পাঠাল যে-আমরা ২ হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্যার্থে যাব এবং বনী কুরাইশ ও বনী গত্‌ফানও তোমাদের সাহায্যে উপস্থিত হবে। সুতরাং মুসলমানদের মুকাবিলায় তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, এবং কিছুতেই অস্ত্র সমর্পণ করো না; যদি তারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে তবে আমরা যুদ্ধে তোমাদের সাথী হব এবং তোমাদের যদি এখান থেকে বহিষ্কার করা হয় তবে আমরাও এখান থেকে বহির্গত হ'য়ে যাবো।

১২· উহারা বহিষ্কৃত হইলে ইহারা তাহাদের সংগে কখনই বাহির হইবে না। আর তাহাদের ওপর আক্রমণ করা হইলে ইহারা কখনই তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে না। আর ইহারা যদি তাহাদের সাহায্য করেও, তাহা হইলে ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। অতঃপর কোথাও হইতে কোন সাহায্য তাহারা পাইবে না।

১৩· ইহাদের দিলে আল্লাহর অপেক্ষাও তোমাদের ভয় অনেক বেশী প্রবল। ইহা এই কারণে যে, ইহারা এমন লোক যাহাদের কোনরূপ বিবেক-বুদ্ধি নাই[১৬]।

১৪· ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া (প্রকাশ্য ময়দানে) তোমাদের সহিত লড়াই করিতে কখনই আসিবে না। লড়াই করিলেও দূর্গ পরিবেষ্টিত জনবসতিতে বসিয়া কিংবা প্রাচীরের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া করিবে। পারস্পরিক বিরুদ্ধতায় ইহারা বড়ই কঠিন ও অনমনীয়। তুমি তো ইহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর, কিন্তু তাহাদের দিল পরস্পর বিদীর্ণ। ইহাদের এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, ইহারা নিজেরাই নির্বোধ লোক।

১৬। এই ক্ষুদ্র বাক্যে এক বৃহৎ সত্য বিবৃত করা হয়েছে। যে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি বুঝ সমূঝ আছে সে তো জানে-আসলে ভয় করার যোগ্য হচ্ছে আল্লাহতা'আলার শক্তি-মানুষের শক্তি নয়। সেজন্যে খোদার কাছে পাকড়ে যাওয়ার আশংকা যে কাজে আছে, এরূপ প্রতিটি কাজ থেকে সে বিরত থাকবে, কোন মানবীয় শক্তি পাকড়াওকারী থাকুক বা না থাকুক। এবং সেই ফরযের (অবশ্যপাল্য কর্তব্যগুলির) প্রতিটি পালনের জন্যে-যার দায়িত্ব খোদা তার প্রতি অর্পণ করেছেন-সে পূর্ণদ্যমে উদ্যোগী হবে, সারা জগতের শক্তি এ ব্যাপারে তার প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধকারী হলেও। কিন্তু একজন-বোধহীন মানুষ সকল ব্যাপারে নিজের কর্ম-পদ্ধতির সিদ্ধান্ত খোদার পরিবর্তে মানবীয় শক্তির দিকে চেয়ে করে। সে যদি কোন জিনিস থেকে বিরত হয় তবে খোদার কাছে ধৃত হওয়ার ভয়ে বিরত হয় না, বরং সে বিরত হয় এই জন্যে যে কোন মানবীয় শক্তি তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার সামনে বিদ্যমান, এবং কোন কাজ যদি সে করে তবে খোদার হুকুমের কারণে করে না বরং কোন মানবীয় শক্তির হুকুমের বা পছন্দের কারণে করে থাকে। এই বোধ ও বোধহীনতার পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চরিত্র ও ব্যবহারকে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়।

১৫· ইহারা সেই লোকদের মতো যাহারা তাহাদের কিছু কাল পূর্বেই নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ লইয়াছে[১৭]। এবং তাহাদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রহিয়াছে।

১৬· তাহাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মতো। প্রথমে সে লোকদিগকে বলে ঃ 'কুফরী কর'। আর যখন সে কুফরী করিয়া বসে, তখন সে বলে ঃ 'আমি তোমার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনকে ভয় পাই'।

১৭· পরে তাহাদের উভয়ের পরিণাম ইহাই নিশ্চিত যে, তাহারা দুইজন চিরকালের জন্য জাহান্নামী হইবে। আর যালেম লোকদের প্রতিফল ইহাই হইয়া থাকে।

রুকু ঃ ৩

১৮· হে ঈমানদার লোকেরা। আল্লাহতা'আলাকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে[১৮]। আল্লাহকেই ভয় করিতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেই সব আমল সম্পর্কে অবহিত যাহা তোমরা করিতে থাক।

১৭। এখানে কুরাইশ কাফের ও বনী কাইনুকার ইহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে; তারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও এই সমস্ত দুর্বলতারই কারণে মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল মুসলিম দলের হাতে পরাজয় বরণ করে।

১৮। 'কাল' অর্থাৎ পরকাল। দুনিয়ার সমগ্র জীবনটি যেন 'আজ' এবং 'কাল' হচ্ছে কিয়ামতের দিন যা এই 'আজ'-এর পরে আসবে।

১৯· তোমরা সেই লোকদের মত হইয়া যাইও না যাহারা আল্লাহ'কে ভুলিয়া গিয়াছে। ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে আত্মভোলাবানাইয়াদিয়াছেন[১৯]। এই লোকেরাই ফাসেক।

২০· জাহান্নামগামী লোকেরা ও জান্নাতগামী লোকেরা কখনও এক রকম হইতে পারে না। জান্নাতগামী লোকেরাই প্রকৃত পক্ষে সফল।

২১· আমরা যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপরও অবতীর্ণ করিয়া দিতাম তাহা হইলে তুমি দেখিতে যে, উহা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসিয়া যাইতেছে ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হইতেছে[২০]। এই দৃষ্টান্তগুলি আমরা লোকদের সম্মুখে এই উদ্দেশ্যে পেশ করিতেছি যে, তাহারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-বিবেচনা করিবে।

১৯। অর্থাৎ খোদাকে ভুলে থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে নিজেকে ভুলে যাওয়া। যখন মানুষ এ কথা ভুলে যায় যে সে-কারুর দাস, তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে সে পৃথিবীতে নিজের এক ভ্রান্ত স্বরূপ নির্দিষ্ট করে বসে ; এবং তার সারাটি জীবন এই বুনিয়াদী বিভ্রান্তির কারণে ভ্রান্ত হয়ে থেকে যায়। অনুরূপভাবে যখন সে এ কথা ভুলে যায় যেন-সে এক খোদা ছাড়া অন্য কারুর দাস নয়, তখন সেই অদ্বিতীয় একের প্রকৃত পক্ষে সে যার বান্দাহ্-দাসত্ব তো করে না, কিন্তু অন্য অনেকের দাসত্ব সে করতে থাকে প্রকৃতপক্ষে যাদের সে প্রকৃত দাস নয়।

২০। এই উপমার মর্ম হচ্ছে-কুরআন যেরূপভাবে খোদার মহানত্ব ও তাঁর কাছে বান্দাহর দায়িত্ব ও জবাবদিহির সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করছে যদি পাহাড়ের মত বিরাট সৃষ্টিরও সে বোধ থাকতো এবং সে জানতে পারতো যে কিরূপ শক্তিমান প্রভুর সম্মুখে তাকে কাজের জবাবদিহি করতে হবে, তবে সেও ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠতো।

২২. তিনি আল্লাহই, তাঁহার ছাড়া কোন মা'বুদ[২১] নাই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম।

২৩. তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক-বাদশা। অতীব মহান পবিত্র[২২]। পুরাপুরি শান্তি-নিরাপত্তা[২৩]। শান্তি-নিরাপত্তা দাতা[২৪], সংরক্ষক[২৫], সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ-বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ্ পবিত্র মহান সেই শিরক হইতে যাহা লোকেরা করিতেছে।

২১। অর্থাৎ যিনি ছাড়া কারুর এ মর্যাদা, স্থান ও মোকাম নেই যে তার বন্দেগী ও উপাসনা করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া খোদায়ী গুণ ও ক্ষমতা কারুরই নেই যে তার উপাস্য হওয়ার হক থাকতে পারে।

২২। অর্থাৎ তিনি এর থেকে বহুগুণে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর যে তার সত্তার কোন দোষ বা ত্রুটি বা কোন মন্দ গুণ পাওয়া যাবে ; বরং তিনি এক পবিত্রতম সত্তা যাঁর সম্পর্কে কোন খারাবের ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।

২৩। বিপদ অথবা দুর্বলতা অথবা ত্রুটি তাঁর হতে পারে বা তাঁর পূর্ণত্বের কখনো হ্রাস ঘটতে পারে-এরূপ সকল সম্ভাবনা থেকে তাঁর সত্তা উচ্চতর ও পবিত্র।

২৪। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট বস্তু তাঁর সম্পর্কে নিরাপদ যে, তিনি কখনো তার প্রতি যুলুম করবেন না, অথবা তার হক নষ্ট করবেন না, অথবা তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না, অথবা তাঁর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না।

২৫। মূলে 'আল-মোহাইমিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে : প্রথমত : রক্ষণা-বেক্ষণকারী ; দ্বিতীয়তঃ পরিদর্শক, সাক্ষী যিনি দেখছেন-কে কি করছে, তৃতীয় সেই সত্তা যিনি মানুষের প্রয়োজন ও অভাব পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ

তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা উদ্ভাবনকর্তা আকৃতিদানকারী তার আছে নামসমূহ উত্তম

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ

তসবিহ করে তারই যা কিছু মধ্যে আসমানসমূহে ও যমিনে এবং তিনিই

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

২৪· তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনকারী ও উহার বাস্তবায়নকারী এবং সেই অনুযায়ী আকার-আকৃতি রচনাকারী। তাঁহার জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ বিদ্যমান। আসমান-যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁহার তসবীহ করে[২৬]। আর তিনি অতীব প্রবল মহা পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ-বিজ্ঞানী।

২৬। অর্থাৎ কথার ভাষায় বা অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে-তার স্রষ্টা প্রতিটি দোষ ও ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

সূরা আল–মুমতাহিনা

নামকরণ

এ সূরার ১০ নম্বর আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আসবে ও মুসলমান হওয়ার দাবী করবে তাদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে হবে। এ সম্পর্কের দিক দিয়ে এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'আল–মুমতাহিনা।' এ শব্দটির উচ্চারণ 'মুমতাহানা' ও 'মুমতাহিনা' উভয় ধরনেরই হতে পারে। প্রথম উচ্চারণের দিক দিয়ে এর অর্থ 'সেই স্ত্রীলোক যার পরীক্ষা লওয়া হয়েছে।' আর দ্বিতীয় উচ্চারণের দিক দিয়ে এর অর্থ 'পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।'

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

এ সূরায় এমন দুটি ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন জ্ঞাত। প্রথম ব্যাপার হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রাঃ) সম্পর্কিত। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে কুরাইশ সরদারদেরকে রসূলে করীমের মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে একখানি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হ'লঃ– হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যেসব মুসলমান স্ত্রীলোক মক্কা হতে হিজরাত করে মদীনায় আসছিলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলমান স্ত্রী লোকদেরকেও কাফেরদের হাতে প্রত্যার্পণ করতে হবে কি হবে না এ বিষয়ে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল,– এ দুটি ব্যাপারের উল্লেখে একথা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ সূরাটির শেষ ভাগে একটি তৃতীয় বিষয়েরও উল্লেখ হয়েছে। আর তা হ'লঃ– স্ত্রী লোকেরা ঈমান এনে যখন নবী করীমের (সঃ) সম্মুখে 'বয়আত' গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবে তখন তাদের নিকট হতে তিনি কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবেন। সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান এই যে, এ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কেননা মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ পুরুষদের ন্যায় তাদের বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকদেরও একই সময়ে ইসলামে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আর তখনই সামষ্টিকভাবে তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ সূরার শুরু হতে ৯ম আয়াত পর্যন্ত। সূরার শেষ ১৩ নম্বর আয়াতও এরই সঙ্গে সম্পর্কিত। হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রাঃ) শুধু নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার মানসে রসূলে করীমের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যথা– সময়ে এ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া না হলে মক্কা বিজয়কালে ব্যাপক রক্তপাত হ'ত। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যেত। কুরাইশদেরও বহু লোক নিহত হ'ত– যারা পরবর্তী কালে ইসলামের ব্যাপারে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মক্কা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিজিত হওয়ার কারণে যে শুভ ফল লাভ সম্ভব হয়েছিল তারও কোন পথ থাকতো না। আর এ অপূরণীয় ক্ষতি কেবলমাত্র এ কারণেই সাধিত হ'ত যে, মুসলমানদেরই একজন নিজের পরিবার পরিজনকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সূরার এই আয়াতসমূহে এ আচরণের তীব্র সমালোচনা পেশ করা হয়েছে। হযরত হাতিবের এ মারাত্মক ত্রুটি সম্পর্কে হুশিয়ার করে আল্লাহ তা'আলা সব ঈমানদার লোককে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন অবস্থায়ই এবং কোন উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সংগে বন্ধুতা–ভালোবাসার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখাও কোন মুসলমানের উচিৎ নয়। কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে কাফেরদের পক্ষে সুবিধাজনক কোন কাজই মুসলমানদের

করা সম্পূর্ণ অনুচিত। অবশ্য যে কাফের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যত শত্রুতা ও কষ্টদানের আচরণ করেনি, তার প্রতি অনুগ্রহমূলক ব্যবহার অবলম্বনে কোন আপত্তির কারণ নেই।

১০ম-১১শ আয়াত দুটি মূল আলোচ্যের দ্বিতীয় অংশ। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। সমস্যাটি তখন খুব জটিলতার সৃষ্টি করছিল। সমস্যাটি ছিল এইঃ মক্কায় বহু সংখ্যক মুসলিম নারীর স্বামী কাফের ছিল। তারা কোন না কোন উপায়ে হিজরাত করে মদীনায় উপস্থিত হতেন। অনুরূপভাবে বহু সংখ্যক মুসলিম পুরুষ এমন ছিলেন যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের আর তারা মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল। অতঃপর এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষত আছে কি না সেই সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহতা'আলা এ আয়াত কটিতে এ সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষের জন্যেও জায়েজ নয় কাফের নারীকে নিজের স্ত্রী করে রাখা। বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফল সম্পন্ন। [তাফহীমুল কুরআনের টীকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে]

১২ নম্বর আয়াত আলোচ্যের তৃতীয় অংশ। এতে রসূলে করীম (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে সব স্ত্রী লোক ইসলাম কবুল করবে, তাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত বহু বড় বড় দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সে সংগে এ কথারও অংগীকার গ্রহণ করুন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রসূলে করীমের তরফ হতে উপস্থাপিত যাবতীয় কল্যাণ ও মংগলময় নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন অনুসরণ-পালন করে চলতে বাধ্য ও প্রস্তুত থাকবেন।

রুকু ঃ ১

১· 'হে ঈমানদার লোকেরা[১]। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তোষ লাভের মানসে (দেশ ছাড়িয়া ঘর হইতে) বাহির হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার ও তোমাদের শত্রুদিগকে বন্ধু বানাইও না। তোমরা তো তাহাদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের নিকট আসিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে তাহারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করিয়াছে। আর তাহাদের আচরণ এই যে, তাহারা রসূল এবং স্বয়ং তোমাদিগকে শুধু এই কারণে দেশ হইতে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের রব্ব আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনিয়াছ। তোমরা গোপনে তাহাদিগকে বন্ধুতাপূর্ণ বাণী পাঠাও,

১। তফসীরকারকগণ এ বিষয়ে একমত যে, যখন মক্কায় মুশরেকদের নামে লিখিত হযরত হাতেব বিন্‌আবি বালতাআর (রাঃ)-পত্র-যাতে তিনি পূর্বাহ্নে শত্রুদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা আক্রমণ করতে চলেছেন- ধরা পড়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ

আমি অথচ | সম্যক অবগত | যা কিছু | তোমরা গোপন কর | ও | যা | তোমরা প্রকাশ কর | এবং | যে | তা করবে

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ① اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا

তোমাদের মধ্যে | নিশ্চয় অতঃপর | ভ্রষ্ট হয়েছে | সোজা | পথ | যদি | তোমাদের কাবু করতে পারে | তারা হয়

لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ

তোমাদের জন্য | শত্রু | ও | তারা সম্প্রসারিত করে | তোমাদের দিবে | তাদের হাতগুলো | ও | রসনাগুলো | তাদের

بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ② لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَ

মন্দের সাথে | ও | তারা কামনা করে | যদি | তোমরা কাফের হও | কখন না | তোমাদের উপকার দেবে | তোমাদের আত্মীয়রা | এবং

لَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا

না | তোমাদের সন্তানেরা | দিনে | কিয়ামতের | বিচ্ছেদ করবেন তিনি | তোমাদের মাঝে | এবং | আল্লাহ | যা

تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

তোমরা কাজ কর | খুব দেখেন

অথচ তোমরা যাহা কিছু গোপনে কর, আর যাহা কর প্রকাশ্যে, প্রত্যেকটি ব্যাপারই আমি ভালভাবেই জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এইরূপ করে, নিশ্চিত জানিও, সে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২· তাহাদের আচরণ তো এই যে, তাহারা তোমাদিগকে কাবু ও জব্দ করিতে পারিলে তোমাদের সহিত শত্রুতা করে, হাত ও মুখের ভাষা দ্বারা তোমাদিগকে জ্বালাতন দেয়। তাহারা তো ইহাই চায় যে, কোন না কোন ভাবে তোমরা কাফের হইয়া যাও।

৩· কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমাদের কোন কাজে আসিবে, না তোমাদের সন্তান-সন্তুতি২। সেই দিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন৩। আর তিনিই তোমাদের কাজ-কর্মের দর্শক।

২। হযরত হাতেব (রাঃ) এ কাজ এই উদ্দেশ্যে করেছিলেন যে মক্কায় তাঁর যে পরিবারবর্গ আছে যুদ্ধের সময় তারা যেন নিরাপদে থাকে;

৩। অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও সংযোগ সেখানে ছিন্ন করে দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে স্বকীয় সত্তায় সেখানে উপস্থিত হবে। সুতরাং দুনিয়ার কোন লোকেরই কোন ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব বা দলবদ্ধতার খাতিরে কোন অবৈধ কাজ করা উচিত নয়। কেননা নিজের কাজের শাস্তি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে, তার নিজের দায়িত্বের মধ্যে অন্য কেউ অংশীদার হবে না।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ

তার সাথে যারা ও ইবরাহীমের মধ্যে উত্তম আদর্শ তোমাদের জন্যে রয়েছে নিশ্চয়

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا

যা (তা) থেকে ও তোমাদের হতে নিঃসম্পর্ক আমরা নিশ্চয় তাদের জাতিকে তারা বলেছিল যখন

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

আমাদের মাঝে সৃষ্টি হল ও তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি আল্লাহ ছাড়া তোমরা ইবাদত কর

وَبَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আন যতক্ষণ না চিরকালের বিদ্বেষ ও শত্রুতা তোমাদের মাঝে ও

وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ

ও তোমার জন্যে আমি ক্ষমা চাইব অবশ্যই তার বাপের জন্যে ইবরাহীমের উক্তি তবে ব্যতিক্রম তার একার

مَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَىْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ

তোমার উপর হে আমাদের রব কিছুই কোন আল্লাহ হতে তোমার জন্যে সাধ্য রাখি আমি না

تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

প্রত্যাবর্তন স্থল তোমারই কাছে ও আমরা অভিমুখী তোমার দিকে ও আমরা ভরসা করেছি

৪. তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার সংগী–সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেঃ "আমি তোমাদের হইতে এবং খোদাকে ছাড়িয়া যে–মাবূদের তোমরা পূজা–উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ও বিমুখ। আমরা তোমাদের অস্বীকার করিয়াছি[৪] এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হইয়াছে ও বিরোধ–ব্যবধান শুরু হইয়া গিয়াছে– যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ'র প্রতি ঈমান না আনিবে।" তবে ইবরাহীমের তাঁহার পিতার জন্য এই কথা বলা (ইহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যাপার) যে, "আমি আপনার জন্য মাগফিরাত চাহিয়া অবশ্যই আবেদন করিব। আর আল্লাহ'র নিকট হইতে আপনার জন্য কিছু আদায় করিয়া লওয়া আমার সাধ্যের বাহিরে[৫]।" (আর ইবরাহীম ও তাহার সংগী– সংগী–সাথীদের প্রার্থনা ছিল এইঃ) "হে আমাদের রব্! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রাখিয়াছি ও তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং তোমার সমীপে আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৪। অর্থাৎ আমরা তোমাদের কাফের (অমান্যকারী)। তোমরা সত্যপন্থী বলে আমরা মানিনা এবং তোমাদের ধর্মকে মানি না।

৫। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছেঃ– তোমাদের জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর এই কথা অনুসরণযোগ্য যে, তিনি নিজের কাফের ও মুশরেক কওমকে পরিষ্কারভাবে তাঁর অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে নিজের মুশরেক পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কার্যতঃ তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন– এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় নয়।

৫· হে আমাদের খোদা। আমাদিগকে কাফেরদের জন্য 'ফিতনা' বানাইয়া দিও না[৬]। –হে আমাদের রব্ব, আমাদের অপরাধগুলিকে মাফ করিয়া দাও। নিঃসন্দেহ যে, তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ–বিচক্ষণ।"

৬· এই লোকদের কর্মপদ্ধতিতেই তোমাদের জন্য ও এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উন্নত মানের আদর্শ রহিয়াছে যে আল্লাহ ও পরকালের দিনের আকাঙ্খী। তাঁহার দিক হইতে যে লোক বিমুখ হইবে– তবে আল্লাহ্ তো অনন্য নির্ভর এবং স্বতঃই প্রশংসিত।

রুকু ঃ ২

৭· অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও সেই লোকদের মধ্যে কখনও বন্ধুতা–ভালোবাসার সঞ্চার করিয়া দিবেন, যাহাদের সহিত আজ তোমরা শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছ[৭]।

৬। কাফেরদের পক্ষে 'ফিতনা' স্বরূপ হওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে ঃ যথা–কাফেররা মু'মিনের উপর বিজয়ী হ'য়ে নিজেদের এই জয়কে এ কথার প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করে যে আমরা সত্যের উপর আছি এবং মু'মিনরা অসত্যের উপর আছে; বা মু'মিনদের উপর কাফেরদের যুলুম অত্যাচারের বাড়াবাড়ি মু'মিনদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে এবং অবশেষে মু'মিনরা কাফেরদের কাছে অবনত হয়ে নিজেদের ধর্মের ও চরিত্র বিক্রয় করতে প্রবৃত্ত হয়; অথবা সত্য ধর্মের প্রতিনিধিত্বের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মু'মিনরা সেই মর্যাদার উপযোগী নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে এবং জগৎ তাদের চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্যে সেই একই দোষ লক্ষ্য করে যা জাহেলিয়াতের সমাজে সাধারণভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এতে কাফেরদের এ কথা বলার সুযোগ হয় যে– এই ধর্মে কি এমন ভাল জিনিস আছে যার জন্য আমাদের কুফরীর উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে মানা যাবে?

৭। উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে নিজের কাফের আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা দেয়ার পর এ আশাও দেয়া হয়েছে যে– এমন সময়ও আসতে পারে যখন তোমাদের এই আত্মীয়–স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের শত্রুতা কাল পুনরায় বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে।

আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৮ আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না এই কাজ হইতে যে, তোমরা সেই লোকদের সহিত কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করিবে যাহারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর–বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করে নাই। সুবিচারকারীদিগকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন[৮]।

৯ তিনি তোমাদিগকে যে কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলেন, তাহা হইতেছেঃ তোমাদের বন্ধুতা করা সেই লোকদের সহিত যাহারা তোমাদের সংগে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে তোমাদের ঘর–বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে ও তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য–সহযোগিতা করিয়াছে।

৮। মর্ম হচ্ছে– যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না, বিচারের দাবী হচ্ছে– তোমরাও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না। শত্রু ও অশত্রু উভয়কে একই পর্যায়ে গণ্য করা এবং উভয়ের সংগে একরূপ ব্যবহার করা বিচার–সম্মত নয়। সেই সব লোকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করার হক আছে যারা ঈমান আনার জন্যে তোমাদের উপর অত্যাচার করেছে ও তোমাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, এবং তোমরা দেশ ত্যাগ করার পরও যারা তোমাদের পিছন ছাড়েনি। কিন্তু যেসব লোক এই অত্যাচারে কোন অংশগ্রহণ করেনি, বিচারের দাবী হচ্ছে– তোমরা তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে এবং সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের উপর তাদের যেসব হক আছে তা পালন করতে কোন ত্রুটি করবে না।

এই লোকদের সহিত যাহারা বন্ধুতা করে তাহারাই যালেম।

১০. হে ঈমানদার লোকেরা, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরাত করিয়া তোমাদের নিকট আসিবে, তখন তাহাদের (ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটি) যাচাই–পরখ করিয়া লও– আর তাহাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ–ই– ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না[৯]। না তাহারা কাফেরদের জন্য হালাল, না কাফের পুরুষরা তাহাদের জন্য হালাল। তাহাদের কাফের স্বামীরা যে মোহরানা তাহাদিগকে দিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। তোমাদের নিজেদের তাহাদিগকে বিবাহ করায় কোনই দোষ নাই– যদি তোমরা তাহাদের মোহরানা তাহাদিগকে আদায় করিয়া দাও[১০]।

৯। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম তো মুসলমান পুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে পালিয়ে মদীনায় আসতে থাকে এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের ফিরিয়ে পাঠানো হতে থাকে; কিন্তু এরপর মুসলিম নারীদের ক্রমাগত আগমন শুরু হয়ে যায় এবং কাফেররা চুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের ফিরে পাবারও দাবী জানায়। এ সম্পর্কে এই প্রশ্ন উঠে– হোদাইবিয়ার চুক্তি কি স্ত্রীলোকদের উপরও প্রযোজ্য হবে? আল্লাহতা'আলা এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে– যদি সে মুসলমান হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বস্তুতঃ ঈমানের খাতিরেই সে হিজরত করে এসেছে– অন্য কোন কারণে আসেনি তবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এ আদেশের ভিত্তি হচ্ছে– চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তে 'রাজুলুন' (পুরুষ) শব্দ লিখিত ছিল– যেমন বোখারীর বর্ণনায়উল্লেখিত আছে।

১০। মর্ম হচ্ছে– তাদের কাফের স্বামীদের যে মোহর ফিরিয়ে দেয়া হবে সেই মোহরই এই স্ত্রী লোকদের মোহর বলে গণ্য হবে না। বরং এখন যে মুসলমানই তাদের মধ্যে কোন স্ত্রী লোককে বিবাহ করতে ইচ্ছা করবে সে যেন তার মোহর আদায় করে তাকে বিবাহ করে।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا

তারা চেয়ে নেবে | ও | তোমরা খরচ করছে | যা | তোমরা চাও | ও | কাফের স্ত্রীদের | বিবাহ বন্ধন | তোমরা ধরে রেখ | না | এবং

مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩

প্রজ্ঞাময় | সর্বজ্ঞ | আল্লাহ | এবং | তোমাদের মাঝে | তিনি ফয়সালা দেন | আল্লাহর | নির্দেশ | এটা | তারা খরচ করেছে | যা

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا

তোমরা দাও | তবে | তোমরা সুযোগ পাও | অতঃপর | কাফেরদের নিকট | তোমাদের স্ত্রীদের (মোহর) | থেকে | কিছু | তোমাদের হাত ছাড়া হয় | যদি | এবং

الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

তোমরা | যাঁর | আল্লাকে | তোমরা ভয়কর | এবং | তারা খরচ করেছে | যা | সমান | যাদের স্ত্রী | চলে গেছে | তাদের

بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

তোমার কাছে বয়াত করবে | মু'মিন নারীরা | তোমার কাছে আসবে | যখন | নবী | হে | ঈমানদার | তাঁর উপর

عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ

তারা চুরি করবে | না | এবং | কোন কিছু | আল্লাহর সাথে | তারা শিরক করবে | না | যে | (এ কথার) উপর

আর তোমরা নিজেরাও কাফের মেয়ে-লোকদিগকে নিজেদের বিবাহে আটকাইয়া রাখিও না। তোমরা যে মোহরানা তোমাদের স্ত্রীদিগকে দিয়াছিলে তাহা তোমরা ফেরত চাহিয়া লও। আর যে মোহরানা কাফেররা তাহাদের মুসলমান স্ত্রীদের দিয়াছিল তাহা তাহারা ফেরত চাহিয়া লউক। ইহা আলাহতা'আলার নির্দেশ। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী।

১১· তোমাদের কাফের স্ত্রীদিগকে দেওয়া মোহরানা হইতে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের নিকট হইতে ফিরাইয়া না পাও, আর ইহার পরই তোমাদের সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে যাহাদের স্ত্রীরা ঐ দিকে রহিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে এতটা সম্পদ আদায় করিয়া দাও যাহা তাহাদের দেওয়া মোহরানার সমান হইবে। আর সেই খোদাকে ভয় করিতে থাক যাঁহার প্রতি তোমরা ঈমান আনিয়াছ।

১২· হে নবী! তোমার নিকট মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এই কথার ওপর 'বয়আত' করার জন্য আসে[১১] এবং এই কথার প্রতিশ্রুতি দান করে যে, তাহারা আল্লাহ'র সহিত কোন জিনিসই শরীক করিবে না, চুরি করিবে না,

১১। এ আয়াত মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এরপর যখন মক্কা বিজয় হলো তখন কুরাইশরা দলে দলে হুযুরের কাছে বয়আত করার জন্যে উপস্থিত হতে শুরু করলো। তিনি সাফা পাহাড়ের উপর নিজে পুরুষদের বয়আত গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের বয়আত গ্রহণের জন্যেও এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের অংগীকার লওয়ার জন্যে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হযরত ওমরকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। এর পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি স্থানে আনসারদের স্ত্রীলোকদের একত্র করতে নির্দেশ দেন এবং হযরত ওমরকে (রাঃ) তাদের বয়আত গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করেন।

জেনা–ব্যতিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করিয়া আনিবে না[১২], এবং কোন স্পষ্ট পরিচিত ন্যায্য ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করিবে না[১৩], তবে তুমি তাহাদের 'বয়আত' গ্রহণ কর এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ'র নিকট মাগফিরাতের দোআ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১৩· হে লোকেরা– যাহারা ঈমান আনিয়াছ, সেই লোকদিগকে বন্ধু বানাইও না যাহাদের ওপর আল্লাহতা'আলা গযব নাযিল করিয়াছেন, যাহারা পরকাল সম্পর্কে তেমনি নিরাশ, যেমন কবরে সমাধিস্থ কাফেররা

১২। এর দ্বারা দুই প্রকার মিথ্যা দোষারোপ বোঝানো হয়েছে। প্রথম কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে পরস্পরের সংগে প্রেম করার অপবাদ দেয়া এবং এই প্রকারের কাহিনী লোকদের মাঝে প্রচার করা। দ্বিতীয়– স্ত্রীলোকের পক্ষে পর পুরুষের ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়ে স্বামীকে বিশ্বাস দান করা যে– 'এ তোমারই সন্তান।'

১৩। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে দুইটি বড় গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম– নবী করীম (সঃ) এর প্রতি আনুগত্যের বিষয়েও ভাল "কাজের অনুগত্য"–এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অথচ হুযুর সম্পর্কে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনও খারাবের হুকুম দিতে পারেন। এর দ্বারা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, দুনিয়াতে কোন সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্য খোদায়ী কানুনের সীমা লংঘন করে করা যেতে পারে না; কেননা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য পর্যন্ত যখন 'ভাল কাজে আনুগত্য' এই শর্তযুক্ত, তখন অন্য কারুর এ মর্যাদা কি করে হতে পারে যে সে শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার হকদার হবে এবং কি করে তার এরূপ কোন হুকুমের বা আইনের বা পদ্ধতির ও প্রথার অনুসরণ করা যেতে পারে যা খোদায়ী কানুনের প্রতিকূল? এই আয়াতে ৫টি নেতিবাচক হুকুম দেয়ার পর ইতিবাচক হুকুম মাত্র একটিই দেয়া হয়েছে। আইনগত দিক দিয়ে এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ভাল কাজে এ নবী (সঃ)–এর আদেশ পালন করতে হবে। মন্দ কাজ সম্পর্কে সেই বড়বড় দোষগুলি উল্লেখ করা হ'ল জাহেলিয়াতের যুগে স্ত্রী লোকেরা যাতে লিপ্ত ছিল, এবং সে দোষগুলি থেকে বেঁচে থাকার অংগীকার গ্রহণ করা হ'ল। কিন্তু ভাল কাজ সম্পর্কে, ভাল কাজের কোন তালিকা পেশ করে অংগীকার গ্রহণ করা হয়নি যে– তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে। বরং এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয়েছিল যে হুযুর (সঃ) যে সৎকাজের হুকুম দান করবেন তা তোমাদের পালন করতে হবে।

সূরা আস্-সাফ

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের বাক্যাংশ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا হতে এর নাম গৃহীত । অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে সাফ্ শব্দটি এসেছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি । কিন্তু এর বিষয়বস্তু হতে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ সূরাটি ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাযিল হয়ে থাকবে । কেননা এতে যে অবস্থাবলীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এ সময়ই বিরাজ করছিল ।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ ও আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করাই হ'ল এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য । এতে দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । ঈমানের মিথ্যা দাবী করে যারা ইসলামে অনুপ্রবেশ লাভ করেছিল তাদেরকেও অনেক কথা এতে বলা হয়েছে। যারা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিল তাদেরকেও কোন কোন আয়াতে উভয় শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করা হয়েছে । আর কোন কোন আয়াতে কেবল মুনাফিকদেরকে । কোন কোনটির লক্ষ্য কেবল মুনাফিকদের প্রতি, কোন কোনটির কেবল নিষ্ঠাবানদের প্রতি । কোন্ আয়াতে কোন্ ধরনের লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে তা কথার ধরন হতেই বুঝতে পারা যায় । শুরুতে সমস্ত ঈমানদার লোককে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সর্বাধিক ঘৃণ্য ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা মুখে বলে এক কথা আর কাজে করে তার বিপরীত । পক্ষান্তরে অতিশয় প্রিয় লোক তারা যারা আল্লাহ'র পথে লড়াই করার জন্যে ইস্পাত নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় ।

৫ম-৭ম আয়াত পর্যন্ত রসূলে করীমের উম্মতের লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, তোমাদের রসূল ও তোমাদের দ্বীন ইসলামের সঙ্গে তোমাদের সেরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয়, যা মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে বনী-ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল । হযরত মূসা (আঃ) কে তারা আল্লাহ'র সত্য নবী ও রসূল জানতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত । আর হযরত ঈসার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েও তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকতো না । এর ফলে এ জাতির লোকদের মন-মেজাজের গঠন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গেল । আর হেদায়াত গ্রহণের তওফিক হতেই তাদের বঞ্চিত করা হ'ল । বস্তুতঃ এ কোন আদর্শস্থানীয় অবস্থা নয় । অন্য কোন জাতিই এ অবস্থা লাভের জন্য আগ্রহী হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না ।

৮ম-৯ম আয়াতে পূর্ণ বলিষ্ঠতা সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী খৃষ্টান ও তাদের সঙ্গে যোগ-সাজশকারী মুনাফিকরা আল্লাহ'র এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্যে যত চেষ্টাই করুক না কেন এ পূর্ণ জাক-জ'মক সহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই । আর মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন, মহান রসূলের প্রচারিত দ্বীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দ্বীন ও ধর্মের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিজয়ী হবেই ।

এর পর ১০-১৩শ আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়েছে-ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি মাত্র উপায়ই আছে। আর তা হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহ'র পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা। পরকালে এর ফলশ্রুতিতে আযাব হতে মুক্তি-নিষ্কৃতি, গুনাহসমূহের ক্ষমা ও মার্জনা এবং চিরকালের জন্যে জান্নাত লাভ হবে। আর দুনিয়ায় এর পুরস্কার হবে খোদার সাহায্য-সহযোগিতা এবং বিজয় ও সাফল্য।

সূরার শেষ ভাগে ঈমানদার লোকদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসার (আঃ) 'হাওয়ারীরা' যেভাবে আল্লাহ'র পথে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল, অনুরূপভাব তারাও যেন আল্লাহ'র আনসার-আল্লাহ'র সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কাফেরদের মুকাবিলায় তারাও ঠিক তেমনি আল্লাহ'র সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে, যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিল।

১ম রুকু

১. আল্লাহ'র তস্‌বীহ করিয়াছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বুকে বিরাজ করিতেছে। তিনিই সর্বজয়ী ও মহা বিজ্ঞানী।

২. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কেন সেই কথা ব'ল যাহা কার্যতঃ কর না ?

৩. আল্লাহ'র নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলিবে এমন কথা যাহা কর না।

৪. আল্লাহ্‌তো ভালোবাসেন সেই লোকদিগকে যাহারা তাঁহার পথে এমনভাবে কাতার বন্দী হইয়া লড়াই করে যেন তাহারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর[১]।

১। এর থেকে তো প্রথমতঃ জানা গেল–আল্লাহতা'আলা সেই মু'মিনরাই আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি লাভে কৃতার্থ হয় যারা তাঁর রাস্তায় প্রাণপাত করতে ও বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়তঃ এ কথাও জানা গেল যে– আল্লাহতা'আলা সেই সেনাদলকে পছন্দ করেন যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায় ঃ ১ তারা খুব বুঝে–সুঝে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, এমন কোন পথে লড়াই করেনা যা আল্লাহর পথ নয়। ২. তারা বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয় না বরং দৃঢ় শৃঙ্খলার সংগে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। ৩. শত্রুর মুকাবিলায় তারা লৌহপ্রাচীরবৎ হয়ে থাকে।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ

তোমরা জান নিশ্চয় অথচ আমাকে কষ্টদাও তোমরা কেন জাতি হে আমার তার জাতিকে মূসা বলেছিল যখন এবং

اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط

তাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ্ বক্র করে দিলেন তারা বক্রতা অবলম্বন করল অতঃপর যখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল আমি যে

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾ وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

মারয়ামের পুত্র ঈসা বলল যখন এবং ফাসেক জাতিকে পথ দেখান না আল্লাহ্ এবং

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

যা জন্যে সত্যায়নকারী তোমাদের প্রতি আল্লার রসূল আমি নিশ্চয় ইসরাইল বনী হে

يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ

তার নাম (হবে) আমার পরে আসবেন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা এবং তওরাত আমার পূর্বে (এসেছে)

اَحْمَدُ ط

আহ্মদ

৫. আর স্মরণ কর মুসার সে কথা, যাহা সে নিজ জাতির লোক জনকে বলিয়াছিল ঃ হে আমার জাতির জনগণ তোমরা কেন আমাকে উৎপীড়িত কর ? ..... অথচ তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্'র প্রেরিত রসূল[২] । পরে তাহারা যখন বক্রতা অবলম্বন করিল, তখন আল্লাহ্ও তাহাদের দিলকে বাঁকা করিয়া দিলেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্ ফাসেক লোকদিগকে হেদায়াত দান করেন না[৩] ।

৬. আর স্মরণ কর মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যাহা সেই কথা যাহা সে বলিয়াছিল ঃ 'হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্'র পাঠানো রসূল[৪] ; সত্যতা বিধানকারী সেই তওরাতের, যাহা আমার পূর্বে আসিয়াছে ; আর সুসংবাদ দাতা এমন একজন রসূলের যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহ্মাদ[৫]

২। একথা এজন্যে বলা হয়েছে–বনী ইসরাঈল নিজ নবীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছিল মুসলমান নিজ নবীর সংগে যেন সেরূপ ব্যবহার না করে । অন্যথায় বনী ইসরাঈলদের ভাগ্যে যে পরিণাম ঘটেছে তারাও অনুরূপ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে না ।

৩। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার রীতি এ নয় যে যারা নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায় তিনি অহেতুক তাদের সোজা পথে চালাবেন, এবং যেসব লোক তাঁর নাফরমানীতায় উৎসাহী ও তৎপর তিনি তাদের বলপূর্বক সত্য-সঠিক পথে এনে কৃতার্থ করবেন ।

৪। এ বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত । প্রথম নাফরমানী তারা– নিজেদের উত্থান যুগের সূচনায় করেছিল । আর দ্বিতীয় নাফরমানী তারা করেছিল এই যুগের শেষ পর্যায়ে একেবারে সমাপ্তিতে যার পরে তাদের উপর চিরদিনের জন্যে আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয়েছে । এই দুই ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে–খোদার রসূলের সাথে বনী ইসরাঈলদের ন্যায় ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করা ।

৫। রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এ হচ্ছে হযরত ঈসার স্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণীর উল্লেখ । তাফহীমুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এর বিস্তারিত প্রমাণ দিয়েছি ।

কিন্তু কার্যতঃ সে যখন তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি লইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল ঃ ইহাতো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র[৬]।

৭. এক্ষণে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় অত্যাচারী আর কে হইবে যে আল্লাহ'র উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের (আল্লাহ'র সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করিবার) আহবানই জানানো হইতেছিল[৭]? ...এইরূপ যালেমদিগকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না ।

৮. এই লোকেরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ'র নূরকে নির্বাপিত করিতে চাহে । আর আল্লাহ'র নূরকে নির্বাপিত করিতে চাহে । আর আল্লাহ'র সিদ্ধান্ত হইল, তিনি তাঁহার নূরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত ও প্রসারিত করিবেনই, কাফেরদের পক্ষে তাহা যতই অসহনীয় হউক না কেন ।

৬। মূলে سِحْرٌ ব্যবহৃত হয়েছে । এখানে যাদু অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি,-ধোকা ও প্রতারণার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আরবী অভিধানে 'যাদু'র ন্যায় এ শব্দের অর্থও প্রচলিত । আয়াতের মর্ম হচ্ছে-ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন তিনি যখন নিজের নবী হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলেন তখন বনী ইসরাঈল ও ঈসা (আঃ)-এর উম্মত তার নবী হওয়ার দাবিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারণা বলে অভিহিত করলো ।

৭। অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করে এবং নবীর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে নবীর মন-গড়া কথা বলে গণ্য করে ।

৮। অর্থাৎ প্রথমতঃ সত্য নবীকে মিথ্যা দাবীদার বলা কম যুলুম নয় । তারপর তার উপর আরো এ অতিরিক্ত যুলুম করা যে-আহবানকারী তো খোদার বন্দেগীর ও আনুগত্যের দিকে আহবান করে আর শ্রবণকারী তার উত্তরে তাকে গালিমন্দ দেয় ও তাকে হতমান করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অপবাদ এবং কল্পিত দোষারোপ প্রভৃতি অপকৌশল অবলম্বন করে !

৯. তিনিই তো নিজের রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন উহাকে সর্ব প্রকারের দ্বীনের উপর বিজয়ী করিয়া দেয়,-তাহা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হউক না কেন ।

রুকূ ঃ ২

১০. হে লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, আমি কি তোমাদিগকে সেই ব্যবসায়ের[১] কথা বলিব যাহা তোমাদিগকে পীড়াদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে ?

১১. তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি । আর জিহাদ কর আল্লাহ'র পথে মাল-সম্পদ ও নিজেদের জানপ্রাণ দ্বারা । ইহাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান ।

১২. আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্-খাতা মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাইবেন যে সবের নীচ দিয়া ঝর্ণা ধারা সদা প্রবাহিত

১। ব্যবসায়ে মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের অর্থ, শ্রম, সময়, বুদ্ধি ও যোগ্যতা নিয়োগ করে থাকে । এই হিসাবে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসায় বলা হয়েছে । মর্ম হচ্ছে-যদি এই পথে নিজেদের সবকিছু নিয়োগ কর তবে তোমরা সেই লাভ প্রাপ্ত হবে যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

এবং | বাসগৃহসমূহ | উত্তম | মধ্যে | জান্নাতের | চিরস্থায়ী | এটা | সাফল্য | মহা

وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَ بَشِّرِ

এবং | অন্যটি | যা তোমরা পছন্দ কর | সাহায্য | থেকে | আল্লাহর | ও | বিজয় | আসন্ন | এবং | সুসংবাদ দাও

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ

মুমিনদের | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা হও | সাহায্যকারী | আল্লাহর | যেমন | বলেছিল

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ

ঈসা | তণয় | মারয়ামের | হাওয়ারীদেরকে | কে | আমার সাহায্যকারী | দিকে | আল্লাহর | বলেছিল

الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

হাওয়ারীরা | আমরা | সাহায্যকারী | আল্লাহর | অতঃপর | ঈমান আনল | একদল | মধ্যে | বনী | ইসরাইল

وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ج فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ

এবং | কুফরি করল | এক দল | অতঃপর | আমরা সাহায্য করলাম | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছিল | উপর | তাদের দুশমনের

فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

অতঃপর | তারা হলো | বিজয়ী

এবং চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদিগকে দান করিবেন । ইহা বড় সাফল্য ।

১৩. আর অন্যান্য যেসব জিনিস তোমরা চাহ, তাহাও তোমাদিগকে দিবেন । আল্লাহ'র মদদ এবং খুব নিকটবর্তী বিজয় । হে নবী ! ঈমানদার লোকদিগকে ইহার সুসংবাদ জানাইয়া দাও ।

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর সাহায্যকারী হও । যেমন করিয়া ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম হাওয়ারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ কে আছ আল্লাহর দিকে (আহবান জানাইবার কাজে) আমার সাহায্যকারী'? এবং হাওয়ারীগণ জওয়াব দিয়াছিল; "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী? এই সময় বনী ইসরাঈলের একটি দল ঈমান আনিল, আর অন্য লোক-সমষ্টি অস্বীকার করিল । পরে আমরা ঈমান গ্রহণকারীদের তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলাম । আর তাহারাই বিজয়ী হইয়া থাকিল[১০]।

১০। 'মসিহ'র অমান্যকারীরা হচ্ছে ইহুদী এবং তাঁর মান্যকারীদের অন্তর্গত হচ্ছে-খ্রীষ্টান ও মুসলমান । আল্লাহতা'আলা প্রথমে খ্রীষ্টানদেরকে ইহুদীদের উপর বিজয়ী করেন । তারপর মুসলমানরাও তাদের উপর বিজয়ী হয় । এইভাবে মসিহ'র অমান্যকারীরা উভয়েরই কাছে পরাজিত হয়েছে । এখানে এ ব্যাপারে মুসলমানদের এই বিশ্বাস দানের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে-ভাবে পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মান্যকারীরা তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী হয়েছে সেরূপভাবেই এখন মহম্মদের (সঃ) মান্যকারীরাও তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয় হবে ।

সূরা আল-জুমু'আ

নামকরণ

নবম আয়াতের অংশ اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة হতে এ সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে । এ সূরায় জুমু'আর নামাযের বিধানও উল্লেখিত হয়েছে বটে, কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়াদির দৃষ্টিতে জুমু'আ এর সামষ্টিক শিরোনাম নয় । অন্যান্য সূরার মত এখানেও একটি চিহ্ন হিসাবে এ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার প্রথম রুকু'র আয়াতসমূহ ৭ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে । আর সম্ভবতঃ তা 'খায়বার' বিজয়কালে কিংবা তারপর নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে । বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে জরীর হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) র একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন । তাতে তিনি বলেছেনঃ আমরা নবী করীমের (সঃ) দরবারে বসেছিলাম, সে সময়ই এ আয়াত নাযিল হয়েছে । আর ইতিহাস হতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হুদাইবিয়া সন্ধির পর ও খায়বর বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন । আর ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী খায়বর বিজয় ৭ম হিজরীর মুহাররমে, আর ইবনে সা'আদের কথানুযায়ী (ঐ বছরের) জমাদিয়াল আউ'আল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । অতএব অনুমান করা যায়, ইহুদীদের এ সর্বশেষ প্রাণ-কেন্দ্র জয় করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক এ আয়াতসমূহ নাযিল করে থাকবেন । কিন্তু এ নাযিল হয়েছে তখন যখন খায়বর-এর পরিণতি-দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদী বসতিগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিল ।

সূরার দ্বিতীয় রুকু'র আয়াতসমূহ হিজরাতের পর নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে । কেননা নবী করীম (সঃ) মদীনা শরীফ উপস্থিত হয়েই পঞ্চম দিনে জুমু'আর নামায কায়েম করেছিলেন । আর এ রুকু'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা স্পষ্ট বলছে যে, 'জুমুআ' কায়েম হওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হওয়ার পর তা অবশ্যই এমন কোনসময় সংঘটিত হয়ে থাকবে, যখন লোকেরা দ্বীনী সভা-সম্মেলনের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা তখনও পর্যন্ত পুরামাত্রায় শিক্ষালাভ করতে পারেনি ।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

ওপরে যেমন আমরা বলেছি, এ সূরা'র দুটো রুকু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে । এ কারণে উভয়ের মূল আলোচ্য বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন, আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । এ দু'টো অংশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে বলেই এ দু'টো অংশকে একই সূরা'র মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে । কিন্তু এ সামঞ্জস্য কি তা জানবার পূর্বে উভয় অংশের আলোচ্য বিষয় আলাদা আলাদা ভাবেই বুঝবার জন্যে আমাদেরকে চেষ্টিত হতে হবে ।

প্রথম রুকু'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তখন, যখন ইসলামী দা'ওয়াতের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ইহুদীদের বিগত ছ' বছরের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল । প্রথম দিকে মদীনায় তাদের তিন-তিনটি শক্তিশালী গোত্র রসূলে করীম (সঃ)-কে দুর্বল করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালায় । আর এর ফল তারা এ দেখতে পেল যে, একটা গোত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল । আর দু'টো গোত্রকে নির্বাসিত হতে হ'ল । পরে তারা ষড়যন্ত্র ও যোগ-সাজশ করে আরবের বহু কয়টি গোত্রকে মদীনার ওপর চড়াও হতে আহবান জানালো । কিন্তু আহযাব যুদ্ধে সকলেই আঘাত খেল । এর পর তাদের সর্বাপেক্ষা বড় লীলাকেন্দ্র ছিল খায়বর । মদীনা হতে বহির্গত বহুসংখ্যক ইহুদী এখানে এসে একত্রিত হয়েছিল । এ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় তাও খুব সহজেই জয় হয়ে গিয়েছিল । আর ইহুদীরা নিজেরা আবেদন-নিবেদন করে তথায় মুসলমানদের জমি চাষকারী

হিসাবে বসবাস করার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। এই শেষ পরাজয়ের পরে আরবে ইহুদী শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তাইমা, তাবুক- সবই এক এক করে অস্ত্র সংবরণ করলো। শেষ পর্যন্ত আরবের সমস্ত ইহুদী সেই ইসলামের অধীন সাধারণ প্রজা হয়ে বসবাস করতে লাগলো যার অস্তিত্ব সহ্য করা তো দূরের কথা, এর নাম শুনতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। ঠিক এ সময়ই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহতা'আলা আর একবার তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বললেন। আর সম্ভবতঃ কুরআন মজীদে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা এই শেষ বারের কথা। এ প্রসংগে তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনটি কথা বলা হয়েছেঃ

১. তোমরা এ রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছ শুধু এই জন্যে যে, তিনি সেই জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন যাদেরকে ঘৃণা করে তোমরা 'উম্মী' বলতে। তোমাদের মনে এ ভিত্তিহীন ধারণা জন্মেছিল যে, রসূল অবশ্যই তোমাদের নিজ জাতির লোকদের মধ্যে হতে হবে। তোমরা এ সিদ্ধান্ত করে বসেছিলে যে, তোমাদের নিজেদের জাতির বাইরে যে লোকটি রসূল হওয়ার দাবী করবে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবে। কেননা তোমাদের ধারণায় এ পদটি কেবলমাত্র তোমাদের বংশের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। 'উম্মী'দের মধ্যে কখনই কোন নবী আসতে পারে না, এটাই তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ এ উম্মীদের মধ্যেই একজন রসূল পাঠালেন। তিনি তোমাদের চোখের সামনেই আল্লাহর কিতাব শুনাচ্ছেন, লোকদের আত্মা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি করান এবং যাদের গুমরাহীর কথা তোমরা জান, তিনি তাদেরকেই হেদায়াত দান করছেন। মূলতঃ এ আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপার। তিনি যাকে এ দেন, সেই এ পেতে পারে। তাঁর অনুগ্রহ দানের ওপর তোমাদের তো কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা নেই। কাজেই তোমরা যাকে চাইবে তাকেই তিনি এ'দান করবেন, আর তোমরা যাকে না দিতে তথা বঞ্চিত রাখতে চাইবে তাকে বঞ্চিত করা হবে, এমনটা হওয়া তো সম্ভবপর নয়। কেননা তার ওপর তোমাদের কোন একচেটিয়া কর্তৃত্ব নেই।

২. তোমাদেরকে তওরাত কিতাবের বাহক বানানো হয়েছিল। কিন্তু তার কোন দায়িত্বই তোমরা বুঝতে পার নি, পালনও কর নি। যেসব গাধার পিঠে কিতাবাদি বহন করা হয়, তোমাদের অবস্থা ঠিক তাদের মতই। এ গাধারা জানে না যে, তারা কোন জিনিসের বোঝা বহন করছে। তোমরাও জান না কোন্ জিনিসের বাহন তোমাদেরকে বানানো হয়েছে। বরং তোমাদের অবস্থা গর্দভ হতেও নিকৃষ্ট। গর্দভের তো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কিন্তু তোমাদের তো তা আছে। উপরন্তু তোমরা আল্লাহর কিতাবের ধারক হওয়ার দায়িত্ব হতে শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছ না, জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতে ও অস্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হও না। এ সত্ত্বেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং রেসালতের নিআমত চিরদিনের জন্যে কেবল তোমাদের নামেই লিখে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছো। সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবের 'হক্ব' আদায় কর আর না-ই কর, সর্বাবস্থায় আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকেই তাঁর কিতাবের ধারক ও বাহক বানাতে একান্তভাবে বাধ্য।

৩. তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর 'আদুরে ও প্রিয় পাত্র' হতে এবং তাঁর নিকট তোমাদের জন্যে বড় মান-সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষিত রয়েছে- এ বিষয়ে যদি তোমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকত তাহলে তোমাদের মনে মৃত্যু ভয় এতটা তীব্র হ'ত না যে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জীবন কবুল, কিন্তু মরতে প্রস্তুত নও কোন ক্রমেই। মূলতঃ এ মৃত্যুর ভয়ই এমন যে, এর কারণেই তোমরা বিগত কয়েক বছর পর্যন্ত পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছ। তোমাদের এ অবস্থা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছ। এ সব কার্যকলাপ নিয়ে মরলে আল্লাহর নিকট দুনিয়া অপেক্ষাও অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে বাধ্য হবে- এ বিষয়ে তোমাদের মন ও বিবেক খুব বেশী সজাগ ও নিঃসন্দেহ।

প্রথম রুকু'র আয়াতসমূহে বলা কথার সার ও নির্যাস এটাই। এরপর এর দ্বিতীয় রুকু'র আয়াতসমূহ। এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল কয়েক বৎসর পূর্বে। একটি বিশেষ সম্পর্ক-সামঞ্জস্যের কারণে তা এ সূরায় শামিল করে দেয়া হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহতা'আলা ইহুদীদের জন্য 'সাবত্' বা শনিবারের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে 'জুমু'আ' দান করেছেন। তিনি মুসলমানগণকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছা করেছেন যে, তারা যেন 'জু'আর' সংগে সেরূপ আচরণ না করে যা ইহুদীরা করেছে 'সাবত্' এর সংগে। এর রুকু'র আয়াতসমূহ নাযিল

হয়েছিল ঠিক সে সময় যখন এক জুমু'আর দিনে নামাযের সময় মদীনায় এক ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল এবং তার ঢোল-বাদ্যের আওয়াজ শুনে মাত্র বার জন লোক ছাড়া উপস্থিত সমস্ত নামাযী মসজিদে নববী হতে বের হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল । অথচ এ সময় রসূলে করীম (সঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন । এ কারণেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জুমু'আর আযান হওয়ার পর সর্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয়,ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সব ব্যস্ততা সম্পূর্ণ হারাম । এ সময় সমস্ত কাজ-কর্ম পরিহার করে আল্লাহর যিক্র-এর জন্য দৌড়ে যাওয়া ঈমানদার লোকদের কর্তব্য । তবে নামায শেষ হওয়ার পর নিজেদের কাজ-কারবার চালাবার জন্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার অধিকার তাদের রয়েছে । জুমু'আর নামায সংক্রান্ত হুকুম-আহ্‌কাম সম্বলিত এ রুকূ'টিকে একটা স্বতন্ত্র সূরাও বানানো যেত । কিংবা অন্য কোন সূরায়ও একে শামিল করে দেয়া অসম্ভব ছিল না । কিন্তু তা করা হয়নি । তার পরিবর্তে বিশেষভাবে এ আয়াত ক'টিতে এখানে সে আয়াতসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে ইহুদীদের মর্মান্তিক দুঃখময় পরিণতির কার্যকারণ উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে । আমাদের বিবেচনায় এর অন্তর্নিহিত মূল কথা যা তাই আমরা উপরে লিখেছি ।

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

মহিমা ঘোষণা করে | আল্লাহরই | যা (আছে) মধ্যে | জগতের আকাশ | ও | যা (আছে) মধ্যে | পৃথিবীর | অধিপতি | মহান পবিত্র

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

রুকূ ঃ ১

১. আল্লাহর তসবীহ্ করিতেছে, এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশ মন্ডলে রহিয়াছে এবং এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা পৃথিবীতে রহিয়াছে- রাজাধিরাজ, মহান-পবিত্র, মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী তিনি ।

২. এ তিনিই যিনি উম্মীদের[১] মধ্যে একজন রসূল স্বয়ং তাহাদেরই মধ্য হইতে দাঁড় করিয়াছেন যিনি তাহাদিগকে তাঁহার আয়াত শুনান, তাহাদের জীবন পরিশুদ্ধ-সুগঠিত করেন এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। অথচ ইহার পূর্বে তাহারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।

৩. আর (এই রসূলের আগমন) অন্যান্য সেইসব লোকদের জন্যও যাহারা এখনও তাহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয় নাই[২]। আল্লাহ্ মহা শক্তিধর এবং সবকিছুর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত[৩]।

৪. ইহা তাঁহার অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে চাহেন, ইহা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহদানকারী।

১। এখানে ইহুদী পরিভাষা হিসাবে 'উম্মী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; এবং এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন আছে। এর মর্ম হচ্ছে, যে আরবদেরকে ইহুদীরা তাচ্ছিল্যের সংগে নিরক্ষর বলে ও নিজেদের তুলনায় হীন মনে করে সর্বজ্ঞাতা সর্বজয়ী আল্লাহ তাঁদেরই মধ্যে এক রসূল উত্থিত করেছেন। রসূল নিজে উত্থিত হননি, বরং তাঁর উত্থানকারী হচ্ছেন তিনি যিনি এই বিশ্ব-জগতের সম্রাট, প্রবল ও বিজ্ঞ; যাঁর শক্তির সংগে সংগ্রাম করে এসব লোক নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাঁর কিছু ক্ষতি তারা করতে পারবে না।

২। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালত মাত্র আরব জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং সারা দুনিয়ার সেইসব অন্যান্য জাতি ও বংশের জন্যেও তিনি নবী, যারা এখনও এসে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৩। অর্থাৎ এ তাঁরই শক্তি ও জ্ঞান-মহিমা যে, তিনি এরূপ অসংস্কৃত উম্মী কওমের মধ্যে এরূপ মহান নবী পয়দা করেছেন যাঁর শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দেশ এরূপ উন্নত বিপ্লবাত্মক ও এরূপ বিশ্বজনীন চিরন্তন নীতিসমূহের ধারক যে- তার উপর সমগ্র মানব জাতি মিলিত হয়ে একটি উম্মতে (আদর্শগত দলে) পরিণত হতে পারে, এবং চিরকাল সেই আদর্শ ও নীতিসমূহ থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে পারে।

৫. যেসব লোককে তওরাতের ধারক বানানো হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার ভার বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায়, যাহার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হইল সেই সব লোকেরা, যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করিয়া অমান্য করিয়াছে[৪]। এই ধরনের যালেম লোকদিগকে আল্লাহতা'আলা হেদায়াত দান করেন না।

৬. এই লোকদিগকে বল ঃ "হে লোকেরা, যাহারা ইয়াহুদী হইয়া গিয়াছে[৫], তোমাদের যদি এই আত্ম-অহংকার থাকিয়া থাকে যে, অন্যান্য সব লোককে বাদ দিয়া কেবল তোমরাই আল্লাহর আহলাদের দুলাল! তাহা হইলে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের এই আত্মবিশ্বাসে সত্য হইয়া থাক[৬]

৪। অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধা থেকেও নিকৃষ্টতর। গাধার জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকায় সে নিরুপায়। কিন্তু এ সব লোক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তওরাত পড়ে ও পড়ায় ও এর অর্থ তারা অজ্ঞাত নয়, তবুও এর পথ-নির্দেশ থেকে তারা জেনেশুনে বিচ্যুত হচ্ছে; এবং সেই নবীকেও তারা মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে তওরাত অনুসারে যিনি সম্পূর্ণরূপে সত্য নবী। এরা না বুঝতে পারার দোষে দোষী নয় বরং এরা জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ করার অপরাধে অপরাধী।

৫। এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে হে "ইহুদীগণ" বলা হয়নি, বরং "হে লোকেরা যাহারা ইহুদী হইয়া গিয়াছে" বা "যারা ইহুদীত্ব গ্রহণ করেছো" বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে- আসল ধর্ম যা মুসা (আঃ) এবং তাঁর পূর্বের ও পরের নবীরা এনেছিলেন তা তো ছিল 'ইসলাম'ই। এই নবীগণের মধ্যে কেউই ইহুদী ছিলেন না, এবং তাঁদের সময়ে ইহুদীত্বের জন্মই হয়নি। এই নামসহ এই ধর্ম-মত অনেক পরে সৃষ্ট হয়েছে।

৬। আরবের ইহুদীরা নিজেদের সংখ্যা ও শক্তিতে মুসলমানদের থেকে কোন প্রকারে কম ছিল না, এবং উপায় উপকরণের দিক থেকেও অনেক সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু এই অ-সমান দ্বন্দ্বে যে জিনিস মুসলমানদের বিজয়ী ও ইহুদীদেরকে পরাজিত করেছিল তা হচ্ছে মুসলমানেরা খোদার পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তারা এ মৃত্যু বরণের জন্যে উৎসুক ছিল। এবং তারা প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হত। পক্ষান্তরে ইহুদীদের অবস্থা ছিল- তারা কোন পথেই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল না, না খোদার পথে, না জাতির পথে, না নিজের প্রাণ, ধন ও সম্মানের পথে। তাদের শুধু প্রয়োজন ছিল জীবনের, সে জীবন যেরূপই হোক না কেন। এই জিনিসই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ করে রেখেছিল।

وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

খুবঅবহিত　আল্লাহ　এবং　তাদের হাতগুলো　আগে পাঠিয়েছে　যা একারণে　কখনও　তাকামনা করবে তারা　না　এবং

بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ

তা অতঃপর নিশ্চয়　তা থেকে　তোমরা পলায়ন কর　যা (থেকে)　মৃত্যু　নিশ্চয়　বল　যালিমদের সম্পর্কে

مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ

দৃশ্যের　ও　অদৃশ্যের　পরিজ্ঞাতার　দিকে　তোমরা প্রত্যানীত হবে　এরপর　তোমাদের মিলবে

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا

যখন　ঈমান এনেছ　যারা　ওহে　তোমরা কাজ করতেছিলে　যা কিছু　তোমাদের অতঃপর জানিয়ে দিবেন

نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ

ও　আল্লাহর　স্মরণের　দিকে　তোমরা ধাবিত হও তখন　জুমুয়া'র　দিনে　নামাজের জন্যে　ডাকা হয়

ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ

কেনাবেচা　ত্যাগকর

৭. কিন্তু আসলে ইহারা কক্ষণই এইরূপ কামনা করিবে না, তাহারা যেসব কীর্তি-কলাপ করিয়াছে সেই কারণে । আর আল্লাহ এই যালেম লোকদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন ।

৮. ইহাদিগকে বলঃ "যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইতেছ তাহাতো তোমাদের নিকট আসিবেই । অতঃপর তোমরা সেই মহান সত্তার নিকট উপস্থাপিত হইবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন । আর তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহা সবই, যাহা তোমরা করিতেছিলে ।"

রুকু ঃ ২

৯. হে সেই লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেওয়া হইবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর[৭] ।

৭। এই আদেশে 'যিকর'-এর অর্থ খোতবা । কেননা আযানের পর প্রথম কাজ যা নবী (সঃ) সম্পাদন করতেন তা নামায নয় বরং খোতবা । আর তিনি নামায সর্বদা খোতবার পরে আদায় করতেন । আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও-এর মর্ম এই নয় যে দৌড়াদৌড়ি করে এসো বরং এর মর্ম হচ্ছে- যথা সত্বর ওখানে পৌছাবার চেষ্টা করা । "কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর"- এর মর্ম মাত্র ক্রয় ও বিক্রয় ত্যাগ করা নয় বরং নামাযের জন্যে যাওয়ার চিন্তা ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যস্ততা ও তৎপরতা ত্যাগ করা । ইসলামী ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে একমত যে, জুম'আর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় ও প্রত্যেক প্রকারের কারবার নিষিদ্ধ । অবশ্য হাদীস অনুযায়ী নাবালক, স্ত্রীলোক, দাস, রোগী ও মুসাফিরদেরকে জুম'আর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে ।

ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম-যদি তোমরা জান।

১০. পরে নামায সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান কর[৮]। আর আল্লাহকে খুব বেশী বেশী যখন স্মরণ করিতে থাক। সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্যলাভ করিতে পারিবে[৯]।

১১. আর তাহারা যখন ব্যবসায় বা খেল-তামাশা হইতে দেখিল, তখন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুত চলিয়া গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া গেল[১০]।

৮। এর মর্ম এই নয় যে, জুম'আর নামাজের পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ও জীবিকা সন্ধানে দৌড়-ধাপে লিপ্ত হওয়া জরুরী। বরং এ এরশাদ অনুমতির অর্থে করা হয়েছে। জুম'আর আযান শ্রবণে সমস্ত কারবার ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল; এজন্য বলা হলো নামায শেষ হওয়ার পর তোমাদের অনুমতি দেয়া গেল, তোমরা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাও এবং নিজেদের কোনকাজ কারবার করতে চাও তো কর। এহরাম সমাপ্তিতে শিকারের অনুমতির সংগে একথা তুলনীয়। যেমন এহরামের অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ ক'রে তারপর বলা হয়েছে- যখন তোমরা এহরাম থেকে মুক্ত হও,তখন শিকার কর (সূরা মায়েদা, আয়াত-২)। এর মর্ম এই নয় যে- তোমরা অবশ্যই শিকার কর, বরং এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা এরপর শিকার করতে পারো। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে যারা এ যুক্তি পেশ করে যে কুরআন অনুসারে ইসলামে জুম'আর ছুটি নেই তারা ভুল কথা বলে। সপ্তাহে যদি একদিন ছুটি করতে হয় তবে মুসলমানদের জুম'আর দিনে তা করা উচিত যেমন ইহুদীরা শনিবার ও খৃষ্টানরা রবিবার ক'রে থাকে।

৯। এ রকম অবস্থায়-------- 'সম্ভবতঃ' শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ তায়ালার মা-আয-আল্লাহ্ কোন সন্দেহ আছে। বরং আসলে এটা রাজকীয় বর্ণনার ধরন। যেমন কোন দয়ালু প্রভু নিজের কর্মচারীকে বলে- 'তুমি অমুক খেদমত আঞ্জাম দাও, সম্ভবতঃ এ দ্বারা তোমাদের পদোন্নতি মিলতে পারে।' এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিশ্রুতি প্রচ্ছন্ন থাকে; যার আশায় কর্মচারী আন্তরিক আগ্রহে ও উৎসাহের সংগে সেই খেদমত আঞ্জাম দেয়।

১০। এ মদীনার প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সিরিয়া থেকে একটি তেজারতী কাফেলা (ব্যবসায়ী দল) ঠিক জুম'আর নামাযের সময় এসেছিলো; বস্তির লোকদের তাদের আগমন সংবাদ জানানোর জন্যে তারা ঢোল-তাশা বাজাতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সে সময়ে খোত্‌বা দান করছিলেন। ঢোল-তাশার শব্দ শুনে অধীর হ'য়ে বারোজন ছাড়া বাকী সব লোক কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়।

তাহাদিগকে বলঃ আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে তাহা খেল- তামাশা ও ব্যবসায় অপেক্ষা উত্তম[১১]। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিক্‌দাতা[১২]।

১১। সাহাবাদের দ্বারা যে ত্রুটি ঘটেছিল এই বাক্যাংশে তার প্রকৃতি সূচিত হয়েছে। যদি-মাআয-আল্লাহ- এর কারণ ঈমানের কমি ও পরকালের উপর দুনিয়াকে জ্ঞাতসারে অগ্রগণ্যতা দেয়া হতো, তবে আল্লাহতা'আলার ক্রোধ ধমকি ও তিরস্কারের ধরন অন্যরূপ হতো। কিন্তু যেহেতু সেখানে এরূপ কোন খারাবি ছিল না বরং যা কিছু ঘটেছিল তা তরবিয়তের (শিক্ষার) কমির জন্যে ঘটেছিল, এজন্যে প্রথমে শিক্ষাসুলভ পদ্ধতিতে জুম'আর শিষ্টাচার নির্দেশ করা হয়েছে, তারপর ঐ ত্রুটি নির্দেশ করে অভিভাবকসুলভ ধরনে বুঝানো হয়েছে যে জুম'আর খোত্‌বা (ভাষণ) শোনার ও জুম'আর নামায আদায় করার জন্যে খোদার কাছে যা-কিছু তোমরা প্রতিদান পাবে, তা এই দুনিয়ার ব্যবসায় ও খেলা-তামাশা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

১২। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে অপ্রকৃত অর্থে যে কেউই জীবিকা দানের উপায় স্বরূপ হোকনা কেন, তাদের সকলের চেয়ে উত্তম জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহতা'আলা।

সূরা আল্‌-মুনাফিকুন

নামকরণ

সূরা'র প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ হ'তে এ নামটি গৃহীত । মূলতঃ এটা এ সূরাটির নাম এবং এতে আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনামাও । কেননা এ গোটা সূরাতে মুনাফিকদের আচরণ ও কর্মনীতির সমালোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রসূলে করীমের প্রত্যাবর্তনকালে এই সূরাটি নাযিল হয়, কিংবা মদীনায় পৌছে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই এটা নাযিল হয়েছে । 'সূরা নূর'-এর আলোচনা-ভূমিকায় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি যে, বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরী সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল । এ সূরাটির নাযিল হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস এভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় ।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে; তার উল্লেখের পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাস পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক । কেননা যে বিশেষ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাযিল হয়, তা কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না । তার পশ্চাতে বহু ঘটনা পরম্পরার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং অই শেষ পর্যন্ত সেই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে ।

(মক্কা হতে হিজরতের পর) মদীনা শরীফে নবী করীমের (সঃ) উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আওস্‌ ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ার পর শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্যে জনগণ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছিল । তাকে নিজেদের বাদশাহ বানিয়ে তার রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান পালনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল । তার জন্যে মুকুটও তৈরী করা হয়েছিল । এই লোকটি ছিল খাযরাজ গোত্রের প্রবীন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সালুল । ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, খাযরাজ গোত্রে তার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি সর্বজনমান্য ছিল । যদিও আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই ইতিপূর্বে আর কোন এক ব্যক্তির-নেতৃত্ব কর্তৃত্বে কখনই একত্রিত ও সুসংঘবদ্ধ হয় নি । (ইবনে হিশাম-২য় খন্ড, ২৩৪ পৃঃ)

ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে গেল এবং এই দুইটি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ইসলাম কবুল করতে শুরু করলো । হিজরতের পূর্বে 'আকাবা'র দ্বিতীয় বয়'আত-কালে যখন নবী করীম (সঃ)-কে মদীনা যাওয়ার আহবান জানানো হচ্ছিল, তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাজলা আনছারী এই আহবান বিলম্বিত করতে চাচ্ছিলেন এই কথা চিন্তা করে যে, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইও এই বয়'আত ও আহবানে যেন শরীক হতে পারে । তাহলে মদীনা সর্বসম্মতভাবে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হতে পারে । কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বয়'আতের জন্যে হাযির হয়েছিল, তারা এরূপ সমঝোতামূলক চিন্তার প্রতি কোনই গুরুত্ব আরোপ করলো না । প্রতিনিধি দলে শামিল উভয় গোত্রের ৭৫জন লোক সর্বপ্রকারের বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নবী করীম (সঃ)-কে মদীনায় আগমনের আহবান জানালেন (-ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড ৮৯ পৃঃ) । সূরা আনফাল-এর আলোচনা ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা পেশ করে এসেছি ।

এর পর নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপস্থিত হলেন । তাঁর মদীনা পৌছাবার পূর্বেই আনসারদের প্রত্যেকটি ঘরে ও পরিবারে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল । এ কারণে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই অসহায় হয়ে পড়লো ।

স্বীয় নেতৃত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অন্যান্যদের ন্যায় নিজেরও মুসলমান হওয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায়ই থাকলো না । এ কারণে সে উভয় গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তার বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো । কিন্তু তাদের এই ইসলাম গ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও লোক দেখানো ব্যাপার । ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের তীব্রতায় তাদের সকলের অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল । বিশেষভাবে ইবনে উবাইর মনে বড়ই দুঃখ ও হতাশা জন্মেছিল এই জন্যে যে, রসূলে করীম (সঃ) তার সম্ভাব্য বাদশাহী কেড়ে নিচ্ছিলেন । তার এই মুনাফিকীতে ভরা ঈমান ও স্বীয় বাদশাহী হারাবার এই দুঃখ ও ক্ষোভ কয়েকটি বছর ধরে নানাভাবে বিস্ফোরিত হতে থাকে । এক দিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রত্যেক জুম'আয় নবী করীম (সঃ) যখনই খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বারের উপর বসতেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করে বলতোঃ ভাইসব ! আল্লাহর এই রসূল আপনাদের সামনে রয়েছেন । এর কারণে আল্লাহতা'আলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন । কাজেই আপনারা সকলে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করুন । তিনি যা কিছু বলেন, তা মনোযোগ সহকারে শুনুন ও তাঁর আনুগত্য করুন (-ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃঃ) । আর অপর দিকে অবস্থা এই ছিল যে, প্রত্যেক দিনই তার মুনাফিকীর গোপন কারসাজী প্রকাশ হয়ে পড়তো ও প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের নিকট এই তত্ত্ব উদঘাটিত হয়ে পড়তো যে, এই লোকটি এবং এর সংগী-সাথীদের মনে ইসলাম, রসূলে করীম (সঃ) ও মুসলমান সমাজের প্রতি কঠিন শত্রুতা ও বিদ্বেষ রয়েছে ।

নবী করীম (সঃ) একবার একটা পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখন ইবনে উবাই নবী করীমের (সঃ) সাথে বেআদবীমূলক আচরণ করলো । তিনি হযরত সা'আদ ইবনে উবাদাহর নিকট এর উল্লেখ করলেন । হযরত সা'আদ বললেন ঃ হে রসূল ! এই লোকটির প্রতি আপনি দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করুন । কেননা আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্যে রাজমুকুট তৈরী করেছিলাম । এক্ষণে এই লোকটি মনে করে, আপনিই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন । (- ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ২৩৭ পৃঃ ।)

বদর যুদ্ধের পর বনু কাইনুকার ইহুদীদের সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাকতা ও অকারণ সীমালংঘনমূলক আচরণের দরুন নবী করীম (সঃ) যখন তাদের উপর আক্রমণ করলেন, তখন এই লোকটি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে এবং নবী করীমের বর্ম ধরে বলতে লাগলো, 'এই সাত'শ যুদ্ধ পারদর্শী বীর পুরুষ প্রত্যেক দুশমনের মুকাবিলায় আমার সংগে সহযোগিতা করেছে, এদেরকে আজ আপনি এক দিনে শেষ করে দিতে চান? খোদার শপথ । আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই মিত্রদেরকে নিষ্কৃতি না দিবেন, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না ।" (-ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, ৫১-৫২ পৃঃ)

ওহুদ যুদ্ধকালে এ লোকটি সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো । সম্মুখ সমরের পূর্ব মুহূর্তে নিজের তিন শ' সংগী-সাথী নিয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে পিছনে হটে গেল । অথচ এটা ছিল অত্যন্ত জটিল মুহূর্ত । অনুমান করা যেতে পারে, কুরাইশরা তিন সহস্র লোকের বাহিনী নিয়ে মদীনার উপর হামলা চালাবার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছে । রসূলে করীম (সঃ) তাদের মুকাবিলায় মাত্র একহাজার ব্যক্তি নিয়ে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এ এক হাজার লোকের মধ্য হতেও 'তিনশ' ব্যক্তি ময়দান হতে বের হয়ে চলে গেল । ফলে নবী করীম (সঃ) মাত্র সাতশ' মুজাহিদ সংগে নিয়ে তিন হাজার লোকের শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন । অবস্থার নাজুকতা ও সময়ের গুরুত্ব বিচারেও ইবনে উবাইর এই কাজটি যে কত বড় অপরাধ ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারা যায় ।

এ ঘটনার পর মদিনায় সর্বসাধারণ মুসলমানের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুনাফিক । মুনাফিকী কাজে তার যে সব সংগী-সাথী রয়েছে, তারাও রীতিমত চিহ্নিত হ'ল । এই কারণে ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তী প্রথম জুম'আয় রসূলে করীমের (সঃ) খুত্বা দেওয়ার প্রাক্কালে এই ব্যক্তি যখন পূর্বানুরূপ বক্তৃতা করতে উঠলো, তখন লোকেরা তার গায়ের জামা ধরে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ 'বসে পড় এসব কথা তোমার মত লোকের মুখে শোভা পায় না ।' মদীনায় এ প্রথমবার প্রকাশ্যভাবে এ লোকটিকে অপমানিত করা হ'ল । ফলে লোকটি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল ও বসা লোকদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে মসজিদের বাইরে চলে গেল । মসজিদের দ্বারদেশে কিছু সংখ্যক আনসার তাকে বললেন ঃ 'কি করছো ? ফিরে গিয়ে রসূলে করীমের নিকট মাগফিরাত

চাওয়ার জন্য দরখাস্ত কর।' লোকটি রাগতঃস্বরে বললো, আমি তার দ্বারা কোন ইস্তিগ্‌ফার করাতে চাই না।' (-ইব্‌নে হিশাম, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃঃ)

৪র্থ হিজরী সনে বনুনযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় এ ব্যক্তি ও তার সংগী-সাথীরা অধিকতর প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রু পক্ষের সাহায্য ও সমর্থন করে। একদিকে রসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁর জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আর অপরদিকে মুনাফিকরা গোপনে ও ভিতরে ইহুদীদেরকে শক্ত হয়ে থাকার পরামর্শ পাঠাচ্ছিল এবং জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হ'লে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। আর তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করা হ'লে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব। তাদের এই গোপন কারসাজির কথা আল্লাহতা'আলা নিজেই প্রকাশ করে দিলেন। সূরা হাশর-এর দ্বিতীয় রুকু'তে এ কথা আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু সেই লোকটির এবং তার সংগী-সাথীদের এই মুনাফিকী প্রকাশিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও রসূলে করীম (সঃ) লোকটির প্রতি মার্জনামূলক আচরণ করছিলেন। তার কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদের একটা বিরাট বাহিনী তার সাথে যুক্ত হয়েছিল। আওস্ ও খাযরাজ উভয় গোত্রের বহু সরদার ছিল তার বড় সমর্থক। মদীনার অধিবাসীদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ তার সংগী হয়েছিল- ওহুদ যুদ্ধকালে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরূপ অবস্থায় বাইরের শত্রুদের সাথে লড়াই করার সময় ভিতরের শত্রুদের সংগেও লড়াই সৃষ্টি করা কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না। এ কারণে মুনাফিকদের সব কর্মতৎপরতা জানা থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (সঃ) দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের বাহ্যিক ঈমানের দাবী অনুযায়ীই তাদের প্রতি আচরণ করছিলেন। অন্য দিকে এ লোকদেরও প্রকাশ্যভাবে কাফের হয়ে গিয়ে ঈমানদার লোকদের সাথে যুদ্ধ করবার মতো কিংবা কোন আক্রমণকারী দুশমনের সাথে একত্রিত হয়ে প্রকাশ্যভাবে ময়দানে নেমে যাবার মত দুঃসাহসও তাদের ছিল না; এতটা শক্তির অধিকারীও তারা ছিল না। বাহ্যত : তারা নিজেদের একটা বাহিনী বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের ভিতরেও নানারূপ দুর্বলতা বর্তমান ছিল। সূরা হাশর-এর ১২-১৪ আয়াতে আল্লাহতা'আলা তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার চিত্র সুস্পষ্টভাবে অংকিত করেছেন। এ কারণে তারা বাহ্যতঃ মুসলমান হয়ে থাকাই নিজেদের মঙ্গল মনে ক'রে নিয়েছিল। তারা মসজিদে আসতো, নামাজ পড়তো, যাকাতও দিয়ে দিত। মুখে ঈমানের এমন বড় বড় ও লম্বা-চওড়া দাবী করতো যা করার প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানের জন্যে কোন প্রয়োজনই হ'ত না। তাদের প্রত্যেকটি মুনাফেকী আচরণের হাজারও ব্যাখ্যা তারা পেশ করতো। এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে তারা বিশেষভাবে তাদের নিজস্ব গোত্রের আনসারদেরকে প্রতারিত করতে ও বুঝাতে চাইত যে, আমরাতো তোমাদের সংগেই রয়েছি। আনসার ভ্রাতৃত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর তাদের যেসব ক্ষতি লোকসান হবার আশংকা ছিল, এই সব উপায় অবলম্বন করে তারা সেই সব ক্ষতি লোকসান হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাচ্ছিল। সেই সংগে এই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শামিল থেকে ফায়দা লাভের যত উপায় ও পন্থা সম্ভব হ'ত তা সবই তারা অবলম্বন করতো।

বস্তুতঃ এসব কারণে আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই ও তার সংগী মুনাফিকরা বনুল মুস্তালিক অভিযানে রসূলে করীমের সংগে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। তারা এক সংগে এমন দুটি বড় বড় ফিত্‌নার সৃষ্টি করলো, যা মুসলমানদের সংহতি ও সুসংঘবদ্ধতা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিতে পারতো। কিন্তু কুরআন মজীদের শিক্ষা ও রসূলে করীমের (সঃ) সংস্পর্শে ঈমানদার লোকেরা যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, তার দরুন এ উভয় প্রকারের ফিত্‌নার মূলোৎপাটন যথাসময়ে সম্ভব হয়েছিল। আর এই মুনাফিকরা নিজেরাই লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে থাকলো। তন্মধ্যে একটি ফিত্‌নার উল্লেখ হয়েছে সূরা নূর-এ; আর দ্বিতীয় ফিত্‌নার উল্লেখ এ সূরাটিতে হয়েছে।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী,তাবরানী, ইব্‌নে মারদুইয়া, আবদুর রাজ্জাক, ইব্‌নে জরীর তাবারী, ইব্‌নে সা'আদ ও মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বহু সংখ্যক সনদে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় সেই অভিযানের নাম বলা হয় নি যাতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আর কোন কোন বর্ণনায় একে তাবুক যুদ্ধের ঘট্‌না বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাগাজী (কেবল মাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস) ও জীবনচরিত

বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এই ঘটনাটি বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ-কালে সংঘটিত হয়েছিল । এ পর্যায়ের সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে ঘটনার যে রূপ গড়ে ওঠে তা এই ঃ

মুরাইসী নামক পানির কূপের পার্শ্বে একটি জনবসতি ছিল । বনুল মুস্তালিকদেরকে পরাজিত করার পর মুসলিম বাহিনী এখানে অবস্থান করছিল । এই সময় সহসা পানি নিয়ে দু'ই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় । এদের একজনের নাম ছিল জাহ্‌জাহ্‌ ইব্‌নে মসউদ গিফারী । তিনি ছিলেন হযরত উমরের কর্মচারী । তাঁর ঘোড়া সামলানোর দায়িত্বও এ লোকটিই পালন করতেন । আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সিনান ইব্‌নে আবার আল-জুহানী । তাঁর গোত্র খাযরাজের একটি গোত্রের মিত্র ছিল । ঝগড়া-মুখের তিক্ত কথা-বার্তা ছাড়িয়ে হাতা-হাতি পর্যন্ত পৌঁছেছিল । জাহ্‌জাহ্‌ সিনানকে একটা লাথি মেরেছিলেন । প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে আনসাররা এই ব্যাপারটিকে খুবই অপমানকর মনে করতেন । তখন সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকলেন । আর জাহ্‌জাহ্‌ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্যে আহবান করলেন । ইব্‌নে উবাই এ ঝগড়ার কথা শুনতে পেয়েই আওস ও খাযরাজের লোকদেরকে উস্‌কানি দেয়ার জন্যে চিৎকার ক'রে ক'রে বলতে লাগল ঃ শীঘ্র দৌড়াও এবং মিত্র গোত্রের লোককে সাহায্য কর । অপরদিক হতে কতিপয় মুহাজিরও বার হয়ে আসলেন । খুব বিরাট ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার উপক্রম হ'ল এবং তখন-তখনই আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারতেন এমন এক স্থানে, যেখানে অল্প দিন পূর্বেই এরা সকলে সম্মিলিতভাবে এক দুশমন গোত্রের সাথে লড়াই ক'রে তাকে পরাজিত করে বিজয়ীর বেশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন । চিৎকার শুনে রসূলে করীম (সঃ) বার হয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ---------

'এ বর্বরতার চিৎকার কেন ? তোমরা কোথায়, আর এই জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায় ? (অর্থাৎ এটা তোমাদের জন্যে শোভা পায় না) তোমরা এ ত্যাগ কর । এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ ।' *

তখন উভয় দিকের নেক্‌কার লোকেরা অগ্রসর হয়ে আসলেন এবং ব্যাপারটি সঠিকরূপে মিটমাট করে দিলেন । সিনান জাহ্‌জাহ্‌কে মা'ফ করে দিয়ে সন্ধি করলেন ।

অতঃপর যার যার দিলে মুনাফিকী ছিল, এমন প্রত্যেকটি লোক আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইর নিকট উপস্থিত হ'ল । তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাকে বললো ঃ 'এতদিন তোমার প্রতি তো আমাদের অনেক আশা-ভরসা

* বস্তুত ঃ এই সময় নবী করীমের (সঃ) বলা এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । ইসলামের সঠিক ভাবধারা বুঝবার জন্যে এই কথাটির তাৎপর্য যথার্থভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক । ইসলামের নিয়ম হ'ল দুইজন লোক যদি নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে অন্য লোকদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে চায়, তাহলে তারা বলবে ঃ 'হে মুসলমানরা ! এস, আমাদের সাহায্য কর' । অথবা বলবে, হে লোকেরা ! আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এস । কিন্তু দুইজনের প্রত্যেকেই যদি এরূপে না ডেকে নিজ নিজ গোত্রকে, বংশের লোকদের কিংবা বংশ, গোষ্ঠী বা বর্ণ ও অঞ্চলের ভিত্তিতে লোকদেরকে ডাকে, তবে এটা জাহেলিয়াতের-ইসলামের বিপরীত পদ্ধতির আহবান হবে । আর এই ডাকে সাড়া দিয়ে যারা আসবে, তারা যদি প্রকৃত ব্যাপারে দোষী কে এবং মযলুম কে তা নির্ণয় না করে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে মযলুমের সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোত্র ও গোষ্ঠির সমর্থনে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হলে এটা সম্পূর্ণ জাহেলিয়াতের কাজ হবে । এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়ার শান্তি নয় - বিপর্যয়েরই সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই কারণে রসূলে করীম (সঃ) এই কাজকে অত্যন্ত হীন, নিকৃষ্ট পূতিগন্ধময় ও জঘন্য বলে অভিহিত করেছেন । মুসলমানদেরকে বলেছেন ঃ এই জাহেলিয়াতের ডাকের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? তোমরা তো ইসলামের ভিত্তিতে একটি মিল্লাত হয়েছিলে । এখন 'আনছার' ও 'মুহাজির' নামে ডাকা-ডাকি কি করে হতে পারে ? আর এইরূপ ডাকে তোমরা কোথায় দৌড়িয়ে যাচ্ছ ? আল্লামা সুহাইলী 'রওজুল-উনুফ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে জাহেলিয়াতের আওয়াজ উচ্চারণ করাকে ইসলামী আইনে রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে । কারও মতে তার দন্ড পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত, অন্যদের মতে দশটি । আর তৃতীয়দের মতে অবস্থা অনুপাতে তার দন্ড সাব্যস্ত করতে হবে । কোন কোন অবস্থায় শুধু ভয় প্রদর্শনই যথেষ্ট । কোন কোন অবস্থায় এইরূপ আওয়াজ-উচ্চারণকারীকে কারারুদ্ধ করতে হবে । আর যদি সে অধিক দুষ্কৃতকারী হয়, তা হলে অপরাধীকে আরও অধিক শাস্তি দিতে হবে ।

ছিল। তুমি প্রতিরোধ করছিলেও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এ কাংগালীদের* সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছ।' ইবৃনে উবাই আগে হতেই অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে বসেছিল। লোকদের এই কথা শুনে সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়লো। বললো ঃ 'এ সবকিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম। তোমরাই এই লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। নিজেদের ধন-মাল এদের মধ্যে বন্টন করেছ। শেষ পর্যন্ত এরা ফুলে ফেঁপে খোদ্ আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে গিয়েছে। নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটা তাজা করেছ তোমাদেরকেই ছিন্ন ভিন্ন করার উদ্দেশ্যে'-এই উপমাটা আমাদের ও এই কুরাইশ কাংগাল (হযরত মুহাম্মদের সাহাবী)-দের সম্পর্কে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর-হাত গুটিয়ে লও, তখন এরা কোথায়ও থাকবে না। খোদার শপথ, মদীনায় পৌছার পর আমাদের সম্মানিতপক্ষ হীন ও লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।'

এই বৈঠকে ঘটনাবশতঃ হযরত যায়েদ ইবৃনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি ছিলেন এক অল্প বয়স্ক বালকমাত্র। তিনি এইসব কথা-বার্তা শুনে তাঁর চাচাকে বলেছিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি গিয়ে সমস্ত কথা-বার্তা রসূলে করীমের নিকট পেশ করে দিলেন। নবী করীম (সঃ) হযরত যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আদ্যপান্ত সবকিছুই শুনিয়ে দিলেন**। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'সম্ভবতঃ তুমি ইবৃনে উবাইর কথা শুনতে ভুল করেছ। ইবৃনে উবাই এই কথা বলেছে এ ব্যাপারে তোমার হয়তো সংশয় বা সন্দেহ হয়ে থাকবে।' কিন্তু হযরত যায়েদ এই কথার জবাবে বললেন ঃ 'না, হুযুর। খোদার শপথ, আমি তাকেই এই সব কথা-বার্তা বলতে শুনেছি। অতঃপর নবী করীম (সঃ) ইবৃনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করা হলে সে সুস্পষ্ট রূপে অস্বীকার করলো। শপথ করে বলতে লাগল, আমি এইসব কথা কক্ষণই বলিনি।' আনসাররাও বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ একটি বালকের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? সম্ভবতঃ তার ভ্রম হয়েছে। ইবৃনে উবাইতো আমাদের খুবই সম্মানিত ও বুজর্গ ব্যক্তি। তার বিপরীতে একজন বালকের কথা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।' গোত্রের বড়-বৃদ্ধরাও হযরত-যায়েদকে ভৎসনা করলেন। তিনি অবস্থা দেখে দুঃখে ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ) যেমন যায়েদকে জানতেন, তেমনি আবদুল্লাহ ইবৃনে উবাইকেও জানতেন। কাজেই প্রকৃত ব্যাপার যে কি ঘটেছিল, তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) এই ব্যাপারটি জানতে পেরে রসূলে করীমের (সঃ) কাছে উপস্থিত হলেন। বললেনঃ 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। আর আমাকে অনুমতি দেয়া সমীচীন মনে না হলে মু'আয ইবৃনে জাবাল, উব্বাদ ইবনে বাশার, সা'আদ ইবৃনে মু'আয, মুহাম্মদ ইবৃনে মুসলিম প্রমুখ

* যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসছিল এমন সমস্ত লোককে মদীনার মুনাফিকরা 'জালাবীব' বলতো। শাব্দিক অর্থে এটা ছেঁড়া কিংবা মোটা কাপড় পরিধানকারী বুঝায় ; কিন্তু আসলে তারা গরীব মুহাজিরদেরকে অবজ্ঞা ও অপমান করার উদ্দেশ্যেই তাদের সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করতো। আমাদের ভাষায় 'কাংগালী' (ভিখারী, দরিদ্র, লোভী, লোলুপ) বললে যা বুঝায়, সে কালে 'জালাবীব' বলে ঠিক তাই বোঝানো হ'ত।

** ফিকাহ্‌বিদরা এ ব্যাপারটি হতে একটি শরী'অতী মস্‌লা গ্রহণ করেছেন। তা হ'ল এক ব্যক্তির কোন খারাব কথা যদি কোন দীনী, নৈতিক কিংবা জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে অন্য লোকের নিকট পৌছানো হয়, তা হলে একে 'চোগলখুরী' বলা যাবে না। শরী'অতে যে-চোগলখুরী-একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের নিকট লাগানো-হারাম, তা হ'ল পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-লড়াই ও বিপর্যয়-অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা চোগলখুরী।

আনসারদের মধ্যে হতে কোন একজনকে হত্যা করার নির্দেশ দিন * । কিন্তু নবী করীম (সঃ) বললেন, না তা কোরও না । লোকেরা বলবে ঃ 'দেখ ! মুহাম্মদ নিজেই তাঁর সংগী–সাথীদের হত্যা করাচ্ছেন । অতঃপর তিনি সংগে সংগেই সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যদিও রসূলে করীমের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তখনও রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নি । ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা চলতে থাকলেন । লোকেরা ক্লান্ত–শ্রান্ত হয়ে পড়লো । পরে একটি স্থানে অবস্থিতি গ্রহণ করলেন । ক্লান্ত–শ্রান্ত লোকেরা মাটিতে পা রাখার সংগে সংগেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন । বস্তুতঃ মুরাইসী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রভাব যেন লোকদের মন–মগজ হতে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নবী করীমের (সঃ) এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । পথিমধ্যে আনসার সরদার হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর নবী করীমের (সঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলেন । বললেন ঃ 'ইয়া রসূলুল্লাহ' আজ আপনি এমন সময় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যখন সফরের উপযুক্ত সময় ছিল না । আপনিও কখনও এইরূপ সময় সফর শুরু করতেন না । নবী করীম (সঃ) জবারে বললেন ঃ 'তুমি শোননি । তোমাদের সেই সাহেব কি কথাটা বলেছেন ?

হযরত উসাইদ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কোন সাহেব'?

বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ।'

জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তিনি কি বলেছেন ?

তিনি জবাবে বললেন ঃ 'বলেছেন ঃ মদীনায় পৌছাবার পর সম্মানিত হীন–নিকৃষ্টকে বহিষ্কৃত করবে ।

উসাইদ বললেন ঃ খোদার শপথ, 'সম্মানিত' তো আপনি । আর হীন নিকৃষ্ট তো সে । আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কৃত করতে পারেন ।

ক্রমে ক্রমে কথাটি আনসার গোত্রের সমস্ত লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়লো ও ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হ'ল । লোকেরা ইবনে উবাইকে বললো ঃ গিয়ে রসূলে করীমের নিকট ক্ষমা চাও; কিন্তু সে তীব্র বিদ্রুপাত্মক স্বরে জবাব দিল ঃ'তোমরা বলেছ, তাঁর প্রতি ঈমান আন । আমি ঈমান এনেছি' । তোমরা বললে ঃ 'নিজের ধন–মালের যাকাত দাও ; আমি যাকাতও দিয়ে দিয়েছি । এখন তো বাকী আছে শুধু এতটুকু যে, আমি মুহাম্মদ (সঃ)–কে সিজদা করবো ।' এইসব কথার দরুন তার বিরুদ্ধে মু'মিন আনসারদের মনে অসন্তোষ ও রোষ–ক্ষোভ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং চারদিক হতে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগলো । 'এই কাফেলা যখন মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে লাগলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে তাঁর বাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন । বললেন ঃ 'আপনি বলেছিলেন, মদীনা পৌছে সম্মানিত অসম্মানিতকে বহিষ্কৃত করবেন । কিন্তু সম্মানিত আপনি, না আল্লাহ ও তাঁর রসূল, তা এখন আপনি জানতে পারবেন । খোদার শপথ, রসূলে করীম (সঃ) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না, এই কথা শুনে ইবনে উবাই চিৎকার করে বললো ঃ 'হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, দেখে যাও,

* বিভিন্ন বর্ণনায় আনসার গোত্রের বিভিন্ন বুজর্গের নাম উল্লেখিত হয়েছে । হযরত উমর এ'দের মধ্যে কোন একজনকে এই কাজের নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, আমি মুহাজিরদের মধ্যের লোক, আমার দ্বারা এই কাজটি হলে বড় বিপর্যয় দেখা দেয়ার আশংকা বোধ হলে এই করুন ।

হ, আমার নিজের পুত্র-ই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে । লোকেরা নবী করীমের নিকট এই সংবাদ পৌছাল । নবী করীম (সঃ) আবদুল্লাহ্কে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর পিতাকে নিজের ঘরে যেতে দেন ।' আবদুল্লাহ এই কথা শুনে বললেন, 'নবী করীম (সঃ)-ই যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি ঘরে যেতে পারেন ।' তখন নবী করীম (সঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে বললেন ঃ 'হে উমর । কি মনে কর, তুমি যে সময় ইবনে উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলে, তখন তাকে হত্যা করা হলে নানা রকমের কথা উঠতো । কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিই, তবে তা অনায়াসেই করা যেতে পারে ।' হযরত উমর (রাঃ) নিবেদন করলেন ঃ 'খোদার শপথ, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার অপেক্ষা আল্লাহর রসূলের কথা অধিকতর বিচক্ষণতাপূর্ণ ।' **

এই পটভূমিতেই এই সূরাটি নাযিল হয় এবং নাযিল হয় সম্ভবতঃ নবী করীমের (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর।

** এই কথাটি হতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা জানা যায় । একটি এই যে, ইবনে উবাই যে কার্যক্রম ও তৎপরতা শুরু করেছিল, মুসলিম মিল্লাত থেকে কোন লোক অনুরূপ আচরণ করলে সে মৃত্যুদন্ড পাওয়ার যোগ্য হবে । আর দ্বিতীয় এই যে, নিছক আইনের দৃষ্টিতে কেউ মৃত্যুদন্ড পাওয়ার যোগ্য হলেই তাকে কার্যতঃও হত্যা করতে হবে, তা জরুরী নয় । এরূপ চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে এই হত্যাকান্ড অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয় কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে । অবস্থার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে নির্বিচারে আইনের প্রয়োগ অনেক সময় আইন প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল নিয়ে আসে । কোন মুনাফিক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর সমর্থনে কোন অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক শক্তি বর্তমান থাকলে তাকে শাস্তি দিয়ে অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ঘটানোর তুলনায় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে সেই আসল রাজনৈতিক শক্তির মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক, যার জোরে সেই লোকটি দুষ্কৃতি করার দুঃসাহস করে । ঠিক এই কল্যাণ চিন্তার কারণেই নবী করীম (সঃ) ইবনে উবাইকে তখনও শাস্তি দিলেন না , যখন শাস্তি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল । বরং তার সাথে অব্যাহতভাবে নম্র আচরণই গ্রহণ করতে থাকলেন । শেষ পর্যন্ত দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই মদীনার মুনাফিকদের শক্তি ও প্রভাব চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেল ।

اٰيَاتُهَا ١١ سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ (٦٣) رُكُوْعَاتُهَا ٢

এগার তার আয়াত (৬৩) সূরা আলমুনাফেকুন মাদানী তার দুই রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু)

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ

যখন | তোমার কাছে আসে | মুনাফিকরা | তারা বলে | আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি | নিশ্চয় আপনি | অবশ্যই রসূল | আল্লাহর

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ

এবং | আল্লাহ | জানেন | নিশ্চয় তুমি | অবশ্যই তাঁর রসূল | এবং | আল্লাহ | সাক্ষ্য দিচ্ছেন | নিশ্চয়

الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿۱﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا

মুনাফেকরা | অবশ্যই মিথ্যাবাদী | তারা গ্রহণ করেছে | তাদের শপথগুলোকে | ঢাল (স্বরূপ) | অতঃপর | তারা বাধা সৃষ্টি করে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ

থেকে | পথ | আল্লাহর | নিশ্চয় তারা | কত মন্দ | যা | তারা করছে | এটা

بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

এ কারণে যে তারা | ঈমান এনেছে | আবার | কুফুরি করেছে | অতঃপর মোহর করা হয়েছে | উপর | তাদের অন্তর সমূহের

রুকু : ১

১. হে নবী ! এই মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহারা বলে : 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল । হ্যাঁ, আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই তাঁহার রসূল । কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, 'এই মুনাফিকরা চরমভাবে মিথ্যাবাদী'[১] ।

২. তাহারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানাইয়া লইয়াছে । আর এইভাবে তাহারা আল্লাহর পথ হইতে নিজেরা বিরত থাকে ও অন্যান্যদিগকে বিরত রাখে । ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা কতই নিকৃষ্ট ধরনের তৎপরতা ।

৩. এইসব কিছু শুধু এই কারণে যে, এই লোকেরা ঈমান আনিয়া পরে আবার কুফরী গ্রহণ করিয়াছে । এই জন্য তাহাদের দিলের ওপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

১। অর্থাৎ যে কথা তারা নিজেদের যবানে বলছে, তাতো নিজ স্থানে সত্য, কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে যেহেতু তাদের বিশ্বাস তা নয়, সে জন্যে তারা তোমার রসূল হওয়া সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দান করছে তাদের সে উক্তিতে তারা মিথ্যুক ।

এখন তাহারা কিছুই বুঝে না[২] ।

৪. ইহাদের প্রতি তাকাইলে ইহাদের অবয়ব তোমাদের খুবই আকর্ষণীয় মনে হইবে । আর ইহারা কথা বলিলে তাহাদের কথা শুনিতে মগ্ন হইয়া যাইবে । কিন্তু আসলে ইহারা খোদাইকৃত কাষ্ঠ খন্ডমাত্র, যাহা প্রাচীরের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে [৩]। প্রত্যেকটি জোর আওয়াজকে ইহারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে । ইহারা পাকা শত্রু । ইহাদের হইতে সতর্ক হইয়া থাক । ইহাদের ওপর খোদার মা'র । ইহাদিগকে কোন্ উল্টা দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে[৪] ?

৫. আর ইহাদিগকে যখন বলা হয় 'এস, তাহা হইলে আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য মাগ্‌ফিরাতের দো'আ করিবেন', তখন তাহারা মাথা ঝাঁকানি দেয় ।

২। এই আয়াতে 'ঈমান' আনার অর্থ- ঈমানের একরার করে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়া । আর 'কুফর' করার অর্থ হচ্ছে- অন্তরে ঈমান না আনা ও নিজেদের বাহ্যিক একরার ও ঈমানের পূর্বে যে কুফরীর উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল তার উপর কায়েম থাকা । আল্লাহর পক্ষ থেকে কারুর অন্তরে মোহর করে দেয়ার অর্থ যে সমস্ত আয়াতে সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা হয়েছে এ আয়তটি তার মধ্যে অন্যতম । এ মুনাফিকদের এরূপ অবস্থা এ কারণে হয়নি যে, আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছিলেন সেজন্যে ঈমান তাদের মধ্যে প্রবেশ করতেই পারেনি ; ফলে তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক থেকে গিয়েছিল । বরং আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর সেই সময় এ মোহর মেরে দিয়েছিলেন যখন তারা ঈমানের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও কুফরীর উপর কায়েম থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের কাছ থেকে অকপট শুদ্ধ ঈমানের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের অবলম্বিত মুনাফিকির (কপটতার) সুযোগ তাদেরকে দান করা হ'ল ।

৩। অর্থাৎ এরা যারা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে বসে এরা মানুষ নয়, বরং কাঠের পুতুল । এদের কাঠের সঙ্গে তুলনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এরা চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে-যা মানুষের সার-বস্তু-একেবারে শূণ্যগর্ভ । আবার দেওয়ালে সংলগ্ন খোদাই করা কাষ্ঠ-খন্ডের সংগে তাদের তুলনা করে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে এরা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য । কেননা কাঠ তখনই কাজে লাগে যখন তা কোন ছাদ বা দরওয়াজা বা কোন কার্নিচারে ব্যবহৃত হয় । দেওয়ালে সজ্জিত খোদাই করা কাষ্ঠ-খন্ড কোন কাজেরই নয় ।

৪। তাদের ঈমান থেকে কপটতার দিকে বিপরীতগামী করায় কে সে কথা বলা হয়নি । পরিষ্কার-রূপে এ কথা না বলায় স্বতঃই এ মর্ম বুঝা যায় যে, তাদের এই উল্টা চালের প্ররোচক কোনো একটি মাত্র জিনিস নয়, বরং এর মধ্যে বহু রকমের প্ররোচণাদানকারী আছে ।

শয়তান আছে, খারাব বন্ধু আছে ; তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির বাসনা-কামনা আছে । কারুর স্ত্রী প্ররোচণাদাত্রী, কারুর সন্তান তার প্ররোচক, কারুর দুষ্ট আত্মীয় কুটুম্বরা তার প্ররোচণাদাতা এবং কারুর অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারই তাকে সেই পথে পরিচালিত করেছে ।

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ⑤ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

তাদের জন্যে সমান অহংকারী তারা এবং বিরত থাকে (আসা থেকে) তাদের তুমি দেখ এবং

أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَن يَغْفِرَ

ক্ষমা করবেন কক্ষণ না তাদের জন্যে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা নাই কর অথবা তাদের জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর

اللَّهُ لَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ⑥ هُمُ

(ঐলোক) তারা ফাসেক লোকদের পথ দেখান না আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে আল্লাহ

الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ

যতক্ষণ না আল্লাহর রসূলের কাছে যারা (আছে) (তাদের) জন্য তোমরা খরচ করো না বলে যারা

يَنفَضُّوا ط وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنَّ

কিন্তু যমীনের ও আসমানসমূহের ধনভান্ডারসমূহ আল্লাহরই অথচ তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়

الْمُنٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِينَةِ

মদীনার দিকে আমরা ফিরে যেতে পারি যদি অবশ্যই তারা বলে তারা বুঝে না মুনাফেকরা

لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ط

হীনতরকে তা থেকে অধিক সম্মানিত বহিষ্কার করবেই

আর তোমরা লক্ষ্য করিতেছ, উহারা আসা হইতে বড়ই অহমিকা সহকারে বিরত থাকে।

৬. হে নবী! তুমি ইহাদের জন্য মাগ্‌ফিরাতের দো'আ কর আর না-ই কর, ইহাদের জন্য সমান কথা, আল্লাহ কখন-ই ইহাদিগকে মা'ফ করিবেন না। ... আল্লাহ ফাসেক লোকদিগকে কখনই হেদোয়াত দেন না।

৭. ইহারা সেই লোক যাহারা বলে যে, রসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করিয়া দাও, যেন ইহারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। অথচ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের সমস্ত ধন-ভান্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহ-ই, কিন্তু এই মুনাফিকরা বুঝে না।

৮. ইহারা বলে ঃ আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে যে সম্মানিত সে হীনকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিবে ৫।

৫। অর্থাৎ মাত্র এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হতোনা; রসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে না এসেই মাত্র তারা ক্ষান্ত হতো না, বরং একথা শুনে অহংকার ও গর্বে তারা মাথা ঝাঁকাতো, ও রসূলের কাছে আসা ও মাফ চাওয়াকে নিজেদের পক্ষে অপমানকর মনে করে আপন জায়গায় জমে বসে থাকতো। তাদের মু'মিন না হওয়ার এ হচ্ছে সুস্পষ্ট চিহ্ন।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا

না মুনাফিকরা কিন্তু মুমিনদের জন্য ও তার রসূলের ও সম্মান আল্লাহরই জন্যে অথচ

يَعْلَمُوْنَ ۝٨ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ

না ও তোমাদের সম্পদগুলো তোমাদের গাফিল (যেন) করে না ঈমান এনেছ যারা ওহে তারা জানে

اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

তারাই ঐসব লোকঅতঃপর এটা করবে যে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদের সন্তানরা

الْخٰسِرُوْنَ ۝٩ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

আসে যে পূর্বে তোমাদের আমরা রিজিক দিয়েছি তা (যা) থেকে তোমরা খরচ কর এবং ক্ষতিগ্রস্ত

اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ

কাল পর্যন্ত আমাকে অবকাশ তুমি দিলে না কেন হে আমার রব সে বলবে অতঃপর মৃত্যু তোমাদের কারও

قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ

অবকাশ দেন কক্ষণনা অথচ সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হোতাম আমি এবং সদকা করতাম আমি তাহলে কিছু

اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

তোমরা কাজকর যাকিছু সর্বিশেষ অবহিত আল্লাহ আর তার নির্ধারিত মেয়াদ আসে যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ

অথচ মানমর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁহার রসূল এবং মু'মিনদের জন্য । কিন্তু এই মু'নাফিকরা জানে না ।

রুকূ ঃ ২

৯. হে লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফিল করিয়া না দেয় । যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

১০. যে রিয্‌ক্ আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর-এর পূর্বে যে, তোমাদের কাহারও মৃত্যু সময় আসিয়া উপস্থিত হয় ও তখন সে বলে ঃ হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাকে আরও একটু অবকাশ দিলে না কেন, যখন আমি দান-সাদ্‌কা করিতাম ও নেক-চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতাম ।'

১১. অথচ যখন কাহারও কর্ম-সময় পূর্ণ হইয়া যাওয়ার মূহূর্ত আসিয়া পড়ে, তখন আল্লাহ তাহাকে কক্ষণই অধিক অবকাশ দেন না । আর তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন ।

সূরা আত্‌–তাগাবুন

নামকরণ

সূরার ৯নং আয়াতের – ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ অংশের تغابن শব্দটিকে এ সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে ·تغابن 'তাগাবুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

মুকাতিল ও কলবী বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর অপর অংশ মদীনায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, শুরু হতে ১৩শ আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মক্কী, আর ১৪শ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মদীনী। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এ পূর্ণ সূরাটিই মদীনী। এ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এ সূরায় এমন কোন ইশারা–ইংগিত এমন পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু এর মূল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা–বিবেচনা করলে একটা ধারণা এ হয় যে, সম্ভবতঃ এ হিজরাতের পর মদীনী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণেই হয়তো এতে কিছুটা মক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মদীনী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হ'ল ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহবান ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান। কথার পরম্পরা এরূপ যে, প্রথম চারটি আয়াতে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। ৫ম আয়াত হতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত সে সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহবানকে অগ্রাহ্য করেছে। এর পর ১১শ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াত সমূহে কুরআনের আহবান যার মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিম্নোদ্ধৃত চারটি মৌলতত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ–

১. এ বিশ্ব–লোক যেখানে হে মানুষ, তোমরা বসবাস ও জীবন–যাপন করছো, মোটেই খোদাহীন নয়। এর সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রশাসক–পরিচালক আছেন এবং তিনি নিরংকুশ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী এক খোদা। তিনি যে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এবং সর্বোতভাবে নিখুঁত ও ত্রুটিহীন তার উদাত্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে এই বিশ্বলোকের ছোট বড় প্রত্যেকটি জিনিসই।

২. এ বিশ্ব–লোক উদ্দেশ্যহীন নয়, যুক্তিহীন কিংবা অযৌক্তিক নয়। বস্তুতঃ এর সৃষ্টিকর্তা একে পুরোপুরি সত্য ভিত্তিক ও যুক্তি সংগত করে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্ব–লোক একটা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন তামাশা– একেবারে নিরর্থকভাবেই এ শুরু হয়েছে এবং সম্পূর্ণ অর্থহীনভাবেই এ চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবে– এ ভুল ধারণায় যেন তোমরা নিমজ্জিত না হও।

৩. আল্লাহতা'আলা যে অতীব উত্তম আকার–আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর যেভাবে কুফর ও ঈমান এ দুটির কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার তোমাদের দেয়া হয়েছে, এ কোন নিষ্ফল ও তাৎপর্যহীন কাজ নয়। এ এমন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফর গ্রহণ কর কিংবা ঈমান গ্রহণ কর, উভয় অবস্থায় তার কোন পরিণতি বা ফলশ্রুতি দেখা যাবে না। এরূপ মনে করা মুলতঃই বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ করে আসলে আল্লাহতা'আলা দেখতে চান, আল্লাহর দেয়া এ ইখতিয়ার– এ বাছাই ও গ্রহণ–অধিকারকে তোমরা কিভাবে ব্যবহার করছো।

৪. তোমরা, মানুষেরা- দায়িত্বহীন নও, জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত নও ; শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের মহান স্রষ্টার নিকটই ফিরে যেতে হবে। তোমাদের অবশ্য সেই মহান সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্বলোকের সব কিছু সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে অবহিত, যাঁর নিকট তোমাদের কোন কিছুই গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন নয়, তাঁর নিকট মানব মনের প্রচ্ছন্ন খেয়াল-অন্তর্নিহিত চিন্তা ও ধারণার সব কিছুই প্রকট সমুজ্জ্বল।

বিশ্বলোক ও মানুষ সম্পর্কিত মহা সত্য পর্যায়ে এ চারটি মৌলিক কথা বলার পর কথার মোড় ঘুরে গেছে সেই লোকদের প্রতি যারা কুফর-এর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের পটভূমির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ পটভূমিতে মানুষের ইতিহাসে ক্রমাগত লক্ষ্য করা গেছে যে, জাতির পর জাতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এ পটভূমির বহু শত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনটিই যথার্থ হয় না। আল্লাহতা'আলাই নিগূঢ় সত্য উদঘাটিত করে দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ দুনিয়ায় জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মৌল কারণ মাত্র দু'টি- একটি হ'ল এই যে, আল্লাহতা'আলা মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে যেসব নবী ও রসূল পাঠিয়েছিলেন, মানুষ তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এর ফল এ দেখা দিয়েছে যে, আল্লাহতা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। আর তারা নিজেরা সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে নিত্য নতুন দার্শনিক মত রচনা করে একটি বিভ্রান্তি হ'তে আর একটি চরম বিভ্রান্তির দিকে উত্তরণ করেছে ও চূড়ান্ত ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ লোকেরা পরকাল বিশ্বাসকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা নিজেদের মতে চূড়ান্তভাবে মনে করে নিয়েছে যে, এ দুনিয়া এবং এ দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এর পর অপর কোন জগত নেই, নেই পরবর্তী কোন জীবন যেখানে মানুষকে খোদার সামনে নিজেদের জন্যে কোন জবাবদিহি করতে হতে পারে। পরকাল-অস্বীকৃতির এ 'কারণটি' তাদের গোটা জীবন-চরিত ও আচার-স্বভাবকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের জঘন্য চরিত্র ও স্বভাবের ক্লেদ ও পংকিলতা এতই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত খোদার আযাব এসেই তাদের অস্তিত্ব হ'তে দুনিয়াকে মুক্ত ও পবিত্র করেছে।

মানব ইতিহাসের এ দু'টি শিক্ষাপ্রদ মহাসত্য বিবৃত করার পর সত্য দ্বীন অমান্যকারীদেরকে এ বলে আহবান দেয়া হয়েছে যে, তাদের সচেতন হওয়া উচিত। তারা যদি অতীত কালের দ্বীন-অমান্যকারীদের অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদরূপে খোদার নাযিল করা হেদায়াতের প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্তই কর্তব্য। সে সংগে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, শেষ পর্যন্ত সে দিনটি অবশ্যই আসবে যে দিন সর্বকালের সমস্ত মানুষকে এক স্থানে একত্রিত করা হবে। তখন তোমাদের প্রত্যেকের 'ধোঁকাবাজি' সকলের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ও সম্প্রকাশিত হয়ে পড়বে। অতঃপর সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা চিরকালের তরে করা হবে এ ভিত্তির উপর যে কোন লোক ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করেছিল, আর কোন লোক কুফর ও সত্য অমান্য করার পথে চলেছিল। প্রথম পর্যায়ের লোক চিরন্তন জান্নাত লাভের অধিকারী হবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের জন্যে চিরকালের জন্য জাহান্নাম লিখে দেয়া হবে।

এর পর ঈমানের পথ অবলম্বনকারী লোকদেরকে সম্বোধন করে কতিপয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেয়া হয়েছে। হেদায়াতগুলো এই ঃ

১. দুনিয়ায় যে বিপদই আসে তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই আসে। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি ঈমানের উপর অবিচল হয়ে থাকবে, আল্লাহতা'আলা তার দিলকে হেদায়াত দান করেন। নতুবা ঘাবড়ে গিয়ে কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে যে ব্যক্তি ঈমানের পথ হতে বিচ্যুত হবে, তার বিপদ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া দূর তো হতে পারেনা, অবশ্য সে

এরূপ করে অপর একটি অতি বড় বিপদ ডেকে আনে । আর সে বিপদ হ'ল– তার দিল আল্লাহর হেদায়াত হ'তে বঞ্চিত হয়ে যায়।

২. মু'মিন ব্যক্তির কাজ কেবল ঈমান আনাই নয়, ঈমান আনার পর কার্যতঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য–অনুসরণ করা তার একান্তই কর্তব্য । আনুগত্য স্বীকার ও বাস্তব অনুসরণ এড়িয়ে গেলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে, সে জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে । কেননা রসূলে করীম (সঃ) তো প্রকৃত ও সত্য দ্বীন পৌছে দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গিয়েছেন ।

৩. মুমিনের ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি–সামর্থ বা দুনিয়ার কোন শক্তির ওপর থাকে না । মু'মিনকে ভরসা ও নির্ভর করতে হবে কেবল এক আল্লাহর ওপর ।

৪. মু'মিন ব্যক্তির জন্যে তার ধন–মাল এবং বংশ–পরিবার একটা বহু বড় পরীক্ষার ব্যাপার । কেননা সাধারণতঃ এসব জিনিজের মায়ায় পড়েই মানুষ ঈমান ও খোদানুগত্যের পথ হতে বিরত থাকে ও বিপরীত পথে চলতে বাধ্য হয় । এ কারণে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য নিজের নিজের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা, যেন কোন আপনজন তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খোদার পথ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে । তাদের ধনমাল খোদার পথে ব্যয় করতে থাকা কর্তব্য, যেন তাদের মন অর্থ পূজার কঠিন রোগে নিমজ্জিত হ'তে না পারে ও তা হ'তে সুরক্ষিত থাকতে পারে ।

৫. প্রত্যেকটি মানুষ তার সামর্থানুযায়ী শরীয়াত পালনের জন্য দায়িত্বশীল । মানুষ নিজের শক্তি–সামর্থের বাইরে কাজ করবে, তা আল্লাহতা'আলা চান না । অবশ্য প্রত্যেককে নিজের শক্তি–সামর্থ অনুপাতে খোদাকে ভয় করে চলতে হবে। সে জন্যে প্রত্যেককে প্রাণ–পণে চেষ্টাও করতে হবে । যতদূর সম্ভব খোদাকে ভয় করেই জীবন–যাপন করা তার কর্তব্য । এ ব্যাপারে এক বিন্দু ত্রুটি করা উচিত নয় । তার কথা বলা, কাজ–কর্ম করা ও নৈতিক ভূমিকা পালনে নিজের ত্রুটির কারণে খোদা নির্ধারিত সীমা যেন লংঘিত না হয়– সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ।

১ম রুকু

১. আল্লাহর তসবীহ্ করিতেছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশ জগতে রহিয়াছে এবং এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা পৃথিবীর বুকে রহিয়াছে । বাদশাহী তাঁহারই এবং তা'রীফ-প্রশংসাও তাঁহারই জন্য । আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তির অধিকারী[১] ।

২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন । অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ কাফের ও কেহ মু'মিন । আর আল্লাহ্ সেই সব কিছুই দেখেন যাহা তোমরা করিয়া থাক ।

৩. তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তোমাদের আকার-আকৃতি বানাইয়াছেন এবং অতীব উত্তম বানাইয়াছেন । শেষ পর্যন্ত তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে ।

১। অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান । তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, কোন শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে রোধ করতে পারে না ।

৪. পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি জানেন। তোমরা যাহা কিছু গোপন কর, আর যাহা কিছু প্রকাশ কর[২] তাহা সবই তিনি জানেন। তিনি দিলসমূহের অবস্থাও জানেন।

৫. ইতিপূর্বে যাহারা কুফর করিয়াছে এবং তাহার পর নিজেদের কুকর্মের স্বাদ আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের কোন খবর তোমাদের নিকট কি পৌছে নাই?.... তাহাদের জন্য সামনের দিকেও যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

৬. তাহারা এইরূপ পরিণতির সম্মুখীন এই জন্য হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদের নবী-রসূলগণ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ লইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাহারা বলিয়াছে, 'মানুষ আমাদিগকে হেদায়াত দিবে নাকি?' এইভাবে তাহারা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়। তখন আল্লাহও তাহাদের ব্যাপারে বে-পরোয়া হইয়া গেলেন। আর আল্লাহ তো স্বতঃই পরোয়াহীন ও স্বীয় সত্তায় সুপ্রশংসিত।

৭. অমান্যকারীরা ধৃষ্টতা সহকারে বলিল, মৃত্যুর পর কখনই তাহাদিগকে পুনরায় উঠানো হইবে না।।

২। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- "তোমরা গোপনে যা-কিছু কর এবং প্রকাশ্যে যা কিছু কর।"

তাহাদিগকে বলঃ না, আমার খোদার শপথ, তোমাদিগকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হইবে৩। পরে তোমাদিগকে অবশ্যই জানাইয়া দেওয়া হইবে তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি করিয়াছ। আর এইরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

৮. অতএব ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাহার রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যাহা আমরা নাযিল করিয়াছি৪। যাহা তোমরা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

৯. (এই বিষয়ে তোমরা টের পাইবে) যখন একত্রিত হওয়ার দিন তিনি তোমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন৫। সেই দিনটি হইবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন৬।

৩। এখানে এ প্রশ্ন ওঠে,- একজন পরকাল অবিশ্বাসীকে আপনি পরকালের সংবাদ কসম খেয়ে দিন বা কসম না খেয়ে দিন- তাতে কি পার্থক্য আসে যায়? যখন সে ঐ জিনিস মানে না, তখন আপনি শপথ করে তাকে বলছেন বলে সে কেমন করে তা মেনে নেবে? এর উত্তর হচ্ছে- রসূলুল্লাহ (সঃ) যাদের সম্বোধন করছিলেন, তারা ছিল সেই সব লোক যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা ভালভাবে জানতো যে, তিনি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি, সুতরাং তারা মুখে তার বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা অপবাদ রচনা করতে থাকুক না কেন, নিজেদের অন্তরের মধ্যে তারা ধারণাই করতে পারতো না যে- এরূপ সাচ্চা মানুষ কখনো খোদার শপথ করে এমন কথা বলতে পারে, যার সত্য হওয়া সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় না থাকে।

৪। এখানে পূর্বাপর প্রসংগ থেকে স্বতঃই একথা বোঝা যায় যে, "নূরের প্রতি যাহা আমরা নাযিল করিয়াছি"-এর অর্থ কুরআন। আলোক (নূর) যেরূপ নিজেই প্রকাশ পায় ও চারি পাশের সমস্ত জিনিসকে প্রকাশিত করে দেয় যা পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে লুকায়িত ছিল, সেইরূপ কুরআন এমন একটি প্রদীপ যার সত্যতা স্বতঃই প্রকট; এবং তার আলোকে মানুষ সে সমস্ত সমস্যার প্রত্যেকটি বুঝতে ও সমাধান করতে পারে, যা বোঝার পক্ষে তার নিজের জ্ঞানের উপায় উপকরণ ও বুদ্ধি যথেষ্ট নয়।

৫। 'ইজতেমার (একত্রীকরণ) দিন'-এর অর্থ- কিয়ামত। এবং সকলের একত্র করার অর্থ- সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যত মানুষ পয়দা হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে পুনরুজ্জীবিত ক'রে একত্রিত করা।

৬। অর্থাৎ আসল হার-জিত কিয়ামতের দিন হবে। সেখানে গিয়ে জানা যাবে প্রকৃতপক্ষে কে ক্ষতিগ্রস্ত ও কে লাভবান হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে কে প্রতারিত হয়েছে ও কে বুদ্ধিমান ছিল, প্রকৃত পক্ষে কে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজি এক মিথ্যা কারবারে লাগিয়ে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে এবং কে নিজের শক্তি, সামর্থ, চেষ্টা, সময় ও সম্পদকে লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সমস্ত মুনাফা লুটে নিয়েছে- যা প্রথম ব্যক্তিও অর্জন করতে পারতো যদি সে দুনিয়ার হকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) বোঝার ক্ষেত্রে প্রতারিত না হ'ত।

وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ

এবং যে ঈমান আনে আল্লাহর উপর ও কাজ করে নেক মোচন করবেন তার থেকে

سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

তার গুনাহগুলো এবং প্রবেশ করাবেন তাকে জান্নাতে প্রবাহিত হয় হতে তার পাদদেশ

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

ঝর্ণাধারাগুলো বসবাসকারী স্থায়ী তার মধ্যে চিরকাল এটা সাফল্য বড়

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

এবং যারা কুফরি করেছে ও মিথ্যারোপ করেছে আমাদের আয়াত গুলোকে ঐসব লোক অধিবাসী

النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩ مَآ اَصَابَ مِنْ

দোজখের বসবাসকারী স্থায়ী তার মধ্যে এবং কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল না আপতিত হয় কোন

مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ

মুসিবত ব্যতিরেকে অনুমতি আল্লাহর এবং যে ঈমান আনে আল্লাহর উপরে হেদায়াত দেন তিনি

قَلْبَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ⑪

তার অন্তরকে এবং আল্লাহ সব সম্পর্কে কিছু খুব অবগত

৯. যে লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তাহার গুনাহ ঝাড়িয়া ফেলিবেন এবং তাহাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, যে সবের নীচদেশে ঝর্ণা ধারা সদা প্রবহমান থাকিবে। এই লোকেরা চিরকাল উহাতে থাকিবে। ইহাই বড় সাফল্য।

১০. আর যেসব লোক কুফর করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহারা দোযখের অধিবাসী হইবে। উহাতে তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর উহা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনের স্থান।

রুকূ : ২

১১. কোন বিপদ কখনও আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহর অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তাহার দিলকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

১২. আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের অনুসরণ কর । কিন্তু এই আনুগত্য ও অনুসরণ হইতে যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে সুস্পষ্ট সত্য পৌছাইয়া দেওয়া ছাড়া আমাদের রসূলের ওপর অন্য কোন দায়িত্ব নাই ।

১৩. আল্লাহ্ তো তিনিই যিনি ছাড়া কেহই খোদা নয় । অতএব ঈমানদার লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা[৭] ।

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের সন্তান–সন্তুতিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু । তাহাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকিবে । আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যবহার কর ও ক্ষমা করিয়া দাও, তাহা হইলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও নিরতিশয় দয়াবান[৮] ।

৭। অর্থাৎ 'খোদায়ী'র সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহতা'আলারই হাতে । তোমার ভাগ্যকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বানাবার আদৌ কোন ক্ষমতা অন্য কারুর নেই । সুসময় আসতে পারে, তিনিই যদি তা নিয়ে আসেন, দুঃসময় কাটতে পারে, তিনিই যদি তা কাটিয়ে দেন । সুতরাং অকপট অন্তরে যে–ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য প্রভু বলে মান্য করে, তার জন্যে এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, সে আল্লাহর উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে একজন মু'মিনের ন্যায় এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করে যাবে যে– সর্বাবস্থায় কল্যাণ মাত্র সেই পথেই আছে যে পথ আল্লাহতা'আলা প্রদর্শন করেছেন ।

৮। অর্থাৎ পার্থিব সম্বন্ধের দিক দিয়ে যদিও এরা তারাই যারা মানুষের কাছে প্রিয়তম, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'শত্রু' । এ শত্রুতা এ হিসেবে হতে পারে যে তারা তোমাদেরকে সৎ ও পুণ্য কাজে বাধা দেয়, ও অসৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে, বা এ হিসেবে হতে পারে যে– তারা তোমাদের ঈমান থেকে রোধ করে ও কুফরীর দিকে আকর্ষণ করে, বা এই হিসেবে হতে পারে যে– তাদের সহানুভূতি কাফেরদের প্রতি থাকে। যাই হোক– এসব এমন ব্যাপার যার প্রতি তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক । এবং এদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে নিজের পরিণাম বিনষ্ট করা উচিত নয় । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে– তোমরা তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করে তাদের সংগে কঠোর ব্যবহার করতে থাকবে; বরং এর মর্ম মাত্র এই যে– যদি তাদের সংশোধন করতে না পারো তবে অন্ততঃপক্ষে নিজেদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো ।

১৫. তোমাদের ধন মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ । আর আল্লাহই এমন সত্তা, যাঁহার নিকট বড় প্রতিফল রহিয়াছে ।

১৬. কাজেই তোমাদের মধ্যে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করিতে থাক । আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর । যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা পাইয়া গেল, শুধু সে-ই কল্যাণ ও সাফল্য-প্রাপ্ত হইবে ।

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তবে তিনিই তোমাদিগকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন । এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন । আল্লাহ্ বড়ই মূল্য দানকারী ও অতীব ধৈর্যশীল ।

১৮. উপস্থিত ও অদৃশ্য সব কিছুই তিনি জানেন, তিনি বড়ই প্রবল-পরাক্রান্ত-সর্বজয়ী, মহাবিজ্ঞানী ।

সূরা আত্-তালাক

নামকরণ

এ সূরার নাম আত্-তালাক। কেবল নামই নয়, এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও তালাক। কেননা এতে তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মস'উদ (রাঃ) একে 'সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা' নাম দিয়েছেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মস'উদ (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সূরায় আলোচিত বিষয়াদির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি অবশ্যই সূরা বাকারা'র তালাক সংক্রান্ত আইন-বিধান সম্বলিত প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের পর নাযিল হয়েছে। যদিও নাযিল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ঠিক করা সহজ নয় ; কিন্তু হাদীসের বর্ণনাসমূহ হতে এতটা কথা অবশ্যই জানা যায় যে, সূরা বাকারায় দেয়া আইন-বিধানসমূহ বুঝবার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতঃও তাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখা যেতে লাগলো, তখনো আল্লাহতা'আলা তাদের সংশোধনের জন্যে এ হেদায়াতসমূহ নাযিল করেছিলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, এ সূরার বিধি-বিধানসমূহ অনুধাবন করার জন্যে সে সব হেদায়াত নূতন করে স্মরণ করে নেয়া আবশ্যক। মোটামুটিভাবে তা এইঃ الطلاق مرتٰن فامساك بمعروف او تسريح باحسان (البقرة - ٢٢٩)

-'তালাক দুইবার। অতঃপর হয় সোজাসুজিভাবে স্ত্রীকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে, নতুবা ভালোভাবে বিদায় করিয়া দিতে হইবে।' (আল-বাকারা : ২২৯)

-'আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা (তালাক পাওয়ার পর) তিন হায়েয পর্যন্ত নিজদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে..... আর তাদের স্বামী এই সময়কালে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকারী-যদি তাহারা সংশোধনের জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত হয়।' (আল-বাকারা : ২২৮)

'-পরে সে যদি তাহাকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহা হইলে অতঃপর সে তাহার জন্য হালাল হইবে না, যতক্ষণ না সেই স্ত্রী লোকটি অন্য কাহাকেও বিবাহ করে।' (আল-বাকারা : ২৩০)

-'তোমরা যখন মুমিন স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, পরে তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়া দাও' তাহা হইলে তোমাদের জন্য তাহাদের কোন ইদ্দত পালন করা কর্তব্য নয় যাহা পূরণ হওয়ার তোমরা দাবী করিতে পার।' (আল্-আহ্‌যাব : ৪৯)

-'তোমাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় এবং স্ত্রীদের রাখিয়া যায়, এই স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে।' (আল-বাকারা : ২৩৪)

এই সব আয়াতে যে সকল নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা ছিল এই :

১. একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বেশীর পক্ষে তিনটি তালাক দিতে পারে।

২. এক বা দু' তালাক দেয়া হলে ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে । ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর সেই স্বামী-স্ত্রী পুনঃবিবাহ করতে চাইলে করতে পারে, সেজন্যে তাহ্‌লীল-স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণের শর্ত নেই । কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে না, আর তারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে না যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য একজন পুরুষকে বিবাহ করবে ও সে নিজ ইচ্ছায় তাকে তালাক না দিবে (কিংবা সে মরে যাবে) ।

৩. স্বামী-সংগম গ্রহণকারী স্ত্রী-যার হায়য হয়-তার ইদ্দত হ'ল, তালাক দেয়ার পর তিন হায়য-কাল । এক তালাক বা দু'তালাক হলে এ ইদ্দতের অর্থ হবে-স্ত্রীটি এখন পর্যন্ত সেই পুরুষটির স্ত্রীত্বে রয়েছে এবং ইদ্দতের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে । কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে এ ইদ্দত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার সুযোগের জন্যে হবেনা, বরং তা হবে শুধু এই জন্যে যে, তা শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীলোকটি অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারে না ।

৪. স্বামীর সঙ্গে সংগম হয়নি এমন স্ত্রীলোক - স্পর্শ করার পূর্বেই স্বামী যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে-তার কোন ইদ্দত নেই । সে ইচ্ছা করলে তালাক পাওয়ার পরই অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে ।

৫. যে স্ত্রীলোকের স্বামী মরে গেছে, তাকে চার মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করতে হবে ।

এ প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে যে, এসব নিয়ম-বিধানের কোন একটিকে বাতিল করার বা তাতে কোনরূপ সংশোধনী আনার উদ্দেশ্যে সূরা 'তালাক' নিশ্চয়ই নাযিল হয়নি । বরং এ নাযিল হয়েছে দু'টো উদ্দেশ্য নিয়ে-

একটা হ'ল এই যে' স্ত্রীকে তালাক দেয়ার যে ক্ষমতা ও অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে তা ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্যে এমন সুবিবেচনা সম্বলিত সুষ্ঠু পন্থা বলে দিতে হবে যাতে যথা সম্ভব উভয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ ঘটার মত অবস্থার সৃষ্টি না হয় । আর যদি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেই তা হলে, শেষ পর্যন্ত যেন এমনভাবে বিচ্ছেদ ঘটে, যখন পারস্পরিক মিল-মিশ রক্ষার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যাবে । কেননা খোদার শরী'য়াতে তালাক দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে একটা অপরিহার্য ও নিরুপায়ের উপায় রূপে । কোন পথই যখন খোলা থাকবে না, তখন যেন এ পথ গ্রহণ করা হয়-এ জন্যে । কেননা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মাঝে যে বিবাহ স্থাপিত হয় তা কখনও ভেঙ্গে যাবে, আল্লাহতা'আলা তা কিছুমাত্র পছন্দ করেন না । নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

-'আল্লাহতা'আলা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেন নি ।" (আবুদাউদ)

'সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহতা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য জিনিস হল তালাক ।" (আবু দাউদ)

এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল - সূরা বাকারায় দেয়া আইন-বিধানের পর আরও যেসব বিষয়ের জবাব দেয়া বাকী রয়ে গিয়েছিল তা দিয়ে ইসলামের পারিবারিক বিধানকে সম্পূর্ণ করে তোলা । এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যেসব স্বামী সংগম গ্রহণকারী স্ত্রীর হায়য আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিংবা যাদের হায়য হওয়া এখনও শুরু হয় নি, তালাক হ'লে তাদের ইদ্দতের মীয়াদ কি হবে । আর যে স্ত্রী গর্ভবতী, তাকে তালাক দেয়া হলে কিংবা তার স্বামী মরে গেলে তার ইদ্দতের কি হবে । এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের খোরাক-পোশাক ও বাসস্থান সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যাবে । আর যেসব সন্তানদের পিতা-মাতা তালাকের কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের (এই সন্তানদের) লালন-পালন ও দুগ্ধ সেবনের কি ব্যবস্থা করা হবে । (এ প্রেক্ষিতেই সূরা তালাক পাঠ করা আবশ্যক)

ايَاتُهَا ١٢ (٦٥) سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢
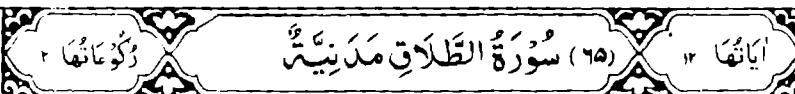
দুই তার রুকূ মাদানী তালাক সূরা (৬৫) বার তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
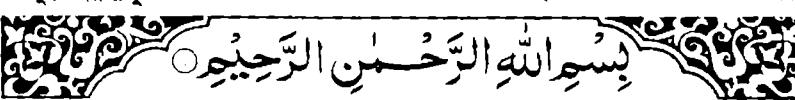
অত্যন্ত মেহেরবান — অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ

হে নবী যখন তোমরা তালাক দাও স্ত্রীদের অতঃপর তোমরা তালাক দাও তাদের

لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا

তাদের ইদ্দতের জন্য ও তোমরা গণনা কর ইদ্দত এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে তোমাদের রব না

تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ

তোমরা বের করো তাদের থেকে তাদের ঘরগুলো এবং না তারা বের হবে তবে যদি

يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ

তারা লিপ্ত হয় অশ্লীলতায় সুস্পষ্ট (অন্য কথা) ও এসব সীমাসমূহ আল্লাহর

১ম রুকূ

১. হে নবী ! তোমরা যখন স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দিবে, তখন তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও[১] । আর ইদ্দতের সময়–কাল ঠিকভাবে গণনা কর । আর আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদের রব[২] । (ইদ্দত–কালে) না তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের বসবাস ঘর হইতে বহিষ্কৃত কর, আর না তাহারা নিজেরা বাহির হইয়া যাইবে[৩] । তবে যদি তাহারা কোন সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করিয়া বসে তবে অন্য কথা[৪]–ইহা আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমা ।

১। 'ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়া'র দুইটি মর্ম হতে পারে । প্রথম–হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিওনা ; বরং এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তার 'ইদ্দত' শুরু হতে পারে । দ্বিতীয়–ইদ্দতের মধ্যে রুজুর (পুনঃগ্রহণের) অবকাশ রেখে তালাক দাও, এরূপভাবে তালাক দিওনা যার দ্বারা 'রুজু'র অবকাশ–ই–না থাকে । হাদীস–সমূহে এই আদেশের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সে অনুসারে তালাকের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ হায়েযের সময় তালাক না দেয়া ; বরং সেই তোহোরে তালাক দেয়া যার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সংগে সংগম করেনি বা সেই অবস্থায় তালাক দেয়া যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া জানা যায়; এবং একই সময় তিন তালাক না দিয়ে ফেলা ।

২। অর্থাৎ তালাককে 'খেল–তামাশা' মনে করোনা, যে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ' ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর এটাও স্মরণ রাখা না হয় যে–কখন তালাক দেয়া হয়েছিল, কখন ইদ্দত শুরু হ'ল ও কখন তা শেষ হবে । যখন তালাক দেয়া হয়, তখন তার তারিখ ও সময় স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং এও স্মরণ রাখা দরকার যে কোন্ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে ।

৩। অর্থাৎ পুরুষ ক্রোধ বশে স্ত্রীকে যেন ঘর থেকে বের করে না দেয় এবং স্ত্রীও যেন ক্রোধ ভরে গৃহত্যাগ না করে । ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর তার, সেই ঘরেই উভয়কে থাকতে হবে ; যাতে কোন পারস্পরিক আনুকূল্যের অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়, তবে তা থেকে যেন ফায়দা উঠানো যায় । উভয়ে যদি এক ঘরে অবস্থান করে তবে তিন মাস বা তিন হায়েয আসা পর্যন্ত বা গর্ভবতী অবস্থায় প্রসব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ বারবার আসার সম্ভাবনা আছে ।

৪। অর্থাৎ যদি কুচলন চলে বা ইদ্দতের মধ্যে ঝগড়া লড়াই করে ও কুবাক্য বলতে থাকে ।

আর যে কেহ আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমাসমূহ লংঘন করিবে, সে নিজের উপর যুলুম করিবে । তোমরা জান না, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ উহার পর (মিল-মিশের) কোন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।

২. পরে যখন তাহারা নিজেদের (ইদ্দতের) সময়-কালের শেষে পৌছিবে, তখন হয় তাহাদিগকে ভালভাবে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) বাঁধিয়া রাখিবে, কিংবা ভালভাবে তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে । আর এমন দুই জন লোককে সাক্ষী বানাইবে যাহারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারবাদী হইবে[৫] । আর (হে সাক্ষীদ্বয়!) সাক্ষ্য ঠিক ঠিকভাবে আল্লাহর জন্য আদায় কর । এই সব তোমাদিগকে নসীহতস্বরূপ বলা হইতেছে-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই নসীহত যে আল্লাহ ও পরকালের দিনের প্রতি ঈমানদার[৬] ।

৫। এর মর্ম-তালাকে সাক্ষী রাখা ও রুজু করার সময়ও সাক্ষী রাখা ।

৬। এই শব্দগুলো দ্বারা স্বতঃই বোঝা যায় যে - উপরে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে তা উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছে, কানুন হিসেবে তা নির্দেশ দেয়া হয়নি । যদি কেউ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ভংগ ক'রে তালাক দিয়ে বসে, ইদ্দত ঠিকভাবে গণনা না করে স্ত্রীকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই ঘর থেকে বহিষ্কার করে, ইদ্দতের পর যদি রুজু করে তো স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্যে রুজু করে, এবং বিদায় করে দেয় তো ঝগড়া বিবাদের সঙ্গে বিদায় করে এবং তালাক, 'মোফারেকত' যাই হোক না কেন, কোন অবস্থা যদি সাক্ষী না রাখে তবে তার জন্যে তালাক, রুজু ও মোফারেকতের আইনগত পরিণতির মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না । অবশ্য আল্লাহতা'আলার উপদেশের বিরোধী কাজ করায় একথা প্রমাণিত হবে যে তার অন্তরে আল্লাহ ও 'শেষ দিন' সম্পর্কে সঠিক ঈমান বর্তমান নেই; এই কারণে সে এমন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে বা একজন সাচ্চা মু'মিনের পক্ষে করা উচিত নয় ।

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ

থেকে | তাকে রিজিক দেন | ও | নিষ্কৃতির পথ | তারজন্যে | তিনি করে:দেন | আল্লাহকে | ভয় করে | যে | এবং

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ

সে অতঃপর | আল্লাহর | উপর | ভরসা করে | যে | এবং | সে ধারণাও করে | না | যেখান

حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

কিছুর | সব জন্যে | আল্লাহ | বানিয়েছেন | নিশ্চয় | তারকাজ | অর্জনকারী | আল্লাহ | নিশ্চয় | তার জন্যে যথেষ্ট

قَدْرًا ﴿٣﴾ وَ الّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ

যদি | তোমাদের স্ত্রীদের | মধ্য হতে | হায়েয | হতে | নিরাশহয়েছে | যারা | এবং | নির্দিষ্ট মাত্রা

ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ

হায়েজ হয় | নাই | (তাদের জন্যও) যাদের | এবং | মাস | তিন | তাদের | ইদ্দত | তবে | তোমরা সন্দেহ কর

وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ

তাদের গর্ভ | প্রসব করা | পর্যন্ত | তাদের সময়কাল | গর্ভবতীদের | এবং

যে লোক আল্লাহকে ভয় করিয়া কাজ করিবে, আল্লাহ তাহার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন-না কোন পথ করিয়া দিবেন ।

৩. আর তাহাকে এমন উপায়ে রেযক দিবেন, যে দিক সম্পর্কে তাহার ধারণাও হইবে না । যে লোক আল্লাহর উপর ভরসা করিবে তাহার জন্য তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ্‌তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করিবেনই । আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি তকদীর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ।

৪. আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে যাহারা হায়েয হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহ জাগে, তাহা হইলে (তোমরা জানিয়া রাখ), তাহাদের ইদ্দত তিন মাস । আর এই হুকুম তাহাদের জন্যও যাহাদের এখনো হায়েয আসে নাই[৭] । আর গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের সীমা হইল তাহাদের গর্ভ প্রসব করা পর্যন্ত[৮]।

৭। কম বয়েসের কারণে হায়েয যদি না আসে, বা অনেক স্ত্রীলোকের বহু বিলম্বে হায়েয আসে সেই কারণে যদি হায়েয না আসে , কোন কোন স্ত্রীলোকের জীবনভরও হায়েয আসেনা- যদিও এরূপ ঘটনা খুবই বিরল, যাই হোক, এসকল অবস্থাতে এরূপ স্ত্রীলোকদের ইদ্দতকাল হায়েয থেকে নিরাশ স্ত্রীলোকের ইদ্দতের ন্যায় অর্থাৎ-তিনমাস ।

৮। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি স্ত্রী গর্ভমুক্ত হয় অথবা গর্ভকাল যদি চারমাস দশদিন থেকেও বেশী দীর্ঘ সময় চলতে থাকে, সর্ব অবস্থাতেই সন্তান প্রসব হওয়ার সংগে সংগে স্ত্রীলোকের ইদ্দত শেষ হবে।

যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাহার ব্যাপারে তিনি সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া দেন ।

৫. ইহা আল্লাহর বিধান; যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করিয়াছেন । যে লোক আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ্ তাহার পক্ষে অকল্যাণসমূহ দূর করিয়া দিবেন এবং তাহাকে বড় শুভফল দান করিবেন ।

৬. তাহাদিগকে (ইদ্দতের সময়-কালে) সেই স্থানে থাকিতে দাও, যেখানে তোমরা বসবাস কর, যে রকম স্থানই তোমাদের হউকনা কেন । এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না । আর তাহারা যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যয়ভার বহন কর সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাহাদের গর্ভ প্রসব হয় । পরে সে যদি তোমাদের জন্য (বাচ্চাকে) স্তন দেয়, তবে উহার পারিশ্রমিক তাহাদিগকে দাও এবং (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) ভালোভাবে পারস্পরিক কথা-বার্তার মাধ্যমে মীমাংসা করিয়া লও ।

কিন্তু তোমরা (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলিতে চাও, তাহা হইলে বাচ্চাকে অপর কোন স্ত্রীলোক স্তন দিবে ।

৭. সচ্ছল অবস্থার লোক নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করিবে । আর যাহাকে কম রেযক দেওয়া হইয়াছে, সে তাহার সেই সম্পদ হইতে ব্যয় করিবে যাহা আল্লাহ তাহাকে দিয়াছেন । আল্লাহ যাহাকে যতটা দিয়াছেন, তাহার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তাহার উপর চাপাইয়া দেন না । ইহা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ অসচ্ছলতার পর প্রাচুর্যও দান করিবেন ।

রুকূ ঃ ২

৮. কত জনপদ-জন-বসতি[১] এমন রহিয়াছে যাহারা নিজেদের খোদা এবং তাঁহার নবী রসূলগণের আইন-বিধানকে অমান্য করিয়াছে, ফলে তাহাদের উপর অত্যন্ত কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়াছি ।

১। আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাব মাধ্যমে যে সব আদেশ-নির্দেশ দান করা হয়েছে যদি মুসলমানরা সেগুলি অমান্য করে তবে ইহকাল ও পরকালে তাদের পরিণাম কি ঘটবে এবং যদি তারা আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে তবে কি পুরস্কার বা তারা লাভ করবে- এ সম্পর্কে এখন মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে-

৯. তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিপূর্ণ হইয়া গেল ।

১০. আল্লাহতা'আলা (পরকালে) তাহাদের জন্য কঠিন তীব্র আযাবের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন । অতএব তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় কর, হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, যাহারা ঈমান আনিয়াছ । আল্লাহতা'আলা তোমাদের প্রতি একটা উপদেশ নাযিল করিয়াছেন-

১১. এমন একজন রসূল[১০], যে তোমাদিগকে আল্লাহতা'আলার স্পষ্ট-প্রকট হেদায়াত দানকারী আয়াতসমূহ শুনাইতেছে, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদিগকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে লইয়া আসে ।

১০। তফসীরকারদের অনেকে 'উপদেশ' এর অর্থ-কুরআন এবং রসূল-এর অর্থ-মুহাম্মদ (সঃ) গ্রহণ করেছেন । আবার অনেক তফসীরকারের অভিমত হ'লো : উপদেশ-এর অর্থ -খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ), অর্থাৎ রসূলের সত্তাই আদ্যোপান্ত জীবন্ত নসীহত । আমি এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে সঠিকতর মনে করি।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ
এবং যে ঈমানআনবে আল্লাহর উপর ও কাজ করবে নেক তাকে প্রবেশ করাবেন তিনি

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
জান্নাতে প্রবাহিত হয় থেকে তারা পাদদেশ ঝর্ণধারাসমূহ বসবাসকারী স্থায়ীভাবে তার মধ্যে

اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ⑪ اَللّٰهُ الَّذِيْ
চির কাল নিশ্চয় অতি উত্তম করেছেন আল্লাহ তার জন্যে রিযক আল্লাহ (তিনিই) যিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ
সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান ও পৃথিবীর পর্যায় হতে তাদের অনুরূপ

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى
নাযিল হয় নির্দেশ তাদের মাঝে তোমরা জান যেন যে আল্লাহ উপর

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
সব কিছুর ক্ষমতাবান ও বাস্তবিকই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন সব কিছুকে

عِلْمًا ⑫
জ্ঞানে

আর যে কেহই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, আল্লাহতা'আলা তাহাকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার নীচ হইতে ঝর্ণাধারাসমূহ সদা প্রবহমান থাকিবে। এই লোকেরা তাহাতে চিরকাল ও সব সময়ই বসবাস করিবে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহতা'আলা অতীব উত্তম রেযক রাখিয়া দিয়াছেন।

১২. আল্লাহ্তো তিনিই যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পৃথিবী-পর্যায় হইতেও উহারই মতো[১১]। এই দুই এর মধ্যে বিধান নাযিল হইতে থাকে। (এই কথা তোমাদিগকে এই জন্য বলা হইতেছে) যেন তোমরা জানিতে পার যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান এবং এই যে, আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

১১। 'উহারই' মতো'-এর অর্থ এই নয় যে-যতগুলি আসমান সৃষ্টি করেছেন ততগুলি যমীনও সৃষ্টি করেছেন। বরং এর মর্ম হচ্ছে-যেমন তিনি কতিপয় আসমান তৈরী করেছেন সেরূপ তিনি কতকগুলি যমীনও সৃষ্টি করেছেন; এবং 'যমীনের ন্যায়'-এর অর্থ যেরূপ এই যমীন যার উপর মানুষ অবস্থান করছে নিজের উপরিস্থিত জিনিসের পক্ষে শয্যা ও দোলনা স্বরূপ, সেরূপ আল্লাহতা'আলা এই সৃষ্টির মধ্যে অন্য এমন যমীন-সমূহও নির্মাণ করে রেখেছেন যেগুলি নিজের নিজের উপরিস্থিত বসতির পক্ষে শয্যা ও দোলনা স্বরূপ। অন্য কথায়-আসমানে এই যে অসংখ্য গ্রহ-তারা দৃষ্টিগোচর হয় এ সমস্ত শূন্য পতিত হ'য়ে নেই, বরং পৃথিবীর মতো সেগুলির অনেকের মধ্যে বহু দুনিয়া আবাদ হয়েছে।

সূরা আত্‌-তাহরীম

নামকরণ

এ সূরার নাম সূরার প্রথম শব্দ لِمَ تُحَرِّمُ হতে গৃহিত । এটা এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির শিরোনাম নয় । এরূপ নামকরণের অর্থ হ'ল এ সেই সূরা যাতে 'তাহ্‌রীম (হারাম করণ) সংক্রান্ত একটা ঘটনার উল্লেখ হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় তাহ্‌রীম-কোন কিছু হারাম ক'রে নেয়া-সংক্রান্ত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে দু'জন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এ দু'জন মহিলা তখন রসুল করীমের হেরেমভুক্ত ছিলেন । তাঁদের একজন হলেন হযরত সফীয়া, আর দ্বীতীয় জন হযরত মারীয়া কিবতীয়া (রাঃ) । এদের একজন – হযরত সফীয়া (রাঃ)– খায়বর বিজয়ের পর নবী করীমের (সঃ) সহিত বিবাহিতা হন । এ খায়বর বিজয় সর্বসম্মতভাবে ৭ম হিজরী সনে হয়েছিল । দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারীয়াকে ৭ম হিজরী সনে মিশর অধিপতি মুকাউকাস নবী করীমের খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিল তাঁর গর্ভে ৮ম হিজরীর যিল্‌হাজ্জ মাসে নবী করীমের পুত্র হযরত ইব্‌রাহীম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন । এ সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হতে এ কথা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরীর কোন এক সময় নাযিল হয়েছিল ।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সুরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এতে রসুলে করীমের মহান বেগমদের সম্পর্কে কতিপয় ঘটনার দিকে ইংগিত ক'রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে ।

প্রথম কথা, হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার অধিকার ও ইখ্‌তিয়ার অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতরূপে একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ । সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবীর প্রতিও তার কোন অংশ প্রত্যর্পিত হয় নি । নবী, নবী হিসেবে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করতে পারেন এ কথা ঠিক । কিন্তু তা কেবল তখন, যখন আল্লাহ্‌ নিজেই তার দিকে কোন ইংগিত দিয়ে থাকেন । সে ইংগিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়েছে, কি হয় নি ; কিংবা তা গোপন অহীর মাধ্যমে জানা গিয়েছে, সে কথা স্বতন্ত্র । কিন্তু মূলতঃ ও নিজস্বভাবে আল্লাহ্‌র হালাল বা মোবাহ্‌ করা কোন জিনিসকে হারাম করে নেয়ার কোন অধিকার নবীরও নেই, নবী ছাড়া অন্য লোকদের এ অধিকার থাকতেই পারে না ।

দ্বিতীয় কথা, মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী তো দূরের কথা– বড় বড় ঘটনাও তেমন কোন গুরুত্বের দাবী রাখে না । কিন্তু নবীর জীবনে সংঘটিত সাধারণ ঘটনাও আইন (বা আইনের উৎস) হয়ে দাঁড়ায় । এ কারণে নবী-রসূলগণের জীবনের ওপর আল্লাহ্‌র তরফ হতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-তীব্র দৃষ্টি রাখা হয়, যেন তাদের সামান্যতম কাজ-কর্মও খোদার ইচ্ছা ও মর্যীর বিপরীত না হতে পারে । এ ধরনের কোন কাজই যদি নবী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে পড়ে কোন মুহূর্তে, তাহলে তা সংগে সংগেই এবং অনতিবিলম্বেই সংশোধন করে দেয়া হয়েছে । যেন ইসলামী আইন ও বিধান কেবল খোদার কিতাবেই নয়, নবীর সুন্নত ও উত্তম আদর্শেও স্বীয় আমলও সঠিকরূপে বর্তমান থাকতে ও বান্দাহদের নিকট কিতাবেই নয়, নবীর সুন্নত ও উত্তম আদর্শে ও স্বীয় আমল ও সঠিকরূপে বর্তমান থাকতে ও

বান্দাহদের নিকট পৌছিতে পারে এবং তাতে এমন বিন্দু পরিমাণও কিছু শামিল হ'তে না পারে যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় ।

তৃতীয় কথা পূর্বোক্ত তত্ত্ব কথা হতে স্বতঃই নিঃসৃত হয় । আর তা হ'ল এই যে, এক বিন্দু পরিমাণ কাজের দরুনও যখন নবী করীম (সঃ) এর ভুল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার কেবল সংশোধন করে দেয়াই হয় নি, তাকে রেকর্ডভুক্তও ক'রে নেয়া হয়েছে, তখন এ জিনিসই নিঃসন্দেহরূপে আমাদের দিলকে আশ্বস্ত ও আস্থাবান বানিয়ে দেয় যে, রসূলে করীমের (সঃ) পবিত্র জীবন হতে আমরা এখন যেসব কাজ-কর্ম ও হুকুম-হেদায়াত লাভ করি এবং যে বিষয়ে আল্লাহর নিকট হতে কোন আপত্তি বা সংশোধন রেকর্ডভুক্ত নেই, তা পুরোপুরি সত্য ও সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল । তা আল্লাহর মর্যীর সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ । আর আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে তা হ'তে হেদায়াত ও কর্ম নির্দেশ লাভ করতে পারি ।

আলোচ্য কালামে যে চতুর্থ কথাটি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তা এই যে, আল্লাহতা'আলা যে মহান রসূল করীমের ইজ্জত ও মান-মর্যাদাকে বান্দাহ্দের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ ও অংশরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর বেগমদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একবার আল্লাহ্'র হালাল করা একটা জিনিস নিজের উপর হারাম ক'রে নিয়েছিলেন এবং যে 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' কে আল্লাহতা'আলা নিজে সমস্ত ঈমানদার লোকদের 'মা' বলেছেন এবং যাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে তিনি নিজে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদেরকেই তিনি কোন কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্যে এ সূরায় তীব্র ভাষায় সতর্ক করেছেন । এ ছাড়া এ কথাও লক্ষণীয় যে নবীর ভুল ধরা ও 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাতে'র প্রতি এ সতর্কবাণী গোপনে করা হয়নি; বরং এ সেই কিতাবেই শামিল ক'রে দেয়া হয়েছে যা সমস্ত মুসলিম উম্মতকে সারাটি জীবন ধরে সব সময়ই তেলাওয়াত করতে হয় । এরূপ উল্লেখ দ্বারা আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূল ও উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে ঈমানদার লোকদের দৃষ্টিতে হীন করতে চান, এরূপ কথা কখনও সত্য নয় এবং তা হতেও পারে না । আর এ কথাও সত্য যে, কুরআন মজীদের এ সূরাটি পাঠ করে কোন মুসলমানের দিল হতে তাঁদের সম্মান উঠে যায় না বা নির্মূল হয়ে যায় না । তাহলে কুরআন মজীদে এ কাহিনী উল্লেখ করার মূল লক্ষ্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আল্লাহতা'আলা ঈমানদার লোকদেরকে তাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন ব্যক্তিদের সম্মান-শ্রদ্ধার সঠিক সীমার কথা জানিয়ে দিতে চান । বস্তুতঃ নবী নবীই, খোদা নন । তাই নবীর কোন ভুল হতে পারে না, তা ঠিক নয় । নবীর ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি মর্যাদার অধিকারী নন । নবীর সম্মান, মর্যাদা ও সম্ভ্রম এ জন্য যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্যীর পূর্ণাঙ্গ প্রতীক- পূর্ণ পরিণত প্রতিনিধি এবং তাঁর সামান্যতম পদস্খলন-ভুল-ভ্রান্তিও আল্লাহতা'আলা সংশোধন না ক'রে ছাড়েন নি । এ হতে আমরা এ নিশ্চিন্ততা ও পূর্ণ আশ্বস্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া উত্তম আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্যীসম্মত এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি । অনুরূপভাবে সাহাবা-এ-কেরাম ও নবীর পবিত্র বেগমগণও সকলে মানুষই ছিলেন, ফেরেশতা বা অতি মানুষ ছিলেন না । তাঁদেরও ভুল হতে পারে । তাঁরা যে সম্মান মর্যাদা-ই লাভ করেছেন, তা করেছেন এ জন্যে যে, আল্লাহর হেদায়াত ও আল্লাহর রসূলের প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম প্রতীকে পরিণত করেছিল । তাঁদের যা কিছু সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকার, তা শুধু এ কারণে; এরূপ মনগড়া কারণে নয় যে, তাঁরা বুঝি ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ ত্রুটি হ'তে মুক্ত ও পবিত্রা ছিলেন । এ জন্যেই নবী করীমের সোনালী যুগে সাহাবী বা নবী করীমের বেগমদের কর্তৃক- তাঁরা মানুষ ছিলেন বলে- কোন সময় কোন ভুল ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি হ'য়ে গেলে সে জন্যে সে ভুল বা ত্রুটি ধরা হয়েছে । তাঁদের কোন কোন ভুল-ত্রুটি স্বয়ং নবী করীম (সঃ) সংশোধন করেছেন; বহু সংখ্যক হাদীসে এর উল্লেখ পাওয়া যায় । আর কোন কোন ভুল-ত্রুটির উল্লেখ কুরআন মজীদে করা হয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহতা'আলাই তার সংশোধন করেছেন, যেন মুসলমানরা সম্মানিত লোকদের মান-মর্যাদার ব্যাপারে এমন কোন আতিশয্যপূর্ণ মনগড়া ধারণা পোষণ করতে শুরু না করে, যার দরুন তাঁদেরকে মানবতার পর্যায় হ'তে উপরে উঠিয়ে দেব-দেবী ও দেবতাদের পর্যায়ে পৌছে দেয় । আপনারা উদার উন্মুক্ত দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পাঠ করুন, দেখতে পাবেন এ ধরনের অসংখ্য সংশোধনীবাণী পর পর আপনার সম্মুখে স্পষ্টরূপে এসে যাচ্ছে । সূরা আলে-ইমরান-এ ওহুদ যুদ্ধের কথা উল্লেখ প্রসংগে সাহাবা -এ-কিরামকে সম্বোধন করে বলা

হয়েছেঃ আল্লাহতা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করিয়াছিলেন, তাহা তো তিনি পূরা করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারই হুকুমে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতেছিলে; কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখাইলে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মত পার্থক্য করিলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদিগকে সেই জিনিস দেখাইলেন যাহার ভালবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল), তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করিয়া বসিলে- কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছুসংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী, তখন আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে পশ্চাদবর্তী করিয়া দিলেন, যেন তোমাদের যাচাই-পরীক্ষা করিতে পারেন। আর সত্য কথা এই যে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমাই করিলেন; কেননা ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহতা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। (সূরা আলে ইমরান-আয়াত ১৫২)

সূরা নূর-এ হযরত আয়েশার ওপর দোষারোপের উল্লেখ করে সাহাবীগণকে বলা হয়েছেঃ

তোমরা যে সময় এ কথা শুনিতে পাইয়াছিলে সে সময়ই মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করিল না কেন? আর কেনইবা বলিয়া দিল না যে, ইহা সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অভিযোগ?... তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি না হইত তাহা হইলে যেসব কথা-বার্তায় তোমরা জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলে তাহার প্রতিশোধ হিসাবে বড় আযাব আসিয়া তোমাদেরকে গ্রাস করিত। (একটু ভাবিয়া দেখ, তখন তোমরা কত বড় ভুলই না করিতেছিলে।) যখন তোমাদের এক মুখ হইতে অন্য মুখে এই মিথ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেইসব কথাই বলিয়া বেড়াইতেছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না; তোমরা উহাকে একটি সাধারণ কথা মনে করিতেছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট ইহা ছিল অনেক বড় কথা! ইহা শুনিতেই তোমরা কেন বলিয়া দিলে না, "এই ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না; পাক মহান আল্লাহ। ইহা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।" আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহত করেন। ভবিষ্যতে যেন কখনও তোমরা এইরূপ কাজ আর কখনো না কর- যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক। (১২-১৭ আয়াত)

সূরা আহ্যাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছেঃ

হে নবী! তোমার স্ত্রীদিগকে বলঃ তোমরা যদি দুনিয়া ও উহার চাকচিক্যই পাইতে চাও তাহা হইলে এস, আমি তোমাদের কিছু দিয়া ভালভাবে বিদায় করিয়া দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রসূল ও পরকালের ঘর পাইতে চাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখিও তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্যশীল, তাহাদের জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। (২৮-২৯ আয়াত)

সূরা জুম'আয় সাহাবাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

আর তাহারা যখন ব্যবসায় ও খেলা-তামাশা হইতে দেখিল, তখন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুত চলিয়া গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া গেল। তাহাদিগকে বলঃ- আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে তাহা খেল-তামাশা অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রেযকদাতা। (১১ আয়াত)

সূরা মুমতাহিনা'য় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতা'আকে একটি কাজের জন্য শক্তভাবে পাকড়াও করা হয়েছে। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবী করীমের মক্কা আক্রমণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের গোপন খবর-কুরাইশ কাফেরদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ সব দৃষ্টান্তই কুরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে- সেই কুরআনে যাতে সাহাবা ও নবীর পবিত্রা বেগমদের মান-মর্যাদা ও সম্মান-সম্ভ্রমের কথা নিজেই বলেছেন। এবং তাঁদেরকে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা অ-রাযু আনহু'র সুসংবাদ শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি এই ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাই মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই ঘূর্ণাবর্তে পতিত হওয়া হতে রক্ষা করেছে যাতে ইহুদী ও খৃষ্টানরা পড়েছে। আর এরই ফলে হাদীস, তফসীর ও

ইতিহাস বিষয়াদি সম্পর্কে আহলি-সুন্নাতের যেসব বড় বড় লোক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, তাতে এক দিকে যেমন সাহাবায়ে কিরাম, আজওয়াযে মুতাহ্হারাত ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনিই অপর দিকে তাঁদের দুর্বলতা, পদস্খলন ও ভুল-ত্রুটি সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করা হয়নি। অথচ বুজর্গদের প্রতি সম্মান দেখানোর আজকের দাবীদারদের তুলনায় এ গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ সব মহা সম্মানিত লোকদের মান-মর্যাদা বেশী জানতেন ও চিনতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমার সাথে তাঁরা বেশী পরিচিত ছিলেন।

এ সূরায় যে পঞ্চম কথাটি পুরাপুরিভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তাহ'ল আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিরপেক্ষ; এ দ্বীনে প্রত্যেকের জন্যে শুধু তাই আছে যা সে নিজের ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে পাবার যোগ্য ও অধিকারী। বড় কোন সত্তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক কাকেও বিশেষ ফায়দা দিতে পারে না এবং কোন নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কও কারও জন্যে কিছু মাত্র ক্ষতিকর নয়। এ পর্যায়ে নবী করীমের বেগমগণের সামনে তিন ধরনের স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত হযরত নূহ্ ও হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী দ্বয়ের। তারা ঈমান আনলে এবং নিজেদের মহা-সম্মানিত স্বামীগণের সঙ্গে সহযোগিতা করলে মুসলিম উম্মতের নিকট তাদের মান-মর্যাদা তাই হ'ত যা রয়েছে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বেগমগণের। কিন্তু তারা যেহেতু এর বিপরীত নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে এ কারণে নবীর স্ত্রী হওয়া তাদের কোন কাজেই আসলো না। তারা জাহান্নামে যাবে, কেউই তা হতে রক্ষা পাবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ফেরাউনের স্ত্রীর। তিনি ছিলেন খোদার নিকৃষ্টতম শত্রুর স্ত্রী কিন্তু তিনি যেহেতু ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফিরাউনী জাতির কাজ ও কর্মনীতি হতে নিজের জন্যে কাজ ও কর্মনীতির সম্পূর্ণ ভিন্নতর পথ গ্রহণ করেছিলেন, এ কারণে ফেরাউনের ন্যায় এক অতিবড় কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর জন্যে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আল্লাহতা'আলা তাঁকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হযরত মরিয়ম (আঃ) এর। তাঁকে এ বিরাট মহান-মর্যাদা দেয়া হয়েছে শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহতা'আলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তিনি সেজন্যে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দিয়েছিলেন। হযরত মরিয়ম ছাড়া দুনিয়ার অপর কোন সচ্চরিত্রবান, সদাচারী ও নেক আমলকারী মেয়েকে কখনও এতবড় কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়নি। তিনি ছিলেন কুমারী; এ অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জেযা হিসাবে তাঁর গর্ভে সন্তানের সঞ্চার করে দেয়া হ'ল। তাঁর খোদা তাঁর দ্বারা কি মহান কার্য সম্পন্ন করতে চান তা তাঁকে বলে দেয়া হ'ল। হযরত মরিয়ম সে জন্যে কোন কান্নাকাটি, চিৎকার-হাহাকার বা বিলাপ করলেন না। একজন সত্যিকার নিষ্ঠাবতী মু'মিনের ন্যায় তিনি সব কিছু সহ্য করে নেয়ার জন্যে অকপটে প্রস্তুত হলেন। কেননা আল্লাহর মর্যী পূরণের জন্যে এ সহ্য করে নেয়া ছিল একান্তই অপরিহার্য। ঠিক তখনই আল্লাহতা'আলা তাঁকে سيدة النساء في الجنة 'জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা' নামে অভিহিত করলেন। (মুসনাদে আহমদ)।

এসব ছাড়াও আরও একটা মহা সত্য এ সূরা হতে জানতে পারা যায়। তাহ'ল এই যে, নবী করীমের নিকট আল্লাহর নিকট হতে কেবল এই 'ইলমই আসত না যা কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সূরার ৩য় আয়াত এর অকাট্য প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) তাঁর বেগমদের মধ্যে একজনকে গোপনে একটা কথা বললেন। তিনি তা অন্য একজনকে বলে দিলেন। আল্লাহতা'আলা এ ব্যাপারটি নবী করীম (সঃ)-কে জানিয়ে দিলেন। পরে নবী করীম (সঃ) যখন সেই স্ত্রীকে তাঁর এ ভুলের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এ ভুলের কথা আপনাকে কে বললো, নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'আমাকে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত আল্লাহতা'আলাই এ কথা জানিয়েছেন।' এখন কথা হ'ল এই যে, সারা কুরআন মজীদে কোথাও এরূপ কোন আয়াত নেই যাতে বলা হয়েছে, হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যে গোপন কথাটি বলেছিলে, তা সে অন্য একজনকে-কিংবা অমুক ব্যক্তিকে বলে দিয়েছে।'-আর যখন তা নেই তখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ছাড়াও নবী করীমের প্রতি আল্লাহর অহী নাযিল হ'ত। নবী করীমের প্রতি কুরআন ছাড়া অন্য কোন অহী আসতো না বলে যারা দাবী করে বা বলে তারা ভ্রান্ত।

১. হে নবী ! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যাহা আল্লাহতা'আলা তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন[১] ? (তাহা কি এই জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পাইতে চাও[২] ? –আল্লাহ্ ক্ষমাদানকারী অনুগ্রহকারী ।

২. আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন[৩] । আল্লাহ্ তোমাদের মনিব–মালিক । আর তিনিই সর্বজ্ঞ ও সুষ্ঠু সুদৃঢ় কর্ম–সম্পাদনকারী ।

১। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্ন নয়– এ না পছন্দ করার অভিব্যক্তি; অর্থাৎ নবীর (সঃ) কাছ থেকে এ কথা জানা উদ্দেশ্য নয় যে– তিনি কেন এ কাজ করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য– তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে– আল্লাহর নির্ধারিত হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার যে কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে আল্লাহতা'আলা তা পছন্দ করেন না । যেহেতু তাঁর স্থান ও মর্যাদা এক সাধারণ মানুষের মত নয়; বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল; তিনি কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে নিলে এ আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যে– উম্মতও সে জিনিসকে হারাম বা কমপক্ষে মকরূহ (অপছন্দনীয়) ধারণা করতে থাকবে । এজন্যে আলাহতা'আলা তাঁর এ কাজের দোষ ধরেছেন এবং তাঁকে এই 'হারাম করা' থেকে বিরত হ'তে আদেশ দিয়েছেন । এর থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে– রসূলের (সঃ) ও নিজের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম করার অধিকার নেই ।

২। এর দ্বারা জানা গেল– হুযুর (সঃ) হারাম করার এই কাজ– নিজে নিজের কোন ইচ্ছাবশে করেননি, বরং তাঁর বিবিরা চেয়েছিলেন যে– তিনি এরূপ করুন এবং তিনি মাত্র তাঁর বিবিদের সন্তুষ্ট করার জন্যে একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্যে হারাম গণ্য করেছিলেন । হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায়– রসূলের (সঃ) এক বিবির (হযরত যয়নব রাঃ) গৃহে কোন স্থান থেকে মধু এসেছিল, হুযুর যা বড় পছন্দ করতেন । এ জন্যেই তিনি তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে তাঁর ঘরে বেশী সময় অবস্থান করতে থাকেন । এতে অন্য কোন কোন বিবির ঈর্ষা সৃষ্টি হয়, এবং তাঁরা পরামর্শ করে এই মধুর প্রতি তাঁর এরূপ ঘৃণা জন্মালো যে– তিনি তা ব্যবহার না করার অঙ্গীকার করেন ।

৩। মর্ম হচ্ছে– কাফ্ফারা দিয়ে শপথের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়ার যে পদ্ধতি আল্লাহতা'আলা সূরা মায়েদার ৮৯তম আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা পালন করে তিনি সে অঙ্গীকার ভংগ করেন যার দ্বারা তিনি হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন ।

৩. (এই ব্যাপারটি বিবেচ্য যে) নবী একটি কথা নিজের একজন স্ত্রীর নিকট অতি গোপনীয়তা সহকারে বলিয়াছিল, পরে সেই গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছিল এবং আল্লাহতা'আলা নবীকে এই (গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার) বিষয়টি জানাইয়া দিলেন, তখন নবী (তাঁহার স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কতকটা সতর্ক করিয়াছিল, আর কতকটা ছাড়িয়া দিয়াছিল। পরে নবী যখন তাহাকে (গোপন কথা প্রকাশ করার) এই ব্যাপারটি বলিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে ইহা কে জানাইয়া দিল?" নবী বলিল, 'আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন তিনি যিনি সবকিছুই জানেন এবং সর্বজ্ঞ'[৪]।

৪. তোমরা দুইজন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর (তবে ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম), কেননা তোমাদের দিল সঠিক-নির্ভুল পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে[৫]। আর যদি নবীর মুকাবিলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তাহার মালিক; আর তাহার পর জিবরাঈল এবং সমস্ত নেককার ঈমানদার লোক

৪। সে গুপ্ত কথাটি কি ছিল কোন রেওয়ায়েত থেকে নির্দিষ্টরূপে এ কথা জানা যায় না। এবং যে উদ্দেশ্য সাধনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সে দিক দিয়ে এ প্রশ্নের আদৌ কোন গুরুত্বও নেই যে, সে গুপ্ত কথাটি কি। যে আসল উদ্দেশ্যের জন্যে কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে রসূলুল্লাহর পবিত্র স্ত্রীগণের ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সমস্ত দায়িত্বশীল লোকদের স্ত্রীদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা যে তাঁরা গুপ্ত কথা হেফাযত করার ব্যাপারে যেন অসাবধানতা অবলম্বন না করেন। তিনি যত বড় মর্যাদার অধিকারী তাঁর গৃহের গুপ্ত কথা প্রকাশ পাওয়া ততই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কথা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা গুরুত্বপূর্ণ না হোক, গোপন রহস্য হেফাযত করার ব্যাপারে অবহেলার অভ্যাস থাকলে লঘু কথার মত কোন এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাও প্রকাশ হ'য়ে যেতে পারে।

৫। এই দু'জন বলতে- হযরত ওমরের (রাঃ) বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) কে বোঝানো হয়েছে; এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থঃ হযরত ওমরের বর্ণনা মতে- এই দুই বিবি হযুরের সাথে কিছু বেশী সাহসের সংগে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন আল্লাহতা'আলা যা পছন্দ করেননি; এবং সেজন্য তাঁদের ভর্ৎসনা করেন।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝٤ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ

তোমাদের তালাক দেয় (নবী) যদি তার রব সম্ভবতঃ সাহায্যকারী উপরন্তু ফেরেশতারা ও

يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ

আনুগত্যশীলা মুমিনা আত্মসমর্পণকারিণী (যারা) তোমাদের চেয়ে উত্তম (এমন সব) স্ত্রী তাকে বদলে দেবেন

تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝٥ يٰٓاَيُّهَا

ওহে কুমারী ও অকুমারী রোজাদার ইবাদতকারিণী তওবাকারিনী

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا

যার ইন্ধন আগুন (থেকে) তোমাদের পরিবার বর্গকে ও তোমাদের নিজেদের তোমরা রক্ষাকর ঈমান এনেছ যারা

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا

না কঠোর নির্দয় ফেরেশতারা তার উপর পাথর ও মানুষ

يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

তাদের নির্দেশ দেয়া হয় যা তারা করে এবং তাদের নির্দেশ দেন তিনি যা আল্লাহকে তারা অমান্য করে

ও সব ফেরেশতা তাহার সঙ্গী-সাথী সাহায্যকারী[৬]।

৫. অসম্ভব নয় যে, নবী যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিবেন, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে[৭]। -সত্যিকার মুসলমান ঈমানদার, আনুগত্যশীল, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী হউক কিংবা কুমারী।

৬. হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন হইতে রক্ষা কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর[৮]। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ-রূঢ় নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকিবে, যাহারা কখনই আল্লাহর হুকুমের অমান্য করে না। আর যে হুকুমই তাহাদিগকে দেওয়া হয়, তাহা ঠিক ঠিকই পালন করে।

৬। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর মুকাবিলায় তোমরা দল বেঁধে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কেননা যাঁর অভিভাবক রয়েছেন আল্লাহ্ এবং জিবরাঈল ও ফেরেশতারা ও সমস্ত সৎ মু'মিনরা যাঁর সংগে আছেন তাঁর মুকাবিলায় দল বেঁধে কেউই সফলকাম হতে পারে না।

৭। এ থেকে জানা যায়- দোষ মাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসারই (রাঃ) ছিল না, বরং রসূলুল্লাহর অন্যান্য পবিত্রা বিবিগণও কিছু না কিছু দোষী ছিলেন। এ জন্যে তাঁদের দু'জনের পর এই আয়াতে বাকী সব বিবিগণকেও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় সে সময়ে হুযুর (সঃ) বিবিদের প্রতি এতদূর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে- এক মাস পর্যন্ত তিনি তাঁদের সংগে সম্পর্ক রাখেননি, এবং সাহাবাদের মধ্যে একথা রটে যায় যে- তিনি তাঁর বিবিদের তালাক দিয়েছেন।

৮। এ আয়াত থেকে জানা যায়ঃ এক ব্যক্তির দায়িত্ব মাত্র নিজেকেই খোদার শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং প্রাকৃতিক শৃংখলা ব্যবস্থা যে পরিবারের কর্তৃত্বভার তার উপর অর্পণ করেছে, নিজের সাধ্যমত তাদের এরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব- যাতে তারা খোদার পছন্দনীয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে, এবং যদি তারা জাহান্নামের পথে চলে তবে যথাসাধ্য তাদেরকে সে রাস্তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। 'জাহান্নামের ইন্ধন হইবে পাথর' অর্থাৎ- পাথরের কয়লা সম্ভবতঃ। ইবনে মাসউদ (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), মোজাহেদ (রাঃ), ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ), সুদ্দি (রাঃ) বলেন- গন্ধকের পাথর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ

ওহে | যারা | কুফরি করেছ | না | তোমরা ওজর পেশ করো | আজ | প্রকৃতপক্ষে | তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۟ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى

যা | তোমরা কাজ করতেছিলে | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা তওবা কর | নিকট

ع ১৭

اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ

আল্লাহর | তওবা | খালেস | সম্ভবতঃ | তোমাদের রব | মোচনকরবেন

عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

তোমাদের থেকে | তোমাদের দোষগুলো | এবং | তোমাদের প্রবেশ করাবেন | জান্নাতে | প্রবাহিত হয় | থেকে

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ

তার পাদদেশ | ঝর্ণাধারাসমূহ | সেদিন | না | লাঞ্ছিত করবেন | আল্লাহ | নবীকে | ও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ

যারা | ঈমান এনেছে | তার সাথে | তাদের নূর | দৌড়াবে | তাদের সামনে | ও

بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ

তাদের ডানে | তারা বলবে | হে আমাদের রব | পূর্ণকর | আমাদের জন্যে | আমাদের নূর | ও | মাফ কর | আমাদেরকে

৭. (তখন বলা হইবে) হে কাফেররা! আজ কোন ওযর–অক্ষমতার বাহানা পেশ করিও না। তোমাদিগকে তো সেই রকমই কর্মফল দেওয়া হইবে, যে রকম আমল তোমরা করিতেছিলে।

রুকূ ঃ ২

৮. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তওবা কর– খাঁটি ও সত্যিকার তওবা। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের দোষ–ত্রুটিগুলি তোমাদের হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করিয়া দিবেন যেসবের নিম্নদেশ হইতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকিবে। ইহা সেই দিন হইবে, যেদিন আল্লাহ্ তাঁহার নবীকে এবং তাঁহার ঈমানদার সংগী–সাথীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন না[১]। তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান পাশ দিয়া দৌড়াইতে থাকিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবেঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের নূর আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমাদান কর।

১। অর্থাৎ তাদের সৎকাজের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। কাফের ও মুনাফিকদের এ বলার অবকাশ কখনো দেবেন না যে– এরা খোদার উপাসনা–আনুগত্য করেছিলো তো তার কি প্রতিদান পেল?' লাঞ্ছনা–অপমান বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের ভাগ্যে ঘটবে; অনুগত ও আদেশ পালনকারীদের ভাগ্যে নয়।

তুমিই সর্বশক্তিমান ।

৯. হে নবী। কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাহাদের সহিত কঠোর নীতি প্রয়োগ কর । তাহাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম এবং পরিণতি হিসাবে উহা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান ।

১০. আল্লাহ্ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ ও লূত-এর স্ত্রীদিগকে দৃষ্টান্তরূপে পেশ করিতেছেন । ইহারা আমাদের দুইজন নেক বান্দাহর স্ত্রী ছিল । কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে[১০] এবং তাহারা আল্লাহর মুকাবিলায় তাহাদের কোন কাজেই আসিতে পারিল না । দুইজনকেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ 'যাও আগুনে প্রবেশকারী লোকদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর' ।

১১. আর ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন,

১০। 'এ বিশ্বাসঘাতকতা' এই অর্থে নয় যে তারা ব্যভিচার করেছিল, বরং এই অর্থে যে তারা ঈমানের পথে হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর সহযোগিতা করেনি বরং তাঁদের বিরুদ্ধে দ্বীনের শত্রুদের সংগে সহযোগিতা করেছিল ।

যখন সে দো'আ করিয়াছিলঃ হে আমার খোদা, আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একখানি ঘর বানাইয়া দাও এবং আমাকে ফেরাউন ও তাহার কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর, আর যালেম লোকজন হইতে আমাকে মুক্তি দান কর'।

১২. আর ইম্‌রানের কন্যা মরিয়মের[১১] দৃষ্টান্ত দিতেছেন, যে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করিয়াছিল[১২]। পরে আমরা তাহার ভিতরে নিজের পক্ষ হইতে রুহ ফুঁকিয়া দিলাম[১৩]। এবং সে স্বীয় খোদার বাক্য-সমূহ এবং তাঁহার কিতাব-সমূহের সত্যতা স্বীকার করিল। আর আসলে সে অনুগত-বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল[১৪]।

১১। হতে পারে- হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল-ইমরান; অথবা তিনি ইমরানের-বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে তাঁকে ইমরান কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১২। এ ছিল ইহুদীদের এই অপবাদের খণ্ডন যে- তাঁর গর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মলাভ-মা'আযাল্লাহ-কোন পাপের পরিণাম-ফল। সূরা নিসার ১৫৬তম আয়াতে এই যালেমদের এই অভিযোগকে বিরাট অপবাদ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

১৩। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কোন পুরুষের সংযোগ ছাড়াই, আমি তাঁর গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ নিক্ষেপ করি।

১৪ হযরত মরিয়মকে এখানে যে উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে- কুমারী অবস্থায় অলৌকিকভাবে তাঁকে গর্ভবতী করে আল্লাহতা'আলা তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যসহকারে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

সূরা আল্‌–মুল্‌ক

নামকরণ

সূরাটির প্রথম বাক্যাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ –এর 'আল্‌–মুলক' শব্দটিকে এ সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

এ সূরাটি ঠিক কখন নাযিল হয়েছিল, তা নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা হতে জানা যায়নি। কিন্তু সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ভংগী হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এটা মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এ সূরায় একদিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামের মৌল শিক্ষা উপস্থাপিত করা হয়েছে, আর অপরদিকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভংগীতে অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা লোকদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তাতে ইসলামের যাবতীয় মৌল শিক্ষা উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং রসূলে করীম (সঃ)–এর প্রেরিত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা বিস্তারিতভাবে নয়; অতি সংক্ষেপে, যেন তা লোকদের মন–মগজে গভীরভাবে দৃঢ়মূল হয়ে বসতে পারে। সে সংগে তাতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এ কথার উপর, যেন লোকদের বেখেয়ালী ও অসতর্কতা দূর হয়ে যায়, তাদেরকে চিন্তা–ভাবনা করতে বাধ্য করা যায়, তাদের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগ্রত করা সম্ভবপর হয়।

সূরাটির প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করতে চাওয়া হয়েছে যে, তারা যে বিশ্বলোকে বসবাস করছে তা একটা অতীব সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য বিশেষ। তাতে আঁতিপাতি করে খুঁজলেও কোনরূপ ত্রুটি–বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা বা ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না। আল্লাহতা'আলা নিজেই এই বিরাট–বিশাল সাম্রাজ্যকে অনস্তিত্বের অন্ধকার হতে অস্তিত্বের আলোকোজ্জ্বল পটভূমিতে নিয়ে এসেছেন। তার কার্যপরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ–প্রশাসনের সমস্ত অধিকার–ইখতিয়ার সম্পূর্ণ ও নিরংকুশভাবে সেই এক আল্লাহতা'আলারই মুষ্ঠিতে একান্তভাবে নিবদ্ধ। তাঁর শক্তি–ক্ষমতা ও কুদরাত অনন্ত ও সীমাহীন। সেই সংগে মানুষকে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এই পরম বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় মানুষকে আদৌ উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানুষকে এ দুনিয়ায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। এ পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র অবলম্বন হলো উত্তম আমল।

৬ হতে ১১ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুফরীর ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ পরিণতি দেখা যাবে পরকালে। লোকদেরকে এও বলে দেয়া হযেছে যে, আল্লাহতা'আলা তাঁর নবী–রসূলগণকে পাঠিয়ে তোমাদেরকে সেই পরিণতি সম্পর্কে এ দুনিয়ায়ই অবহিত করেছেন। এখন তোমরা যদি নবী–রসূলগণের কথা অনুযায়ী নিজেদের আচার–আচরণ যথার্থ ও সঠিক করে না নাও, তা হলে পরকালে তোমরা এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, তোমাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা পাবার জন্যে তোমরা বাস্তবিকই উপযুক্ত। তোমাদের নিজেদের আমল ও চরিত্রের জন্যেই যে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা বুঝতেও কোন অসুবিধা হবে না।

১২ হতে ১৪ পর্যন্ত আয়াত কটিতে এ মহাসত্য মানসপটে দৃঢ়মূল করানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বে–খবর হয়ে থাকতে পারেন না। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি ব্যাপার এমন কি তোমাদের অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন চিন্তাধারা পর্যন্ত সব কিছুই তিনি জানেন। কাজেই নৈতিকতার নির্ভুল ভিত্তি হলো মানুষ সেই না দেখা খোদাকে, খোদার নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় করে সর্বপ্রকার পাপ, অপরাধ ও অন্যায় কাজ–কর্ম হতে বিরত থাকবে, দুনিয়ার কোন শক্তি

তাকে সেজন্য পাকড়াও করুক আর না-ই করুক, দুনিয়ায় তার কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিক আর না-ই দিক, তার সম্ভাবনা থাকুক আর না-ই থাকুক, তাতে কোনরূপ পার্থক্য হবে না। এ কর্মনীতি যারাই অবলম্বন করবে, পরকালে তারাই ক্ষমা ও বিরাট শুভ ফল পাবার অধিকারী হবে।

১৫ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কতগুলো চিরন্তন ও শাশ্বত মহাসত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ সত্যসমূহকে মানুষ সাধারণত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার মনে ক'রে এগুলোর প্রতি খুবই কম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ আয়াত ক'টিতে সেই মহাসত্য ক'টির প্রতি বারবার ঈশারা-ইংগিত করে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হযেছে, তোমরা এ পৃথিবীর মাটির প্রতি লক্ষ্য আরোপ কর। তোমরা এর ওপর নিশ্চিন্তে বসবাস করছো। এ হতেই তোমরা লাভ করছো তোমাদের জীবন-জীবিকা ও প্রয়োজনীয় রুটি-রুযি। এ যমীনকে তোমাদের অধীন ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতা'আলাই। নতুবা এ পৃথিবীতে যে কোন মুহূর্তে এমন ভয়াবহ ও প্রলয়ংকর ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে যার ফলে তোমরা সকলে মাটির সঙ্গে মিশে একাকার ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পার অথবা এমন সর্বগ্রাসী ঝড়-তূফান আসতে পারে যা তোমাদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম। আকাশের শূন্যলোকে উড়ন্ত পক্ষীকুলকে তোমরা লক্ষ্য কর। কেবলমাত্র আল্লাহতা'আলাই তাদেরকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখছেন। তোমাদের নিজেদের যাবতীয় উপায়-উপকরণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আল্লাহ নিজেই যদি তোমাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করতে চান, তাহলে তা হতে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহই যদি তোমাদের রিয্‌ক লাভের উৎস ও উপায় বন্ধ করে দেন, তা হলে কে তোমাদের জন্যে তা খুলে দেবার ক্ষমতা রাখে?---প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তোমাদেরকে পরিচিত করার জন্যে এসব জিনিসই বর্তমান আছে। কিন্তু তোমরা তা দেখ---ঠিক জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে ও নিতান্তই উদ্দেশ্যহীনভাবে। জন্তু-জানোয়াররাও এগুলো দেখে বটে, কিন্তু তা হতে কোন ফল বা শিক্ষা গ্রহণের কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। আর আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে মানুষ হওয়ার কারণে যে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি এবং চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবনের জন্যে যে মন-মগজ দিয়েছেন, তোমরা তা কোন কাজেই ব্যবহার করো না। আর ঠিক এ কারণেই তোমরা প্রকৃত সত্য ও কল্যাণের পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টিতে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত খোদার সমীপে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু সে সময়টা বাস্তবিকই কখন তা আগেভাগে বলে দেয়া নবীর কাজ নয়। তাঁর কাজ হলো সেই দিনটি আগমনের সংবাদ তোমাদেরকে আগাম জানিয়ে দেয়া। আজ তোমরা তা জানছো না, সে সময়টিকে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে দেখাবার জন্যে তোমরা নবীর কাছে দাবী জানাচ্ছ। কিন্তু বস্তুতই সেই সময়টি যখন এসে উপস্থিত হবে, তোমরা তা নিজেদের চোখে দেখে নেবে, তখন তোমরা দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। তখন তোমাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা এ জিনিসটিকেই তো অবিলম্বে এনে উপস্থিত করার জন্যে বার বার দাবী জানাচ্ছিলে!

২৮ ও ২৯ আয়াতে মক্কার কাফেরদের সে সব কথার জওয়াব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী করীম (সঃ)কে নানাভাবে উত্যক্ত ও গালাগাল করতো। ঈমানদার লোকদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্যে তারা দো'আ প্রার্থনা করতো। এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যে লোক তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি ধ্বংসই হন কিংবা আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, তাতে তোমাদের ভাগ্য পরিবর্তিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে। তোমাদের নিজেদের সম্পর্কেই তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। খোদার আযাব যদি তোমাদেরকে পরিবেষ্টিত করে তা হলে তা হতে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেছে, তোমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করছো। কিন্তু সত্য ব্যাপার যে কি, তা একদিন অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হবে।

সূরার শেষদিকে লোকদের সামনে একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। আর এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তাদেরকে বলা হয়েছে। প্রশ্নটি হলোঃ আরবের ঊষর-ধূষর মরুভূমি ও পর্বত-সংকুল অঞ্চলে তোমাদের জীবন যে পানির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তা একটি স্থান হতে উৎসারিত হয়েছে। এ পানি যদি যমীনে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া আর কে তোমাদেরকে এই সঞ্জীবনী এনে দিতে পারে?

১। অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁহার মুঠির মধ্যে রহিয়াছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব–সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই তাঁহার কর্তৃত্ব সংস্থাপিত[১]।

২। তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করিয়াছেন, যেন তোমাদিগকে পরখ করিয়া দেখিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়া সর্বোত্তম ব্যক্তি কে[২]? তিনি যেমন সর্বজয়ী শক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীলও।

৩। তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করিয়াছেন। তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোনরূপ অসংগতি পাইবে না[৩]। দৃষ্টি আবার ফিরাইয়া দেখ, কোথায়ও কোন দোষ-ত্রুটি[৪] দৃষ্টিগোচর হয় কি?

১। অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না যে, তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন,আর তা করতে পারবেন না।

২। অর্থাৎ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে এবং কোন মানুষের কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্যে তিনি দুনিয়াতে মানুষের জীবন-মরণের পরম্পর শুরু করেছেন।

৩। মূলে আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অসংগতি, একটি জিনিসের অন্য জিনিসের সংগে মিল না থাওয়া। ফ্যালের মধ্যে অমিল হওয়া।

৪। মূলে আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ—ফাটল, ফাঁক, ছিদ্র,দীর্ণতা, ভগ্ন হওয়া। অর্থাৎ সারা বিশ্বের সংযোগ-সূত্র এরূপসম্পন্ন এবং যমীনের একটি অণু থেকে আরম্ভ করে বিশাল মহান ছায়াপথসমূহ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস এরূপ সুসংবদ্ধ যে, কোথাও বিশ্ব-শৃংখলার মধ্যেকার পারম্পর্য ভংগ হয় না। তোমরা যতই অনুসন্ধান কর না কেন, তোমরা কোন স্থানেই এই শৃংখলা-ব্যবস্থায় সামান্যতম ছিদ্র বা ত্রুটি পাবে না।

৪। বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত- শ্রান্ত ও ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

৫। আমরা তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে[৫] বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছি। শয়তানগুলিকে মারিয়া তাড়াইবার জন্য এইগুলিকে উপায় ও মাধ্যম বানাইয়াছি। এই শয়তানগুলির জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৬। যেইসব লোক তাহাদের রব্‌কে অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে। উহা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান।

৭। তাহারা যখন উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহার ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনিতে পাইবে[৬]। উহা তখন উথাল-পাতাল করিতে থাকিবে,

৮। ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে। প্রতিবারে যখনই উহাতে কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার কর্মচারীরা সেই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেঃ কোন সাবধানকারী কি তোমাদের নিকট আসে নাই?

৫। নিকটস্থ আসমানের অর্থ— দূরবীন ছাড়া খোলা চোখে গ্রহ-নক্ষত্রখচিত যে আসমান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

৬। এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ খোদ জাহান্নামের আওয়াজ হবে বা এও হতে পারে যে, এ আওয়াজ জাহান্নাম থেকে উত্থিত হতে শোনা যাবে যেখানে তাদের পূর্বে পতিত লোকেরা চীৎকার করতে থাকবে।

৯। তাহারা জওয়াবে বলিবেঃ হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট আসিয়াছিল বটে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই'। আসলে তোমরা খুব বেশী গুমরাহীতে নিমজ্জিত হইয়া আছ।

১০। আর তাহারা বলিবেঃ 'হায়, আমরা যদি শুনিতাম ও অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হইতাম না'।

১১। এইভাবে তাহারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া লইবে। এই দোজখীদের উপর অভিশাপ!

১২। যাহারা নিজেদের অ-দেখা খোদাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও অতিবড় শুভ ফল।

১৩। তোমরা চুপেচাপে কথা বল কিংবা উচ্চস্বরে (উভয় অবস্থাই আল্লাহর জন্য সমান) তিনি তো মনের নিভৃত গহনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।

১৪। তিনিই কি জানিবেন না যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন৭? অথচ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিজ্ঞ।

১৫। সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন বানাইয়া রাখিয়াছেন, তোমরা চলাচল কর উহার বক্ষের উপর এবং ভক্ষণ কর খোদার রিযক; তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে পুনর্জীবিত হইয়া যাইতে হইবে।

১৬। তোমরা কি নির্ভয় হইয়া গিয়াছ সেই মহান সত্তা সম্পর্কে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন৮, তিনি তোমাদিগকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন এবং এই ভূতল সহসা হ্যাচকা টানে টল-টলায়মান হইয়া কাঁপিতে শুরু করিবে?

১৭। তোমরা কি এই ব্যাপারে নির্ভয় হইয়া গিয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রবল বায়ু প্রবাহিত করিবেন? পরে তোমরা জানিতে পারিবে যে, আমার সতর্কীকরণ কি রকম হইয়া থাকে।

৭। দ্বিতীয় প্রকারের অনুবাদ এও হতে পারেঃ "তিনি কি নিজের সৃষ্টিকেই জানবেন না?"

৮। এর মর্ম এ নয় যে, আল্লাহতা'আলা আসমানে থাকেন বরং এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে এ কথা বলা হয়েছে-মানুষ যখন নিজেকে খোদার দিকে রুজু করতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া প্রার্থনা করতে হ'লে সে উর্ধে হাত উঠায়। বিপদের সময় যখন সে সব আশ্রয় থেকে নিরাশ হয় তখন সে আসমানের দিকে মুখ তুলে খোদার কাছে ফরিয়াদ জানায়। কোন আকস্মিক বিপদাপদ ঘটলে মানুষ বলে, 'উপর থেকে বিপদ নাযিল হয়েছে।' অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে মানুষ বলে-'এ উর্ধলোক থেকে এসেছে'। আল্লাহতা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। এসব কথা হতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, মানুষ যখন খোদা সম্পর্কে ধারণা করে তখন তার খেয়াল নিচে যমীনের দিকে নয় বরং উপরে আসমানের দিকে যায়: এ ব্যাপারটি মানুষের প্রকৃতিগত।

১৮। ইহাদের পূর্বে অতীত হইয়া যাওয়া লোকেরা তো অমান্য ও অবিশ্বাস করিয়াছে। লক্ষ্য কর আমার পাকড়াওটা কত কঠিন ও কঠোর ছিল।

১৯। এই লোকেরা কি নিজেদের উপর উড়ন্ত পাখীগুলিকে পক্ষ বিস্তার করিতে ও গুটাইয়া লইতে দেখে না? মহান রহমান ছাড়া উহাদিগকে অন্য কেহ ধরিয়া রাখে না। তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষক।

২০। বল, তোমাদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হইয়া আছে যাহারা রহমানের বিরুদ্ধে যাইয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে[১]? সত্য কথা এই যে, এই অমান্যকারীরা ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছ।

২১। অথবা বল, তোমাদিগকে কে রিযক দিতে পারে রহমানই যদি তাঁহার রিযক দান বন্ধ করিয়া দেন? আসল কথা হইল, এই লোকেরা খোদাদ্রোহিতা ও সত্য পরিহার করার উপর অবিচল হইয়া আছে।

১। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে- "রহমান ছাড়া কে আছে যে, তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদের সাহায্য করে?"

২২। খানিকটা ভাবিয়াই দেখ না, যে লোক উল্টা দিকে মুখ করিয়া চলিতেছে[১০] সে অধিক সত্য পথপ্রাপ্ত, কিংবা যে লোক মাথা উঁচু করিয়া সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে?

২৩। ইহাদিগকে বল, কেবল আল্লাহই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদিগকে শুনিবার ও দেখিবার শক্তি দান করিয়াছেন এবং চিন্তা-গবেষণা-অনুধাবনকারী দিল্ দিয়াছেন। কিন্তু তোমরা তো খুব কমই শোকর আদায় করিয়া থাক[১১]।

২৪। এই লোকদিগকে বল, কেবল আল্লাহই তোমাদিগকে ভূতলে ছড়াইয়া দিয়াছেন আর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে গুটাইয়া লইয়া একত্রে উপস্থিত করা হইবে।

২৫। এই লোকেরা বলেঃ 'তোমরা যদি প্রকৃতই সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হইবে?

২৬। বলঃ এই বিষয়ের জ্ঞান তো আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র।

১০। অর্থাৎ পশুর ন্যায় মুখ নিম্নমুখি করে ঠিক সেই পথ রেখা ধ'রে চলে যাচ্ছে যে রেখা বরাবর কেউ তাদেরকে চালিয়ে নিয়েছে।

১১। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির নে'আমতসমূহ তোমাদেরকে সত্যকে চিনবার ও জানবার জন্যে দান করেছিলেন। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো;-এই নে'আমতগুলো দ্বারা তোমরা সব রকমের কাজসম্পন্ন করছো কিন্তু মাত্র সেই একটি কাজই সম্পাদন করছো না, যে কাজের জন্যে এগুলো তোমাদেরকে দান করা হয়েছিল।

২৭। পরে তাহারা যখন এই জিনিসকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পাইবে তখন উহার অবিশ্বাসী–অমান্যকারী লোকদের মুখাবয়ব বিকৃত হইয়া যাইবে। আর তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ইহাই সেই জিনিস যাহার জন্যে তোমরা তাকীদ দিয়া বলিতেছিলে।

২৮। এই লোকদিগকে বল, তোমরা কি কখনও এই কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আল্লাহতা'আলা চাই আমাকে ও আমার সংগী–সাথীগণকে ধ্বংস করিয়া দেন কিংবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, কিন্তু কাফেরদিগকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা করিবে[১২]?

২৯। এই লোকদিগকে বল, তিনি বড়ই দয়াবান, তাঁহারই প্রতি আমরা ঈমান আনিয়াছি আর তাঁহারই উপর আমাদের নির্ভরতা। খুব শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে যে, সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আছে কে?

৩০। এই লোকদিগকে বলঃ তোমরা কি কখনও এই কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তোমাদের কূপের পানি যদি যমীনে তলাইয়া যায়, তাহা হইলে এই পানির প্রবাহমান ধারাসমূহ তোমাদিগকে কে বাহির করিয়া আনিয়া দিবে?

১২। মক্কা শরীফে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বীনের দাও'আতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন পরিবার ও বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল তখন হুযুর (সঃ) ও তাঁর সহচরদের প্রতি ঘরে ঘরে অভিশাপ দেয়া হতে লাগলো, জাদুটোনা করা হ'তে লাগলো যাতে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যান; এমন কি হত্যার পরিকল্পনাও চিন্তা করা হ'তে লাগলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এ কথা বলা হয়েছে–এই লোকদেরকে বলঃ আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা খোদার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? তোমরা নিজেদের ভাবনা ভাব— খোদার আযাব থেকে তোমরা কিরূপে বাঁচবে?

সূরা আল-কালাম

নামকরণ

এ সূরাটির নাম দু'টোঃ 'নূন' ও 'আল-কালাম'। এ দু'টো শব্দই সূরার শুরুতে উদ্ধৃত রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিও মক্কাশরীফের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। তবে এতে আলোচিত বিষয়াদি হতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, মক্কাশরীফে ঠিক যে সময় রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা ও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা অনেকটা তীব্র হয়ে উঠেছিল, আলোচ্য সূরাটি ঠিক সে সময় নাযিল হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরাটিতে তিনটি মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। তা হলোঃ বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন বা আপত্তির জবাব, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও সদুপদেশ দান এবং রসূলে করীম (সঃ)কে ধৈর্য, স্থৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার উপদেশ দান। শুরুর কথায় রসূলে করীম (সঃ)কে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, এই কাফেররা তোমাকে 'পাগল' বলে অথচ তুমি যে কিতাব পেশ করছো এবং নৈতিকতার যে উচ্চমানে তুমি অধিষ্ঠিত, তাই এদের এ মিথ্যা কথা-বার্তার প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট। সেদিন খুব দূরে নয় যখন প্রকৃত পাগল কে বা কারা তা সকলেই দেখতে পাবে। অতএব তোমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতার যে প্রচন্ড তুফানের সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার কোন চাপই তুমি কখনই মেনে নেবে না। তুমি কোন না কোনভাবে নমনীয় হ'য়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতা (compromise) করে নাও, কেবল মাত্র এ উদ্দেশ্যেই তোমার বিরুদ্ধে এসব কথা বলা হচ্ছে। এছাড়া তার অন্য কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নামের উল্লেখ না করেই বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। মক্কার লোকেরা সকলেই সেই ব্যক্তিকে চিনতো। তখন নবী করীমের (সঃ) পবিত্র ও স্বচ্ছ চরিত্রও সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধতায় মক্কার যে সরদার সর্বাগ্রবর্তী তার সঙ্গে কোন্ স্বভাব-চরিত্রের লোক শামিল রয়েছে, প্রত্যেক দৃষ্টিবান ব্যক্তি তাও লক্ষ্য করতেছিল।

এর পর ১৭-৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ লোকেরা আল্লাহর নিকট হতে নি'আমত লাভ করেও তাঁর না-শোক্‌রি করেছে। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম তাঁর উপদেশ-নসীহত অগ্রাহ্য করেছে। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা সে নি'আমত হতেই বঞ্চিত হয়ে গেল। অতঃপর তাদের সবকিছু যখন বরবাদ হয়ে গেল এবং তারা সর্বসান্ত হলো, তখনই তাদের চক্ষু উন্মীলিত হলো। এ দৃষ্টান্তটি দিয়ে মক্কাবাসীদিগের সাবধান ও সতর্ক করতে চাওয়া হয়েছে। তাদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, রসূলে করীমের (সঃ) আগমনের ফলে তাদের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন ক'রে দেয়া হয়েছে, যেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল এই বাগানের মালিকরা। তোমরা যদি রসূলে করীমের (সঃ) উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শ মেনে না নাও, তাহলে দুনিয়ায়ও তোমাদের আযাব ভোগ করতে হবে, আর পরকালে যে আযাব ভোগ করতে হবে তা তার থেকেও অধিক কঠিন ও ভয়াবহ।

৩৪-৪৭ নম্বর আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে ক্রমাগতভাবে উপদেশ-নসীহত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কোথাও সরাসরিভাবে তাদেরকে সম্বোধন ক'রে কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও রসূলে করীম (সঃ)কে সম্বোধনপূর্বক তাদেরকে সাবধান করতে চাওয়া হয়েছে। এ প্রসংগে যা কিছু বলা হয়েছে তার সার এই যে, যেসব লোক দুনিয়ায় খোদাকে ভয় ক'রে জীবন-যাপন করেছে পরকালীন কল্যাণ কেবলমাত্র এবং অনিবার্যভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহতা'আলার অনানুগত বান্দাহ্‌রা তাঁর অনুগত ও নাফরমান বান্দাহ্‌দের উপযোগী পরিণতির সম্মুখীন হবে—তা

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। কাফেররা নিজেদের জন্যে যে ব্যবহার ও আচরণ পেতে চায় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ আচার-আচরণ গ্রহণ করবেন, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাফেররা এরূপ ধারণা ক'রে থাকলে তা নিতান্তই ভুল ধারণা। এরূপ ধারণা যে সত্য তার কোন নিশ্চয়তাও তাদের কাছে নেই। যে লোকদের দুনিয়ায় খোদার সম্মুখে অবনত হবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, অথচ তারা এ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করতে চাইলেও তা করতে পারবে না। ফলে পরম লাঞ্ছনাময় পরিণতির সম্মুখীন হওয়া তাদের জন্য অবধারিত। কুরআন মজীদকে অমান্য-অগ্রাহ্য ক'রে—অসত্য মনে ক'রে খোদার আযাব হ'তে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। দুনিয়ায় অবশ্য তাদের যথেষ্ট ঢিল ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। আর এরই দরুন তারা বিরাট ধোঁকায় পড়ে গেছে। তারা মনে করছে, কুরআন ও রসূল (সঃ)কে অমান্য-অগ্রাহ্য করার পরও যখন তাদের ওপর কোনরূপ আযাব আসছে না, তখন তারা নিশ্চয়ই নির্ভুল পথে আছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা অজ্ঞাতসারে কঠিন ধ্বংসের দিকে তীব্র গতিতে চলে যাচ্ছে। আসলে রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা করার কোন যুক্তিসংগত কারণই নেই। কেননা তিনি তো এক নিঃস্বার্থ দ্বীন-প্রচারক মাত্র। তিনি তাদের নিকট হ'তে নিজে কিছুই পেতে চান না। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আসলে আল্লাহর রসূল ন'ন এবং তিনি যা কিছু বলছেন তা ভুল— এ ধরনের কোন দাবী করাও কাফেরদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একবিন্দু জ্ঞানও তাদের নেই।

সর্বশেষে রসূলে করীম (সঃ)কে বিশেষ হেদায়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত দ্বীন প্রচারে যত কঠোরতা ও দুঃখ-কষ্টেরই সম্মুখীন হতে হোক না কেন, তা যেন তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অতিক্রম করে যান। কেননা, ধৈর্যহীনতা বিপদের কারণ। হযরত ইউনুস (আঃ) এই ধৈর্যহীনতার দরুনই কঠিন বিপদে নিপতিত হয়েছিলেন। অতএব এ ধৈর্যহীনতা তাঁকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

সূরা আল–কালাম
(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৫২, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১। নূন, কলমের শপথ, লেখকগণ যাহা লেখে উহার শপথ[১]!

২। তুমি তোমার খোদার অনুগ্রহে পাগল নও[২]।

৩। আর নিশ্চয়ই তোমার জন্য এমন শুভ কর্মফল রহিয়াছে যাহার ধারাবাহিকতা কখনই নিঃশেষ হইবার নয়[৩]।

৪। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত[৪]।

৫। খুব শীঘ্রই তুমিও দেখিতে পাইবে, আর তাহারাও দেখিবে,

৬। তোমাদের মধ্যে আসলে কে পাগলামীতে নিমজ্জিত।

৭। যেসব লোক তাহাদের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে তোমার খোদা তাহাদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন, আর কোন্ সব লোক সঠিক–নির্ভুল পথে অবস্থিত তাহাদিগকেও তিনি খব ভালভাবে জানেন।

১। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ বলেনঃ কলমের অর্থ সেই কলম যার দ্বারা কুরআন লেখা হচ্ছিল। এর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, যে জিনিস লিখা হচ্ছিল তা কুরআন মজীদ।

২। এখানে বাহ্যত সম্বোধন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে করা হলেও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কার কাফেররা যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)কে পাগল ব'লে মিথ্যা অপবাদ দিতো তার প্রতিবাদ করা ও উত্তর দেয়া। মর্ম হচ্ছে, অহী–লেখকদের হাতে যে কুরআন লেখা হচ্ছে সেই কুরআন নিজেই তাদের এই মিথ্যা অপবাদ খন্ডনের জন্যে যথেষ্ট।

৩। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খোদার সৃষ্টির হেদায়াতের জন্যে যে চেষ্টা–সাধনা করে চলেছেন তার উত্তরে তাঁকে যেরূপ যন্ত্রণাদায়ক কথা শুনতে ও সহ্য করতে হচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও তিনি যে নিজ কর্তব্যসম্পন্ন করে চলেছেন সেহেতু তাঁর জন্যে অসীম ও অবিনশ্বর পুরস্কার বর্তমান আছে।

৪। অর্থাৎ কুরআন ছাড়া তাঁর উচ্চমানের নৈতিকতা এবং উন্নত চরিত্রও এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কাফেররা তাঁর উপর পাগল হওয়ার যে অপবাদ দান করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কেননা উন্নত নৈতিকতা–––চারিত্রিক মহত্ব এবং পাগলামি কখনও একত্র সমাবিষ্ট হতে পারে না।

৮। কাজেই তুমি এই অমান্যকারীদের কোনরূপ চাপে পড়িয়া কিছু করিও না।

৯। এই লোকেরাতো চায় যে, তুমি কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে তাহারাও কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে[৫]।

১০। তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য–অনুসরণ করিও না যে খুব বেশী কসম করে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি,

১১। যে লোক গালাগাল করে ও অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করিয়া বেড়ায়,

১২। ভাল কাজের প্রতিবন্ধক, যুল্‌ম ও সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত,

১৩। বড়ই অসৎকর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর এই সবের সংগে সংগে বদ্‌জ্জাতও–

১৪। এই কারণে যে, সে বিপুল ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির অধিকারী[৬]।

১৫। আমাদের আয়াতসমূহ যখন তাহাকে শুনানো হয়, তখন সে বলে যে, ইহাতো আগেরকালের লোকদের গল্পপ–কাহিনী মাত্র।

১৬। খুব শীঘ্রই আমরা উহার শুঁড়ের উপর দাগ লাগাইয়া দিব[৭]।

১৭। আমরা ইহাদিগকে (মক্কাবাসীদিগকে) সেইরূপ পরীক্ষায় ফেলিয়াছি যেমন করিয়া একটি বাগানের মালিকগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া দিয়াছিলাম। তাহারা যখন কসম করিয়া বলিল যে, আমরা খুব সকাল বেলা অবশ্য অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল পাড়িব,

১৮। তাহারা এই কথায় কোনরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা রাখিতেছিল না[৮]।

৫। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারে তুমি যদি কিছু শিথিলতা প্রদর্শন কর, তবে এরাও তোমার বিরোধিতায় কিছু মৃদুতা অবলম্বন করবে। অথবা তুমি যদি তাদের পথভ্রষ্টতার প্রতি কিছুটা কোমলতা প্রদর্শন করে নিজের দ্বীনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হও, তবে এরাও তোমার সংগে একটা সন্ধি–মীমাংসা করে নিতে প্রস্তুত।

৬। এই বাক্যাংশের সম্পর্ক উপরের এক পরম্পরার সংগে হ'তে পারে এবং পরবর্তী বাক্যের সংগেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর মর্ম হবেঃ এরূপ মানুষের দাপট তার ধন–জন ও সন্তান–সন্ততির বহুলত্বের কারণে মেনে নিও না। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে—অনেক সন্তান–সন্ততি ও সম্পদ থাকার কারণে সে অহংকারে স্ফীত হয়ে গিয়েছে, আমার আয়াতসমূহ যখন তাকে শোনানো হয়, সে বলে,–''এ পূর্বকালের অলীক গল্প–কথা।'

৭। যেহেতু সে নিজেকে বড় নাকওয়ালা (খুব উঁচু দরের লোক) মনে করতো সেজন্য তার নাককে "শুঁড়" বলা হয়েছে। আর নাকের উপর দাগ লাগানোর অর্থ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা অর্থাৎ আমি ইহকালে ও পরকালে তাকে এরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যে, এই হীনতা থেকে সে চিরদিনের জন্যে কখনোও নিষ্কৃতি পাবে না।

৮। অর্থাৎ তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও নিজেদের আধিপত্যের উপর এতটা ভরসা ছিল যে, তারা কুণ্ঠাহীনভাবে শপথ করে বলে ছিল যে, "আমরা কাল অবশ্যই নিজেদের বাগানে ফল তুলবো।" "যদি আল্লাহ্ চান তবে আমরা এ কাজ করবো"—এ কথা বলার কোন আবশ্যকতা তারা বোধ করলো না।

১৯। রাত্রি বেলা তাহার নিদ্রামগ্ন হইয়াছিল, এই সময় তোমার খোদার নিকট হইতে একটি বিপদ সেই বাগানের উপর আপতিত হইল,

২০। এবং উহার অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মত হইয়া গেল।

২১। সকাল বেলা তাহারা একজন অপর জনকে ডাকিল

২২। যে, ফল পাড়িতে হইলে খুব সকাল সকালই নিজেদের ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হইয়া চল।

২৩। অতঃপর তাহারা রওয়ানা হইল। তাহারা পরস্পরে চুপে চুপে বলিয়া যাইতেছিল

২৪। যে, আজ যেন কোন ভিখারী বাগানে তোমাদের নিকট আসিতে না পারে।

২৫। তাহারা কাহাকেও কিছু না দেওয়ার ফয়সালা করিয়া খুব ভোরে ভোরে ও তাড়াতাড়ি করিয়া তথায় এমনভাবে উপস্থিত হইল, যেন তাহারা (ফল পাড়ার ব্যাপারে) খুব সক্ষম।

২৬। কিন্তু বাগানটি যখন তাহারা দেখিল, তখন বলিতে লাগিলঃ আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলিয়া গিয়াছি।

২৭। না, বরং আমরা বঞ্চিতই রহিয়া গিয়াছি।

২৮। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খুব উত্তম ছিল সে বলিলঃ আমি কি তোমাদের বলি নাই যে, তোমরা তসবীহ্ কর না কেন১?

১। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো না কেন? এ কথা তারা কেন ভুলেছিল যে, পাক পরওয়ারদিগার উপরে মওজুদ আছেন?

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى

প্রতি তাদের একে তারামুখোমুখি হলো অতএব যালেম আমরাছিলাম নিশ্চিত আমাদেররব পবিত্র তারা বললো

بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

সীমালংঘণকারী ছিলাম আমরা নিশ্চয় আমাদের আফসোস তারা বললো তিরস্কার করতে লাগলো অপরের

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا

আমাদের রবের দিকে আমরা নিশ্চিত তা হতেও উত্তম আমাদের বদলে দেবেন আমাদেররব সম্ভবত

رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ

অনেক বড় আখিরাতের আযাব অবশ্যই এবং আযাব এমনই অভিমুখী হলাম

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ

জান্নাতসমূহ তাদের রবের কাছে রয়েছে পরহেজগারদের জন্যে নিশ্চয় তারা জানত যদি

النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ وقفة

তোমাদের হয়েছে কি অপরাধীদের যেমন আত্মসমর্পন কারীদেরকে বানাব আমরা অতএব কি নিয়ামত ভরা

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

তোমরা বিচার কর কেমন

২৯। তাহারা উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলঃ 'মহান-পবিত্র আমাদের খোদা। আমরা বাস্তবিকই বড় গুনাহ্গার ছিলাম'।

৩০। পরে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

৩১। শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিলঃ আমাদের অবস্থার জন্য বড়ই আফ্সোস! আমরা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী হইয়া গিয়াছিলাম।

৩২। অসম্ভব নয় যে, আমাদের খোদা আমাদিগকে ইহা হইতেও উত্তম বাগান দান করিবেন। আমরা আমাদের খোদার দিকে ফিরিয়া যাইতেছি।'

৩৩। এমনিই হইয়া থাকে আযাব! আর পরকালের আযাব তো ইহাপেক্ষাও অনেক বড়। কতই না ভাল হইত, যদি এই লোকেরা জানিত!

৩৪। খোদাভীরু লোকদের জন্য তাহাদের খোদার নিকট নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই১০।

৩৫। আমরা কি অনুগত লোকদের অবস্থা অপরাধী লোকদের মত করিব?

৩৬। তোমাদের কি হইয়াছে, কি রকমের কথা-বার্তা তোমরা বলিতেছ?

১০। মক্কার বড় বড় সরদাররা মুসলমানদেরকে বলতো—'দুনিয়াতে আমরা এই যে সব নি'আমত পাচ্ছি, আমরা যে আল্লাহর প্রিয় এগুলো তারই নিদর্শন এবং তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা এই কথারই প্রমাণ যে, তোমরা অপ্রিয় ও ক্রোধ-ভাজন। সুতরাং তোমাদের কথামত যদি কোন পরকালের অস্তিত্ব থাকেই বা, তবে আমরা সেখানেও মজা লুটবো আর তোমরাই পাবে শাস্তি, আমরা নয়।' এই আয়াতে তাদের এ কথার উত্তর দেয়া হয়েছে।

أَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝٣٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا

যা তার মধ্যে তোমাদের জন্য নিশ্চয় তোমরা পড় তার মধ্যে কিতাব(আছে) তোমাদের জন্যে অথবা

تَخَيَّرُونَ ۝٣٨ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بٰلِغَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ আমাদের উপর প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্যে রয়েছে অথবা তোমরা পছন্দ কর

إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝٣٩ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ ۝٤٠ أَمْ

অথবা যিম্মাদার এই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কে তাদের জিজ্ঞেস কর তোমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছ যা তোমাদের জন্যে আছে নিশ্চয়

لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ ۝٤١ يَوْمَ

সেদিন সত্যবাদী হয় তারা যদি তাদের শরীকদের তারা উপস্থিত করুক অতএব অংশীদার তাদের জন্যে আছে

يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝٤٢

তারা পারবে না তখন সিজদাসমূহের দিকে তাদের ডাকা হবে এবং পিন্ডলী থেকে উন্মোচিত হবে

خٰشِعَةً أَبْصٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى

দিকে তাদের ডাকা হতো নিশ্চয় এবং অপমান তাদের আচ্ছাদিত করবে তাদের দৃষ্টিগুলো অবনত হবে

السُّجُودِ وَهُمْ سٰلِمُونَ ۝٤٣

নিরাপদ ছিল তারা অথচ সিজদাসমূহের

৩৭। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব[১১] আছে, যাহাতে তোমরা পড় যে,

৩৮। তোমাদের জন্য অবশ্যই সেখানে সেই সব কিছুই রহিয়াছে যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর?

৩৯। অথবা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এমন কিছু ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি আমাদের উপর অবশ্য পালনীয় হইয়া আছে যে, তোমরা যাহা বলিতেছ তোমাদিগকে সেই সব কিছুই দেওয়া হইবে?

৪০। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের মধ্যে কে ইহার জন্য দায়িত্বশীল?

৪১। কিংবা ইহাদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে (যাহারা ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে)? তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সেই শরীকদিগকে লইয়া আসুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে।

৪২। যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হইবে এবং লোকদিগকে সিজ্‌দা করিবার জন্য ডাকা হইবে, তখন ইহারা সিজ্‌দা করিতে পারিবে না।

৪৩। তাহাদের দৃষ্টি নীচু হইবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাহাদের উপর চাপিয়া বসিবে। ইহারা যখন সুস্থ নিরাপদ ছিল, তখন তাহাদিগকে সিজ্‌দার জন্য ডাকা হইতেছিল (কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিতেছিল)।

১১। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার পাঠানো কিতাব।

৪৪। অতএব হে নবী! এই কালাম অমান্যকারীদের সমস্ত ব্যাপারটি আমার উপর ছাড়িয়া দাও। আমরা তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমাগত পন্থায় ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইব যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না।

৪৫। আমি ইহাদের রশি লম্বা করিয়া দিতেছি! আমার কৌশল অত্যন্ত দৃঢ় ও অমোঘ।

৪৬। তুমি কি ইহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকের দাবী করিতেছ যে, ইহারা এই ঋণের বোঝার তলে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে?

৪৭। ইহাদের নিকট কি গায়বের কোন জ্ঞান আছে, যাহা তাহারা লিখিয়া লইতেছে?

৪৮। অতএব তোমরা খোদার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক এবং মাছওয়ালা (ইউনুস আঃ)-এর মত হইও না[১২]। স্মরণ কর, সে যখন ডাক দিয়াছিল চিন্তায়-দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায়।

৪৯। তাহার খোদার অনুগ্রহ তাহার প্রতি বর্ষিত না হইলে সে পরিত্যক্ত-প্রত্যাহৃত অবস্থায় ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত।

৫০। শেষ পর্যন্ত তাহার খোদা তাহাকে সাদরে মনোনীত করিয়া লইলেন এবং তাহাকে নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করিয়া লইলেন।

১২। অর্থাৎ ইউনুস (আঃ)-এর মত কাজে অধৈর্য হয়ো না, নিজের অধৈর্যের কারণে তাকে মাছের পেটের মধ্যে যেতে হয়েছিল।

وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ

এবং | যেন | মনে হয় | যারা | অস্বীকার করেছে | তোমাকে পদস্খলন অবশ্যই করাবে | তাদের দৃষ্টিগুলো দিয়ে

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝٥١ وَ مَا

যখন | তারা শুনে | উপদেশ (কুরআন) | এবং | তারা বলে | সে নিশ্চয় | পাগল অবশ্যই | এবং | নয়

هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٥٢

তা | ছাড়া | উপদেশ | জন্যে | সারা বিশ্বের

৫১। এই কাফের লোকেরা যখন উপদেশের কালাম (কুরআন) শ্রবণ করে, তখন তাহারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেন মনে হয়, তাহারা তোমার মূলোৎপাটন করিয়া ছাড়িবে। আর বলে যে, লোকটি নিশ্চয়ই পাগল!

৫২। অথচ ইহাতো সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি মহান উপদেশ মাত্র।

সূরা আল্‌–হাক্কাহ্‌

নামকরণ

এ সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এও মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি সূরা। এতে আলোচিত বিষয়াদি হতে জানা যায় যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন যখন রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা মক্কায় শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু তখন পর্যন্ত তা খুব বেশী তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বলেনঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদা রসূলে করীম (সঃ)কে জ্বালা–যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর হতে বের হলাম। কিন্তু আমার পৌঁছবার পূর্বেই তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছিলেন। আমি পৌঁছে দেখলাম, তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা আল্‌–হাক্কাহ্‌ পাঠ করছেন। আমি তখন তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে গেলাম ও শুনতে লাগলাম; কুরআনের কালামের মহিমা বুঝতে পেরে আমি বিস্মিত–স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সহসাই আমার মনে জেগে উঠলোঃ লোকটি সম্ভবত কবি! কুরাইশরা তো তাই বলে! সংগে সংগে শুনতে পেলাম, রসূলে করীমের (সঃ) কণ্ঠে উচ্চারিত বাণীঃ 'এ এক মহাসম্মানিত কথা, কোন ব্যক্তির বাক্য নয়'। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'কবি না হবেন তো গণকদার অবশ্যই হবেন'। আর তখনই তাঁর মুখে উচ্চারিত হলোঃ 'এ কোন গণকদারের কথাও নয়। তোমরা চিন্তা–বিবেচনা খুব কমই করে থাক। এ তো রব্বুল 'আলামীনের নিকট হতে অবতীর্ণ'। এ কথা শুনার ফলে ইসলাম আমার মনে–মগজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত ওমরের (রাঃ) এ কথা হতে জানতে পারা যায়, এ সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহনের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কেননা এ ঘটনার পরও বহুদিন পর্যন্ত তিনি ঈমান গ্রহণ করেননি। এ দিনগুলোতে সংঘটিত নানা ঘটনা তাঁকে ক্রমশ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বোনের ঘরে তাঁর মন–মগজ–হৃদয়ের উপর প্রচন্ড আঘাত পড়ে। এ আঘাতই তাঁকে ঈমানের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে সূরা মরিয়াম–এর ভূমিকা ও সূরা আল–ওয়াকে'আ–এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহে পরকাল সম্পর্কিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে আলোচিত হয়েছে কুরআনের খোদার নিকট হতে অবতীর্ন হওয়া ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সত্য নবী হওয়ার কথা।

প্রথম রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছেঃ কিয়ামত ও পরকাল সংঘটিত হওয়া এটা অনস্বীকার্য সত্য। এটা অমোঘ, অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য: এটা সংঘটিত হবেই। পরে ৪–১২ আয়াতে বলা হয়েছে, অতীতে যেসব জাতি পরকালকে অস্বীকার করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত খোদার আযাব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। আযাব হতে তারা নিষ্কৃতি পায়নি। এরপর ১৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের বাস্তব চিত্র অংকিত হয়েছে এবং কিভাবে সংঘটিত হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। ১৮–৩৭ পর্যন্তকার আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে সেই আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা যার জন্যে আল্লাহতা'আলা দুনিয়ার বর্তমান জীবনের পর মানব জাতির জন্য আর একটা জীবন সুনির্দিষ্ট ও অনিবার্য করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে। আল্লাহর নিকট নিজ নিজ কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে-এ বিশ্বাস মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে পোষণ করে যারা এই দুনিয়ায় জীবন–যাপন করেছে, আর যারা দুনিয়ার জীবনে নেক আমল করে পরকালীন কল্যাণের অগ্রিম ব্যবস্থা করে নিয়েছে, তারা নিজ নিজ হিসাব পরিষ্কার দেখতে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তারা জান্নাতের চিরন্তন ও শাশ্বত সুখ ও শান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক খোদার হক্ক আদায় করেনি,

বান্দাহদের হক্কও আদায় করেনি, তাদেরকে খোদার পাকড়াও হতে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ কোথাও নেই। শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এ কুরআনকে তোমরা কবি বা গণকের কালাম বলে মনে কর; অথচ এ আল্লাহর নাযিল করা কিতাব। এ এক মহান রসূলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। রসূল নিজে এ কালামে নিজের পক্ষ হতে একটা শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারেন না। তা করার কোন অধিকারই তাঁর নেই। তিনি যদি এতে নিজের মনগড়া কোন জিনিস শামিল করে দেন, তাহলে আমরা তাঁর গলার শিরা (বা দিলের শিরা) কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিব। এ এক দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ মহাসত্যবাণী। একে যারা অবিশ্বাস-অমান্য করবে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এ জন্যে চরমভাবে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

সুরা আল–হাক্কাহ্

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৫২, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে–

১। অনিবার্য সংঘটিতব্য[১]

২। কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য?

৩। আর তুমি কি জান, সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য কী?

৪। সামূদ ও আদ সে আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহা বিপদকে[২] অবিশ্বাস করিয়াছে।

৫। ফলে সামূদ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৬। আর 'আদকে ধ্বংস করা হইয়াছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবাত্যার আঘাতে।

১। মূলে 'আল–হাক্কা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে, এমন ঘটনা যা অবশ্য অবশ্য সংঘটিত হবেই। অর্থাৎ তোমরা যত পারো অস্বীকার কর কিন্তু এ ঘটনাতো এতই নিশ্চিত যেন তা ঘটেই আছে বলা যেতে পারে।

২। কিয়ামতকে অবশ্যই সংঘটিতব্য বলার পর এর ভয়াবহ বিভীষিকাকে বুঝানোর জন্যে এই দ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৭। আল্লাহতা'আলা উহাকে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাহাদের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। (তুমি তথায় থাকিলে) দেখিতে পাইতে যে, তাহারা সেখানে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়িয়া থাকে।

৮। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কেহ রক্ষা পাইয়া অবশিষ্ট আছে বলিয়া তোমরা কি দেখিতে পাও?

৯। ফিরাউন, তাহার পূর্বগামী লোকেরা এবং উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকা জন-বসতিসমূহ[৩] এই বিরাট মারাত্মক ভুল ও অপরাধই করিয়াছিল।

১০। এই লোকেরা নিজেদের খোদার প্রেরিত রসূলের কথা মানে নাই। ফলে তিনি তাহাদিগকে কঠোর-কঠিনভাবে পাকড়াও করিলেন।

১১। পানির উচ্ছসিত স্রোত যখন সীমালংঘন করিয়া গেল[৪] তখন আমরা তোমাদিগকে নৌকায় আরোহী বানাইয়া দিয়াছিলাম।[৫]

১২। যেন এই ঘটনাটিকে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানাইয়া দিই এবং স্মরণবাহক কান উহার স্মৃতিকে সংরক্ষিত করিয়া রাখে।

৩। অর্থাৎ লূত (আঃ)-এর কওমের বসতি যাকে উপুড় করে দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

৪। এখানে নূহ (আঃ)-এর সময়কার তূফানের কথা ইংগিত করা হয়েছে।

৫। নূহের (আঃ) জাহাজের আরোহী যারা ছিলেন তাঁরা আজ হতে কয়েক হাজার বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে গত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী সমগ্র মানব বংশই তাঁদের বংশধর ও অধঃস্তন পুরুষ যারা সে সময়ে তূফান থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, এ জন্যে বলা হয়েছে-"আমরা তোমাদিগকে নৌকায় আরোহী বানাইয়া দিয়াছিলাম।"

১৩। পরে একবার যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইবে,

১৪। এবং ভূতল ও পর্বতরাশিকে উপরে তুলিয়া একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে

১৫। সেই দিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হইবে।

১৬। সেই দিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হইবে এবং উহার বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িবে।

১৭। ফেরেশতাগণ তাহার আশে পাশে উপস্থিত থাকিবে। আর আটজন ফেরেশতা সেই দিন তোমার খোদার আরশ নিজেদের উপরে বহন করিতে থাকিবে।৬

১৮। এই দিনটিতেই তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে; তোমাদের কোন তত্ত্বই লুকাইয়া থাকিবে না।

১৯। সেই সময় যাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবেঃ 'দেখ দেখ, পড় আমার আমলনামা।

৬। এ আয়াতটি 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্গত। এর অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন, কেননা প্রকৃতপক্ষে আরশ কি বস্তু তা আমরা জানতে পারি না এবং কিয়ামতের দিন ৮ জন ফেরেশতার তা বহন করার বাস্তব রূপটি কি তাও আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক, এ কথা ধারণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহতা'আলা আরশের উপর অধিষ্ঠিত থাকবেন ও ৮ জন ফেরেশতা আরশসহ তাঁকে তুলে বহন করবেন। আয়াতে এ কথা বলাও হয়নি যে, আল্লাহতা'আলা সে সময় আরশের উপর আসীন থাকবেন। কুরআন মজীদে স্রষ্টার সত্তার যে ধারণা আমাদের দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে না যে তিনি-দেহ, দিক ও স্থান থেকে নির্মুক্ত সত্তা-কোন স্থানে আসীন হবেন এবং কোন সৃষ্ট তাঁকে তুলে বহন করবে। সুতরাং তন্ন তন্ন করে এর অর্থ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা নিজেকে নিজে পথভ্রষ্টতার বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করারই শামিল।

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ

জীবনের মধ্যে হবে সে অতঃপর আমার হিসাবের সাক্ষাতকারী আমি যে মনে করেছিলাম আমি নিশ্চিয়ই

رَّاضِيَةٍ ۝٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝٢٣ كُلُوا وَاشْرَبُوا

তোমরা পান কর ও তোমরা খাও নিকটে তার ফলরাশি (থাকবে) সুউচ্চ জান্নাতের মধ্যে সন্তোষজনক

هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝٢٤ وَأَمَّا مَنْ

যাকে আর বিগত দিনগুলোর মধ্যে তোমরা অতিবাহিত করেছ যা বদলে মজা করে

أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ۝٢٥

আমার আমল নামা দেয়া হতো না (যদি) আমার আফসোস সে বলবে অতঃপর তার বাম হাতে তার আমল নামা দেয়া হবে

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝٢٧

চূড়ান্ত (মৃত্যু) হতো যদি তা হায় আমার হিসাব কি জানতাম না এবং

২০। আমি মনে করিতেছিলাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাইবে[৭]।

২১। ফলে তাহারা বাঞ্ছিত সুখ সম্ভোগে লিপ্ত থাকিবে,

২২। উচ্চতম স্থানের জান্নাতে,

২৩। যাহার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলিয়া থাকিবে।

২৪। (এই লোকদিগকে বলা হইবে) স্বাদ লইয়া খাও, পান কর-তোমাদের সেই সব আমলের বিনিময়ে যাহা তোমরা অতীত দিনসমূহে করিয়াছ।

২৫। আর যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবেঃ 'হায়, আমার আমলনামা আমাকে যদি না-ই দেওয়া হইত।

২৬। আর আমার হিসাব কি তাহা যদি আমি না-ই জানিতাম![৮]

২৭। হায়, আমার (দুনিয়ায় হওয়া) মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হইত!

৭। অর্থাৎ নিজের সৌভাগ্যের কারণ স্বরূপ সে এ কথা বলবে যে, দুনিয়াতে সে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন ছিল না, বরং সে এটা বুঝে জীবন-যাপন করতো যে, এক দিন তাকে খোদার সামনে হাযির হয়ে নিজের হিসাব দান করতে হবে।

৮। এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মর্ম এও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশ দেয়া কি, তা আমি আগে কখনও জানতাম না। একদিন যে আমাকে নিজের হিসাব দিতে হবে এবং আমার সমস্ত কৃতকর্ম আমার সামনে উপস্থাপিত করা হবে এ কথা কখনও আমার কল্পনায়ও আসেনি।

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۚ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۚ﴿٢٩﴾ خُذُوْهُ

না কাজে আসল আমার জন্যে আমার ধনমাল বরবাদ হয়েছে আমার থেকে আমার ক্ষমতা (বলা হবে) তাকে ধর

فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

তাকে বেড়ি পরাও অতঃপর এরপর দোজখে তাকে নিক্ষেপ করব অতঃপর মধ্যে শিকল তার দীর্ঘতা

سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۭ﴿٣٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

সত্তর হাত তাকে বেঁধে ফেল অতঃপর সে নিশ্চয় না বিশ্বাস করতো আল্লাহর উপর

الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۭ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ

মহান এবং না উৎসাহ দিত উপর খাওয়ানোর মিসকীনকে নাই অতএব

لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾

তার জন্যে আজ এখানে কোন বন্ধু এবং না খাবার ব্যতীত ক্ষতনিঃসৃত রস

لَّا يَأْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخٰطِـُٔوْنَ ۧ﴿٣٧﴾

না (আর কেউ) তা খায় ছাড়া অপরাধীরা

২৮। আজ আমার ধন-মাল আমার কোন কাজে আসিল না।

২৯। আমার সব ক্ষমতা, আধিপত্য-প্রভুত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে[৯]।

৩০। (তখন নির্দেশ দেওয়া হইবে) ধর লোকটিকে, উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দাও,

৩১। অতঃপর উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

৩২। আর ইহার পর উহাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বাঁধিয়া দাও।

৩৩। সে লোকটি না মহান আল্লাহতা'আলার প্রতি ঈমান আনিয়াছে,

৩৪। আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়াইবার উৎসাহ দান করিত।[১০]

৩৫। এই কারণে আজ এখানে তাহার সহানুভূতিশীল সহমর্মী বন্ধু কেহ নাই;

৩৬। আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া তাহার কোন খাদ্য।

৩৭। নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া যাহা আর কেহই খায় না।

৯। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে ক্ষমতা বলে আমি দর্পভরে চলতাম, তা এখানে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে কেউ আমার সৈন্য নয়, কেউ আমার আদেশ মান্যকারী নেই; এখানে আমি একজন ক্ষমতাহীন উপায়হীন দাসরূপে খাড়া আছি,-নিজেকে রক্ষা করতে যার কোন কিছুই করার সামর্থ নেই।

১০। অর্থাৎ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে নিজে আহার দান করা তো দূরের কথা, কাউকে এ কথা বলাও পছন্দ করতো না যে, 'খোদার ক্ষুধার্ত বান্দাদের কিছু অন্ন দাও।'

৩৮। অতএব নয়[১১], আমি কসম করিতেছি সেই জিনিসগুলির যাহা তোমরা দেখিতে পাও,

৩৯। এবং সেই সব জিনিসেরও যাহা তোমরা দেখিতে পাও না।

৪০। ইহা এক মহা সম্মানিত রসূলের বাণী,

৪১। কোন কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান গ্রহণ কর।

৪২। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচনা কর।

৪৩। ইহা রব্বুল 'আলামীনের নিকট হইতে নাযিল হইয়াছে।

৪৪। এই (নবী) যদি নিজে রচনা করিয়া কোন কথা আমার নামে চালাইয়া দিয়া থাকিত,

৪৫। তাহা হইলে আমরা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম,

৪৬। এবং তাহার কণ্ঠ-শিরা ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম।

১১। অর্থাৎ তোমরা যা বুঝেছ, কথা তা নয়।

৪৭। তখন তোমাদের কেহই (আমাকে) এই কাজ হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইত না[১২]।

৪৮। মূলত ইহা নীতিবাদী–সদাচারী লোকদের জন্য একটি উপদেশনামা।

৪৯। আর আমরা জানি, তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক অবশ্যই অমান্যকারী হইবে।

৫০। এই ধরনের কাফেরদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখ ও হতাশার কারণ।

৫১। আর ইহা সম্পূর্ণত দৃঢ় প্রত্যয়মূলক মহাসত্য।

৫২। অতএব হে নবী; তোমার মহামহিম খোদার নামের তসবীহ্ কর।

১২। এখানে কালামের তাৎপর্য হচ্ছে–অহীর মধ্যে কম–বেশী করার অধিকার নবীর নেই। সে যদি এরূপ কিছু করে তবে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দান করবো। কিন্তু এখানে কথার বর্ণনা–ভংগী দ্বারা চোখের সামনে এ চিত্র এঁকে দেয়া হয়েছে যে, সম্রাট নিযুক্ত কোন কর্মচারী যদি সম্রাটের নামে কোনও কারসাজি করে তবে সম্রাট তার হাত পাকড়ে শিরশ্ছেদ করে। কিছু লোক এই আয়াত দ্বারা এ ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করে যে, কোন ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবী করলে যদি অতি সত্বর তার হৃদয়–শিরা ও কন্ঠ–শিরা আল্লাহতা'আলা কেটে না ফেলেন তবে এইটাই তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতে সত্য নবী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। মিথ্যা দাবীদার শুধুমাত্র নবুয়্যতেরই নয় খোদায়ীর দাবীও করে থাকে, তবুও পৃথিবীর বুকে তারা দাপটের সংগেই চলা ফেরা করে। সুতরাং এ ব্যাপারটা তাদের দাবীর সত্যতার কোনও প্রমাণ নয়।

সূরা আল্‌-মা'আরিজ

নামকরণ

সূরার তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত ذى المعارج হতে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ববর্তী সূরা আল্‌-হাক্কাহ্‌ যে অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল এ সূরাটিও প্রায় অনুরূপ অবস্থায়ই নাযিল হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

কাফেররা কিয়ামত, পরকাল এবং জান্নাত ও দোযখ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে বিদ্রুপ করতো এবং রসূলে করীম (সঃ)কে এই বলে চ্যালেঞ্জ করতো যে, তুমি সত্যবাদী হলে এবং তোমাকে অবিশ্বাস-অমান্য করে আমরা জাহান্নামের আযাব পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকলে সেই কিয়ামতটাই নিয়ে এস, যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ। এ সূরাটিতে এসব কাফেরদেরকে সাবধান-সতর্ক ও নসীহত করা হয়েছে। এই গোটা সূরাটি কাফেরদের সেই চ্যালেঞ্জের জওয়াবস্বরূপই নাযিল হয়েছে।

সূরার শুরুতে বলা হয়েছেঃ سال سائل بعذاب واقع —'প্রার্থনাকারী আযাব চাহিয়াছে, যাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।' অর্থাৎ আযাবের সম্ভাব্যতা অস্বীকারকারীদের ওপর অবশ্যই আপতিত হবে। আর যখন তা আপতিত হবে তখন তার প্রতিরোধ কেউই করতে পারবে না। তবে তা নির্দিষ্ট সময়েই সংঘটিত হবে। আল্লাহর কাজে দেরী হতে পারে- হয়, কিন্তু অবিচার হয় না কখনই। অতএব এ লোকেরা যে তা নিয়ে ঠাট্টা-মশ্‌করা করছে, সে জন্যে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। এ লোকেরা তো মনে করে, তা অনেক দূরে রয়েছে; কিন্তু আমরা তো দেখছি, তা অতি নিকটে অবস্থিত।

এর পর বলা হয়েছে, যে কিয়ামতকে অবিলম্বে সংঘটিত করবার জন্যে এ লোকেরা নিতান্ত হাসি-তামাশা স্বরূপ দাবী জানাচ্ছে তা যখন বাস্তবিকই সংঘটিত হবে তখন এই পাপী-অপরাধী লোকদের কি চরম দুর্দশা ও মর্মান্তিক পরিণতি হবে তাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। তখন তো এরা সেই মর্মান্তিক পরিণতি হতে নিজেদেরকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের পর্যন্ত 'বিনিময়' স্বরূপ দিয়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারবে না।

এর পর লোকদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, সেদিন মানুষের ভাগ্যের ফয়সালা করা হবে সেই লোকদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কাজ-কর্মের ভিত্তিতে। যেসব লোক এই দুনিয়ায় প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করতে অনীহা দেখিয়েছে, আর ধন-মাল গুটিয়ে একত্র করে রেখেছে ও সাপের ডিমে 'তা' দেয়ার মত তার সংরক্ষণ করেছে, তারা জাহান্নামী হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যারা এখানে খোদার আযাবের ভয় রেখেছে, পরকালকে বিশ্বাস করেছে, নামায রীতিমত আদায় করেছে, স্বীয় ধন-মাল হতে অভাবী লোকদের অংশ ও হক্‌ দিয়েছে, সর্বপ্রকার পাপ-পঙ্কিল কাজ হতে নিজের চরিত্রকে পবিত্র রেখেছে, আমানতের খেয়ানত করেনি, বিশ্বাস ভংগ করেনি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি যাথাযথভাবে রক্ষা করেছে, সাক্ষ্যদানে পরম সত্য ও সততার ওপর অবিচল হয়ে রয়েছে, তারা জান্নাতে সম্মানজনক স্থান লাভ করবে।

যেসব কাফের রসূলে করীম (সঃ)কে দেখে তাঁকে হাসি-মশ্‌করা করবার ও উপহাস বা বিদ্রূপ করবার জন্য চারদিক হতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, সূরার শেষ ভাগে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমরা যদি দ্বীন

ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়্যত–রেসালাত) মেনে নিতে প্রস্তুত নাই হও তাহলে আল্লাহতা' আলা তোমাদের স্থানে অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন। আর স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ)কে বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, এ লোকদের ঠাট্টা–বিদ্রূপকে আপনি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেবেন না, তার পরোয়া করবেন না। এ লোকেরা কিয়ামতের দিনে সংঘটিতব্য অপমান–লাঞ্ছ না ভোগ করবার জন্যে যদি আসামীই হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। এদেরকে তাদের পছন্দমত অর্থহীন কাজ–কর্মে মশগুল হয়ে থাকতে দিন; এর ফলে তাদের যে দুঃখময় পরিণতি অনিবার্য, তা তারা দেখতে পাবে।
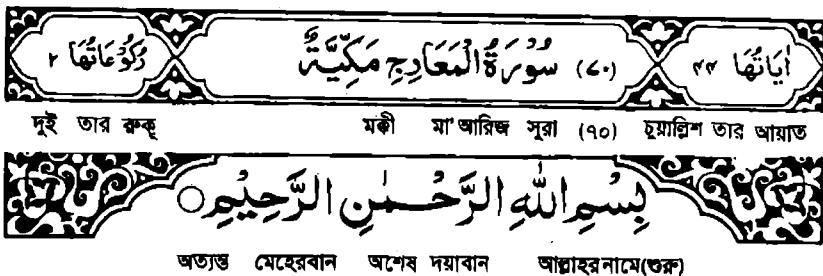
দুই তার রুকূ মক্কী মা'আরিজ সূরা (৭০) চুয়াল্লিশ তার আয়াত

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু)

চাইল প্রার্থনাকারী আযাব অবধারিত কাফিরদের জন্যে নেই তার

دَافِعٌ ۙ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ﴿٣﴾

কোন প্রতিরোধকারী থেকে আল্লাহ মালিক সোপান সমূহের

সূরা আল–মা'আরিজ

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৪৪, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে–

১। প্রার্থনাকারী আযাব পাইতে চাহিয়াছে (সেই আযাব) যাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

২। কাফেরদের জন্য, কেহ উহার প্রতিরোধকারী নাই।

৩। সেই খোদার নিকট হইতে যিনি উর্ধগমনের সিঁড়িগুলির মালিক।

৪। ফেরেশতা ও 'রূহ'[১] তাঁহার সমীপে আরোহণ করিয়া[২] পৌছায় এমন একটা দিনে যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর[৩]।

৫। অতএব হে নবী ! ধৈর্য ধারণ কর, সুন্দর সৌজন্যমূলক ধৈর্য[৪]।

৬। এই লোকেরা উহাকে দূরবর্তী মনে করে,

৭। আর আমরা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইতেছি।

৮। (সেই আযাব হইবে সেই দিন) যে দিন আকাশমন্ডল বিগলিত রৌপ্যের মত হইয়া যাইবে[৫]।

৯। আর পর্বতগুলি রঙ-বেরঙের ধুনা পশমের মত হইয়া যাইবে।

১০। আর কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা করিবে না।

১। 'রূহ' অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ)। তাঁর মহানত্বের কারণে ফেরেশতাগণ থেকে পৃথকভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

২। এ বিষয়টি মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত যার অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা না ফেরেশতাদের সঠিক স্বরূপ জানি; আর না তাদের আরোহণ করার প্রকৃত রূপটি কি তা বুঝতে পারি, আর না এ কথা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালের মধ্যে যে, সে সোপান বা কিরূপ যার উপর ফেরেশতারা আরোহণ করে এবং আল্লাহতা'আলা সম্পর্কে এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, তিনি কোন স্থানে অবস্থান করেন, কেননা তাঁর সত্তা —স্থান ও কালের বন্ধন থেকে নির্মুক্ত ও পবিত্র।

৩। সূরা হজ্জের ৪৭ নং আয়াতে ও সূরা সিজদার ৫নং আয়াতে হাজার বৎসরে ১ দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে আযাবের দাবীর উত্তরে আল্লাহতা'আলার ১ দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বৎসর বলা হয়েছে। এর দ্বারা এই মর্ম বোঝানো হচ্ছে যে, মানুষ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং নিজের চিন্তা ও মননের সীমার সংকীর্ণতার কারণে খোদার ব্যাপারসমূহকে নিজ সময়ের মানদণ্ডে পরিমাপ করে এবং ৫০-১০০ বছর কাল তাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়। কিন্তু আল্লাহতা'আলার এক একটি পরিকল্পনা হাজার হাজার বছর ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার বছর কালব্যাপী হয়ে থাকে এবং কালের এই ব্যপ্তির কথাও নিছক দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৪। এরূপ ধৈর্য যা একজন উদার হৃদয় উচ্চমনা ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়।

৫। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণ পাল্টাবে।

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ

আযাব থেকে মুক্তিপণ দিতে পারতো যদি অপরাধী চাইবে তাদেরকে দেখানো হবে

يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي

যা তার গোষ্ঠিকে এবং তার ভাইকে ও তার স্ত্রী কে এবং তার সন্তানসন্ততি দিয়ে সেদিন

تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ (١٤) كَلَّا ۖ

কক্ষণ না তাকে মুক্তি দিত তারপর সবকিছুই যমীনের মধ্যে যা এবং তাকে আশ্রয় দেয়

إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٧) وَ

এবং মুখ ফিরায় ও পিঠ প্রদর্শন করে যে আহ্বান করে চামড়াকে লেহনকারী অগ্নিশিখা তা নিশ্চয়

جَمَعَ فَأَوْعَىٰ (١٨) إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

মন্দ স্পর্শ করে যখন বেসবর রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে নিশ্চয় সংরক্ষিত রেখেছে অতঃপর জমা করেছে

جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢)

নামাযীরা ছাড়া কৃপণ হয় কল্যাণ স্পর্শ করে যখন এবং হাহুতাশ করে

১১। অথচ তাহারা পরস্পর প্রদর্শিত হইবে। অপরাধী লোক চাহিবে, সেই দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজের সন্তান,

১২। স্ত্রী, ভাই,

১৩। তাহাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবারকে,

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোককে বিনিময়ে দিয়া দিতে, যেন এই উপায়টি তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

১৫। নয়, কক্ষণই নয়। উহাতো হইবে তীব্র, উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা।

১৬। উহা চর্ম-মাংস লেহন করিয়া লইবে,

১৭। উচ্চস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের দিকে আহ্বান করিবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে,

১৮। এবং ধন-মাল সঞ্চয় করিয়াছে ও সেঁক দিয়া রাখিয়াছে।

১৯। মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা (ছোট আত্মার) সৃষ্ট হইয়াছে[৬]।

২০। তাহার উপর যখন বিপদ আসে, তখন ঘাবড়াইয়া উঠে

২১। এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-স্বচ্ছলতা হাতে আসে তখন সে কার্পণ্য করিতে শুরু করে।

২২। কিন্তু সেই সব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা হইতে মুক্ত) যাহারা নামাযী;

৬। যে কথাকে আমরা নিজেদের ভাষায় এরূপ বলে থাকি, -"এ কথা মানুষের স্বভাবগত" বা "এটা মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা"। এই জিনিসকেই আল্লাহতা'আলা এরূপভাবে বর্ণনা করছেন যে- "মানুষকে এরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে।"

২৩। যাহারা নিজেদের নামায রীতিমত আদায় করে;

২৪-২৫। যাহাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রহিয়াছে;

২৬। যাহারা বিচার দিনকে সত্য মানে;

২৭। যাহারা তাহাদের খোদার আযাবকে ভয় করে-

২৮। কেননা তাহাদের খোদার আযাব এমন নয়, যাহার ভয় না করা কাহারও পক্ষে সম্ভব;

২৯। যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে-

৩০। -নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন মেয়েলোক ছাড়া যাহাদের হইতে সংরক্ষিত না রাখায় তাহাদের প্রতি কোন তিরস্কার ভর্ৎসনা নাই।

৩১। তবে ইহা ছাড়াও যাহারা আরও চাহিবে তাহারাই সীমালংঘনকারী লোক।

৩২। যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে,

৩৩। যাহারা সাক্ষ্যদান ব্যাপারে পরম সততার উপর অবিচল হইয়া থাকে,

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ

জান্নাতসমূহের মধ্যে হবে ঐসব লোক সংরক্ষণ করে তাদের নামাযের তারাই যারা এবং

مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ

থেকে দৌড়ে আসছে তোমার সামনে কুফরী করেছে যারা (তাদের) কি হয়েছে অতএব সন্মানিত

الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ

যে তাদের মধ্যে ব্যক্তি প্রত্যেক লোভকরে কি দলে দলে বাম দিক থেকে ও ডান দিক

يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ

না অতএব তারা জানে যা (তা) থেকে তাদের আমরা সৃষ্টি করছি আমরা নিশ্চয় কখনওনয় নিয়ামতের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে

اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

সক্ষম অবশ্যই আমরা নিশ্চয় অস্তাচল সমূহের ও উদয়াচল সমূহের রবের কসম আমি করছি

৩৪। আর যাহারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে–

৩৫। এই লোকেরা সম্মান সহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করিবে।

রুকূ' ঃ ২

৩৬–৩৭। অতএব হে নবী ! কি ব্যাপার হইয়াছে, এই কাফের লোকেরা ডান দিক ও বাম দিক হইতে দলে দলে তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে কেন[৭]?

৩৮। তাহাদের প্রত্যেকেই কি এই লোভ পোষণ করে যে, তাহাকে নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিয়া দেওয়া হইবে?

৩৯। কক্ষণই নয়। আমরা যে জিনিস দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা তাহারা নিজেরাই জানে।

৪০। অতএব নয়, আমি শপথ করিতেছি, উদয়–স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহের মালিক[৮] খোদার! আমরা তাহাদের হইতে উত্তম লোক লইয়া আসিতে পারি।

৭। এখানে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা নবীর (সঃ) দাওয়াত, তবলীগ ও কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে ঠাট্টা–তামাশা ও বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়ার জন্যে চারদিক থেকে দৌড়ে আসতো।

৮। 'উদয়স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহ' শব্দ (বহুবচনে) ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, বৎসরের মধ্যে সূর্য প্রতিদিন এক নতুন কোণে উদয় হয় ও এক নতুন কোণে অস্ত যায়। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্য পৃথক পৃথক সময়ে ক্রমপর্যায়ে উদিত হতে ও অস্ত যেতে থাকে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে উদয়স্থল ও অস্তস্থল এক নয় বরং বহু।

৪১। আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে এমন কেহই নাই।

৪২। কাজেই এই লোকদিগকে তাহাদের অশ্লীল কথা ও খেল-তামাশায় লিপ্ত হইয়া থাকিতে দাও, যতদিন না তাহাদের নিকট করা ওয়াদার দিনটি পর্যন্ত তাহারা পৌঁছিয়া যায়।

৪৩। ইহারা নিজেদের কবর হইতে নির্গত হইয়া এমনভাবে দৌড়াইয়া যাইতে শুরু করিবে, যেন নিজেদের দেবতাদের স্থানসমূহের দিকে দৌড়াইতেছে।

৪৪। তখন তাহাদের দৃষ্টি অবনত হইবে, অপমান-লাঞ্ছনা তাহাদের উপর সমাচ্ছন্ন থাকিবে, এই দিনটিরইতো ওয়াদা তাহাদের সহিত করা হইতেছিল।

সূরা নূহ্

নামকরণ

এ সূরাটির নাম 'নূহ্'। এতে আলোচিত বিষয়াদির শিরোনামও এটাই। কেননা, এতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহে'র (আঃ) কাহিনীই বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মক্কা শরীফে অবস্থানকালের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটাও একটা। কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতে জানা যায়, এটা নাযিল হয়েছিল তখন যখন রসূলে করীমের (সঃ) দ্বীনী দাও'আত ও তবলীগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শত্রুতামূলক কর্মতৎপরতা খুবই তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় হযরত নূহের (আঃ) কাহিনী বলা হয়েছে; কিন্তু তা কেবলমাত্র কাহিনী শুনাবার ও গল্প বলবার ছলেই বলা হয়নি, মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যেই এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বলতে চেয়েছেন, হযরত নূহের (আঃ) সঙ্গে তাঁর সময়কার জনগোষ্ঠী যে আচরণ ও ব্যবহার করেছিল, আজ তোমরা (যুগ ও শতাব্দীর পরও) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে ঠিক সেই আচরণ ও ব্যবহারই করছো। এক্ষণে তোমরা যদি তোমাদের এই আচরণ হতে বিরত না থাক, তাহলে তোমাদেরকে ঠিক সেই পরিণতিরই সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন হযরত নূহের (আঃ) জনগোষ্ঠী। এ কথাটা গোটা সূরার কোথাও স্পষ্ট ভাষায় বলা না হলেও যে ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মক্কাবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে, সে পটভূমিতে এ বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে হযরত নূহ্কে (আঃ) রসূলের পদে নিয়োজিত করাকালে যে কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তার কথা।

২-৪ নম্বর আয়াত কটিতে বলা হয়েছে, তিনি কিভাবে স্বীয় দাও'আতী কার্যক্রম শুরু করলেন এবং নিজের জাতি ও জনগোষ্ঠীর সামনে কি কথা পেশ করলেন।

এরপর দীর্ঘ কাল পর্যন্ত দাও'আত ও তবলীগের কঠিন দায়িত্ব পালনে অকথ্য কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার পর হযরত নূহ্ (আঃ) যে কার্যবিবরণী আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সমীপে পেশ করেছিলেন তা ৫-২০ নম্বর আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। তিনি কি কি ভাবে স্বীয় জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে সত্য ও সঠিক পথে আনবার জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং জাতির লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে কিরূপ হঠকারিতার আচরণ করেছে, তা সবই তিনি এ পর্যায়ে নিবেদন করেছেন।

এর পর ২১-২৪ নম্বর আয়াত কটিতে হযরত নূহের (আঃ) সর্বশেষ আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে তিনি তাঁর খোদার নিকট নিবেদন করেছেন এ জাতি আমার দাও'আত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করেছে। তারা নিজেদের নাকে বাঁধা রশি তাদের প্রধান (নেতা)-দের হাতে সঁপে দিয়েছে। আর তারা সর্বত্র এক ব্যাপক বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে এখন হেদায়াত কবুল করার মৌল যোগ্যতা বা সুযোগটাই তাদের হতে কেড়ে নেয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। হযরত নূহ্ (আঃ) এরূপ কথা ধৈর্যহীনতা বা সহনশীলতার শেষমাত্রা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দরুনই বলেছেন, এমন কথা মনে করা যায় না। শত শত বছর কাল ধরে অত্যন্ত কঠিন প্রতিকূল ধৈর্যের বাঁধ চূর্ণকারী অবস্থার মধ্যে দ্বীনী দাও'আত প্রচারের দায়িত্ব তিলে তিলে পালন করার পর তিনি তাঁর জাতির জনগণের দিক হতে যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন

ঠিক তখনই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন যে, এ জাতি, এ জনগোষ্ঠীর হেদায়াত গ্রহণের আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই। বস্তুত তাঁর এ মত স্বয়ং আল্লাহতা'আলার ফয়সালার সঙ্গে পুরামাত্রায় সংগতিপূর্ণই ছিল। ঠিক এ কারণেই এর পরবর্তী ২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এ জাতির লোকদের ওপর তাদের নিজেদের দুষ্কৃতির দরুনই আল্লাহর আযাব নাযিল হয়ে গিয়েছে।

শেষ আয়াতে হযরত নূহের (আঃ) একটি দো'আ উদ্ধৃত হয়েছে। ঠিক আযাব নাযিল হওয়াকালেই তিনি এ দো'আটি তাঁর খোদার নিকট করেছিলেন। এ দো'আয় একদিকে তিনি নিজের ও সমস্ত ঈমানদার লোকদের জন্যে মাগফিরাত প্রার্থনা করেছেন এবং অপর দিকে তাঁর জাতির কাফের লোকদের সম্পর্কে তিনি আল্লাহর নিকট বলেছেনঃ তাদের একজনকেও পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রেখ না; কেননা, তাদের মধ্যে এখন একবিন্দু কল্যাণও আর অবশিষ্ট নেই, তাদের বংশে যে অধঃস্তন পুরুষই মাথা তুলবে তারা কাফের, ফাসেক ও অত্যাচারী, বর্বর, পাপীষ্ঠ হয়েই উঠবে।

এ সূরাটি অধ্যয়নকালে হযরত নূহের (আঃ) বিস্তারিত ঘটনাবলী কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে যা যা বলা হয়েছে তাও সমানে থাকা আবশ্যক। এ জন্যে সূরা আল অ'রাফ ৫৯-৬৬ নম্বর আয়াত, ইউনুস ৭১, ৭৩, হূদ ২৫-৪৯, আল মু'মিনুন ২৩-৩১, আশ্শু'আরা ১০৫-১২২, আল-আনকাবুত ১৪, ১৫, আস-সাফফাত ৭৫-৮২, আল-ক্বামার ৯-১৬ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য।

آيَاتُهَا ٢٨ (٧١) سُوْرَةُ نُوْحٍ مَّكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আটাশ তার আয়াত (৭১) সূরা নূহ মক্কী দুই তার রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু)

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

আমরা নিশ্চয় আমরা পাঠিয়েছি নূহকে প্রতি তার জাতির যে তুমি সতর্ক কর তোমার জাতিকে পূর্বে

أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ① قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ

যে তাদের উপর আসবে আযাব কষ্টদায়ক বলেছিল আমারজাতি হে আমি নিশ্চয় তোমাদের জন্যে সতর্ককারী

مُّبِيْنٌ ② أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ ③ يَغْفِرْ لَكُمْ

সুস্পষ্ট যেন তোমরা এবাদত কর আল্লাহর এবং তাঁকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর তিনি মাফ করবেন তোমাদের জন্য

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰىٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا

তোমাদের গুনাহ সমূহকে এবং তোমাদের অবকাশ দেবেন পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট নিশ্চয় নির্ধারিত কাল আল্লাহর যখন

جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

আসে না বিলম্বিত করা হয় যদি তোমরা হতে অবগত

১। আমরা নূহ্কে তাহার জাতির জনগণের প্রতি পাঠাইয়াছি (এই নির্দেশ সহকারে) যে, সে তাহার জাতির জনগণকে সাবধান করিবে তাহাদের উপর এক ভয়ানক উৎপীড়ক আযাব আসার পূর্বে।

২। সে বলিলঃ 'হে আমার জাতির জনগণ! আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী (নবী)।

৩। তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহর দাসত্ব কর, তাঁহাকে ভয় করিয়া চল ও আমার আনুগত্য করিয়া কাজ কর।

৪। আল্লাহ তোমাদের গুনাহখাতা মা'আফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিবেন[১]। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন আসে তখন আর উহাকে রোধ করা যায় না[২]। তোমরা যদি জানিতে, তবে কতই না ভাল হইত'।

১। অর্থাৎ যদি তোমরা এ তিনটি কথা মেনে নাও তবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করেছেন সে সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে তোমাদের জীবন ধারণের অবকাশ দান করা হবে।

২। এই দ্বিতীয় সময়ের অর্থ–আল্লাহতা'আলা কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেন। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে পরিষ্কাররূপে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোন জাতির জন্যে আযাব অবতরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় তখন তারপর তারা যদি ঈমান আনেও তবুও তাদের আর ক্ষমা করা হয় না।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّ نَهَارًا ۝٥ فَلَمْ يَزِدْ

বৃদ্ধি পায় নাই অতঃপর দিনে ও রাতে আমার জাতিকে আমি ডেকেছি নিশ্চয় আমি আমার রব হে সে বলল

هُمْ دُعَاۤءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَ اِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ

তুমি মাফ কর যাতে তাদের আমি ডেকেছি যখনই আমি নিশ্চয় এবং পলায়ন ছাড়া আমার ডাকে তাদের

لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

তাদের কাপড় (দ্বারা) তারা ঢেকেছে ও তাদের কানগুলোর মধ্যে তাদের আংগুলগুলকে তারা রেখেছিল তাদেরকে

وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨

প্রকাশ্যে তাদের ডেকেছি আমি নিশ্চয় অতঃপর বড়ই অহংকার অহংকার করেছে তারা এবং অনমনীয় হয়েছে ও

ثُمَّ اِنِّىْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝٩ فَقُلْتُ

আমি বলেছি অতঃপর গোপনে বলা তাদেরকে আমি গোপনে বলেছি এবং তাদের জন্যে আমি ঘোষণা দিয়াছি আমি নিশ্চয় এরপর

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ

তোমাদের উপর আকাশ (থেকে) পাঠাবেন তিনি বড়ক্ষমাশীল হলেন তিনি নিশ্চয় তোমাদের রবের (কাছে) তোমরা মাফ চাও

مِّدْرَارًا ۝١١

বৃষ্টি

৫। সে নিবেদন করিল[৩] ঃ 'হে আমার খোদা! আমি আমার জাতির জনগণকে দিন রাত ডাকিয়াছি।

৬। কিন্তু আমার ডাক তাহাদের এড়াইয়া চলার মাত্রা বৃদ্ধিই করিয়া দিয়াছে।

৭। আর যখনই আমি তাহাদিগকে ডাকিয়াছি—যেন তুমি তাহাদিগকে মা'আফ করিয়া দাও, তাহারা তাহাদের কানে অংগুলি ঠুসিয়া দিয়াছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া[৪] লইয়াছে। নিজেদের আচরণে তাহারা অনমনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং খুব বেশী অহংকার করিয়াছে।

৮। পরে তাহাদিগকে আমি উচ্চস্বরে ডাকিয়াছি।

৯। পরে আমি প্রকাশ্যভাবেও তাহাদের নিকট দ্বীনের দাও'আত পৌঁছাইয়াছি; গোপনে-গোপনেও তাহাদিগকে — বুঝাইয়াছি।

১০। আমি বলিয়াছি, তোমরা তোমাদের খোদার নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

১১। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন।

৩। মধ্যে এক দীর্ঘকালের ইতিহাস ত্যাগ করে এখন হযরত নূহের (আঃ) সেই আবেদনটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যা তিনি তাঁর রেসালাতের শেষ পর্যায়ে আল্লাহতা'আলার সমীপে পেশ করেছিলেন।

৪। মুখ ঢাকার কারণ হয় এই ছিল যে, হযরত নূহের (আঃ) কথা শোনা তো দূরের কথা তারা তাঁকে চোখে দেখতেও পছন্দ করতো না; অথবা তারা এ জন্যে এ রকম করতো যাতে তাঁর সম্মুখ থেকে যাওয়ার সময় তারা মুখ লুকিয়ে চলে যেতে পারে; হযরত নূহ (আঃ) তাদের চিনতে পেরে তাদের সংগে কথা বলার সুযোগ যেন না পান।

وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ

এবং তোমাদের সাহায্য করবেন | মালসমূহ দিয়ে | ও | সন্তানসন্ততি দিয়ে | এবং | সৃষ্টি করবেন | তোমাদের জন্যে | বাগবাগিচা সমূহ | ও | বানাবেন

لَّكُمْ اَنْهٰرًا ⑫ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ⑬ وَ قَدْ

তোমাদের জন্যে | ঝর্ণাসমূহ | তোমাদের কি হয়েছে | না | তোমরা আশা কর | আল্লাহর জন্যে | মর্যাদা | এবং | নিশ্চয়

خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ⑭ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের | পর্যায়ক্রমে | নাই কি | তোমরা দেখ | কেমনে | সৃষ্টি করেছেন | আল্লাহ | সাত | আসমান

طِبَاقًا ⑮ وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑯

স্তরে স্তরে | এবং | বানিয়েছেন | চাঁদকে | তার মধ্যে | আলো | এবং | বানিয়েছেন | সূর্যকে | প্রদীপ রূপে

وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ⑰ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ

এবং | আল্লাহ | তোমাদের উদ্ভূত করেছেন | থেকে | মৃত্তিকা | (বিস্ময়করভাবে উদ্ভূত) | এরপর | তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন

فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ⑱

তার মধ্যে | এবং | তোমাদেরকে বের করবেন | (সম্পূর্ণরূপে) বহিষ্কার

১২। তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সরঞ্জামাদি দিয়া ধন্য করিয়া দিবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচার সৃষ্টি করিবেন, আর তোমাদের জন্য ঝর্ণা ও খাল প্রবাহিত করিবেন।

১৩। তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা আল্লাহর জন্য কোনরূপ মান-মর্যাদারও আশা পোষণ কর না[৫]।

১৪। অথচ তিনি তো নানা পর্যায়ে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন[৬]।

১৫। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে ...ল্লাহ্ কিভাবে সাত আসমান স্তরে স্তরে নির্মাণ করিয়াছেন।

১৬। আর উহাতে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানাইয়াছেন?

১৭। আর আল্লাহতা'আলা তোমাদিগকে ভূতল হইতে বিস্ময়করভাবে উদ্ভূত করিয়াছেন[৭]।

১৮। পরে তিনি তোমাদিগকে এই মাটিতেই ফিরাইয়া লইবেন, আর উহা হইতে সহসাই তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিবেন।

৫। অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট ধনী ও সরদার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে তোমরা তো এই মনে কর যে, তাদের মর্যাদার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা বিপদজনক, কিন্তু বিশ্বপ্রভুও যে কোন মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা এ কথা তোমরা মনেও কর না। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ কর, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত কর, তাঁর আদেশ-নির্দেশের অবাধ্যতা কর, তবুও তোমাদের মনে এ আশংকা দেখা দেয় না যে, তিনি এর শাস্তি দান করবেন।

৬। অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় এনেছেন।

৭। এখানে মৃত্তিকার উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টিকে উদ্ভিদ উদ্‌গমের সংগে তুলনা করা হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন এই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ বর্তমান ছিল না। তার পর আল্লাহতা'আলা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ উদ্‌গত করেন। মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। এক সময় এমন ছিল যখন ভূপৃষ্ঠের উপর মানুষ বলতে কিছু ছিল না; পরে আল্লাহতা'আলা এখানে মানুষের চারা লাগালেন।

১৯। বস্তুত আল্লাহ্ ভূতলকে তোমাদের জন্য শয্যার ন্যায় সমতল করিয়া বিছাইয়া দিয়াছেন,

২০। যেন তোমরা উহার মধ্যে উন্মুক্ত পথ-ঘাট দিয়া চলাচল করিতে পার।'

২১। নূহ্ বলিলঃ 'হে আমার খোদা! উহারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও সে সব (সমাজ প্রধান)-দের আনুগত্য অনুকরণ করিয়াছে যাহারা ধন-মাল ও সন্তান পাইয়া আরও অধিক ব্যর্থকাম হইয়াছে'।

২২। এই লোকেরা বড় সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

২৩। তাহারা বলিলঃ 'তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করিবে না, ছাড়িবে না অদ এবং সূয়াকে ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকেও নয়[৮]।

২৪। তাহারা বিপুল সংখ্যক লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। আর তুমিও এই লোকদিগকে গুমরাহী ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে উন্নতি দিবে না[৯]।

৮। এখানে নূহের জাতির উপাস্য দেবতাদের মধ্যে সেইগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আরববাসীরা পরে যেগুলোকে পূজা করতে শুরু করেছিল। ইসলামের সূচনার সময় আরবে স্থানে স্থানে এই দেবতাদের মন্দির দেখা যেতো।

৯। বস্তুত নূহের (আঃ) এই অভিশাপের কারণ তাঁর অধৈর্য নয়, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে তবলীগের যথাযথ দায়িত্ব পালন করার পরও যখন তিনি নিজের জাতির কাছ থেকে পরিপূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে তাদের জন্যে এ বদদোয়া (অশুভ প্রার্থনা) নির্গত হয়েছিল।

২৫। তাহাদের নিজেদের অপরাধের দরুনই তাহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছে এবং অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিতে রক্ষাকারী সাহায্যকারীরূপে পাইল না।

। আর নূহ্ বলিলঃ 'হে আমার খোদা; এই কাফেরদের মধ্য হইতে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী একজনকেও ছাড়িও না।

২৭। তুমি যদি ইহাদিগকে এখানে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে ইহারা তোমার বান্দাহদিগকে গুমরাহ্ করিয়া দিবে। আর ইহাদের বংশে যাহারাই জন্মিবে—দুরাচারী ও কট্টর কাফেরই হইবে।

২৮। হে আমার খোদা। আমাকে ও আমার পিতা–মাতাকে এবং আমার ঘরে মু'মিনরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, আর সব মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকদের ক্ষমা করিয়া দাও। আর যালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোন জিনিস বৃদ্ধি দান করিও না'।

সূরা আল-জ্বিন্

নামকরণ

আল-জ্বিন' এ সূরাটির নাম। সে সঙ্গে সূরাটিতে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও এটাই। কেননা, জ্বিনদের কুরআন শুনে যাওয়া ও নিজ জাতির সামনে ইসলামের দাও'আত প্রচার করার ঘটনা এ সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) তাঁর কয়েকজন সংগী-সাথী সমভিব্যাহারে উকায নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নাখ্লা নামক স্থানে তিনি ফযরের নামায পড়ালেন। এ সময় জ্বিনদের একটা বাহিনী এতদঞ্চল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তারা থমকে দাঁড়াল ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন শ্রবণ করতে থাকল। এ সূরায় এ ঘটনারই আলোচনা করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক তফসীরকার এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেছেন, আসলে এটা প্রখ্যাত তায়েফ যাত্রাকালীন এক ঘটনা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে দশম নববীতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। কথিত তায়েফ সফরে জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের যে ঘটনাটি ঘটে, তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। সে ঘটনার বিবরণ সূরা আহকাফের ২৯-৩২ নম্বর আয়াত ক'টিতে বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত কটি পাঠ করলেই জানা যেতে পারে যে, এ সময় যে জ্বিন কুরআন মজীদ শুনে ঈমান এনেছিল সে পূর্বেই হযরত মূসা (আঃ) ও আসমানী কিতাবাদির প্রতিও ঈমানদার ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য সূরার ২-৭ পর্যন্তকার আয়াত কটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এ সময় কুরআন শ্রবণকারী জ্বিনেরা ছিল বহু সংখ্যক এবং তারা মুশরিক ছিল। তারা পরকাল ও নবুয়্যাত-রিসালাতের প্রতিও ঈমানদার ছিল না, ছিল তার প্রতি অবিশ্বাসী, তার অমান্যকারী। অধিকন্তু ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত তায়েফ যাত্রায় হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ রসূলে করীমের (সঃ) সংগী ছিল না। আলোচ্য সফরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ সফর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেন, এতে কয়েকজন সাহাবী রসূলে করীমের (সঃ) সংগী ছিলেন। উপরন্তু বহু ক'টি হাদীসের বর্ণনা হতে এই একটা কথাই জানা যায় যে, এ সফরে জ্বিন কুরআন শুনে ছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) তায়েফ হতে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে নাখ্লা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর আলোচ্য সফরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা হতে উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এসব কারণে নির্ভুল কথা এটাই হতে পারে বলে মনে হয় যে, সূরা আহ্কাফ ও সূরা জ্বিন এ দুটি সূরায় একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। মূলত এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা এবং দুটি ভিন্ন ভিন্ন সফরকালে এটা সংঘটিত হয়েছিল।

সূরা আহ্কাফ-এ যে ঘটনাটির বিবরণ দেয়া হয়েছে, হাদীসসমূহ সে সম্পর্কে এক বাক্যে বলেছে যে, তা দশম নববী সনের সফরকালে তায়েফে সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর প্রশ্ন থাকে, এই দ্বিতীয় ঘটনাটি কবে সংঘটিত হয়েছিল? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এ প্রশ্নের জবাব অনুপস্থিত। উপরন্তু নবী করীম (সঃ) কিছু সংখ্যক সাহাবী সমভিব্যাহারে 'উকায' বাজারের দিকে কবে যাচ্ছিলেন, তা কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা হতেও জানা যায় না। অবশ্য আলোচ্য সূরার ৮-১০ পর্যন্তকার আয়াত কটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে মনে হয়, এটা নবুয়তের প্রাথমিককালে সংঘটিত একটা ঘটনা হতে পারে! এ আয়াত ক'য়টিতে বলা হয়েছে, নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যাত লাভের পূর্বে উচ্চতর জগতের খবরাখবর জানবার জন্যে জ্বিনরা আকাশলোক হতে কিছু একটা শুনে জেনে নেবার কোন না কোন সুযোগ পেয়ে যেত। কিন্তু তার পর তারা সহসা দেখতে পেল যে, চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অত্যন্ত কড়া প্রহরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর সে সংগে জ্যোতিষ্কমন্ডলি বর্ষিত হচ্ছে। তার ফলে কোথাও দাঁড়িয়ে কান লাগিয়ে কিছু একটা শুনে নেবে এমন স্থান তারা কোথাও পাচ্ছে না। এর দরুন পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে এরূপ কঠোর ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে, তা জানবার জন্য তারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত এ সময় জ্বিনদের বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন

বাহিনী এর সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি ও ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছিল। এদেরই একটা বাহিনী নবী করীমের (সঃ) পবিত্র মুখে কুরআন শুনতে পেয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, এটাই সেই জিনিস যার দরুন উর্ধলোকে কান লাগিয়ে শুনবার সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জ্বিন্ সম্পর্কিত আসল তত্ত্ব

আলোচ্য সূরাটির অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বেই জ্বিন্ সম্পর্কিত আসল তত্ত্ব ও তথ্য জেনে নেয়া আবশ্যক। কেননা, এ পর্যায়ে মন-মগজকে সকল প্রকার দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত রাখার অন্য কোন উপায় নেই। বর্তমান কালের বহুসংখ্যক লোক এ ব্যাপারে খুব বেশী ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। তারা মনে করে নিয়েছে, 'জ্বিন্' বলতে কিছুই নেই, কোন বাস্তব জিনিসের নাম 'জ্বিন্' নয়। বরং এটা প্রাচীন কালের কুসংস্কারপূর্ণ ধারণাবলীর মধ্যেকার একটা ভিত্তিহীন বিশ্বাস মাত্র। তারা বিশ্বলোকের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য জেনে-শুনেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং জ্বিন্ বলতে কোথাও কিছু নেই বলে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছে এমন কথা আদৌ নয়। এমন কোন সংশয়মুক্ত নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না, করেও না। বিশ্বলোকে ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে যা কিছু তাদের গোচরীভূত হচ্ছে কেবল তাই আছে, তাছাড়া আর কিছুই নেই এরূপ কথা তারা নিতান্ত গায়ের জোরেই বলছে। এ কথার পশ্চাতে কোন অকাট্য যুক্তি বা প্রমাণই বর্তমান নেই। অথচ এ বিশাল বিশ্বলোকের বিশালতা ও পরিব্যাপ্তির তুলনায় মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুলোকের পরিধি সমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পরিমাণও নয়। যদি কেউ ধারণা করে থাকে যে, যা ইন্দ্রিয়ানুভূত নয় তা বর্তমানও নয়, যা কিছুই আছে তা অবশ্যই ইন্দ্রিয়ানুভূত হতে হবে; তবে সে নিজের মন-মানসিকতার অতীব সংকীর্ণতারই প্রমাণ পেশ করছে। উপরোক্ত ধরনের নীতিকে চূড়ান্ত মনে করে নিলে শুধু জ্বিনই নয়, সরাসরি পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের আওতাভুক্ত নয় এমন কোন সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না—অন্য কোন ইন্দ্রয়ানুভূতি বহির্ভূত জিনিসকে বাস্তব বলে মেনে নেয়া তো দূরের কথা!

কিছু সংখ্যক মুসলমান এ ধরনের মন-মানসিকতার অধিকারী রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদকেও তারা অসত্য বলতে পারে না, পারে না তার সত্যতায় অবিশ্বাস করতে। ফলে তারা বাধ্য হয়ে কুরআনে উদ্বৃত 'জ্বিন্', ইবলীস ও শয়তান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের নানারূপ অপব্যাখ্যা দিয়ে সে সবের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হয়েছে। তারা বলে এসব জিনিস কোন বাস্তব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পন্ন সত্তা নয়, এ কোন লুকিয়ে থাকা সৃষ্ট সত্তাও নয়। বরং কোন কোন আয়াতে তার দ্বারা মানুষের অর্ন্তনিহিত পাশবিক শক্তিসমূহ বুঝানো হয়েছে, যদিও তাকে শয়তান নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর কোন কোন আয়াতে তার দ্বারা বুঝানো হয়েছে বন্য আরণ্যিক ও পার্বতীয় জাতিসমূহ। কোথাও বুঝিয়েছে সে সব লোক যারা আত্মগোপন করে থেকে কুরআন মজীদ শুনছিল। কিন্তু এরূপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! কুরআন মজীদে এসব কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় বলা সে সব কথার এরূপ অপব্যাখ্যা প্রদান সম্পূর্ণ আজগুবী ব্যাপার। কুরআন মজীদে কোন একটা জায়গায়ই নয়, বহু জায়গায়ই জ্বিন্ ও মানুষের উল্লেখ হয়েছে এভাবে যে, তারা দু'টি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরা আ'রাফ-৩৮, হূদ-১১৯, হা-মীম-আস্‌সাজদাহ্ -২৫, ২৯, আল-আহকাফ -২৮, আয্-যারীয়াহ্ -৫৬, আন্‌নাস-৬ এবং আর-রহমান নামক সম্পূর্ণ সূরাটির কথা উল্লেখ করা যায়। শেষোক্ত সূরাটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, জ্বিনদের এক ধরনের মানুষ—মানুষের মধ্যেকারই কোন সম্প্রদায় মনে করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। তার কোন অবকাশই তাতে রাখা হয়নি।

সূরা আ'রাফ- ১২ নম্বর আয়াত, সূরা আল-হিজর ২৬-২৭ নম্বর আয়াত ও সূরা আর-রহমান ১৪-১৫ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌল উপাদান মাটি, আর জ্বিনদের সৃষ্টি করার মৌল উপকরণ আগুন।

সূরা আল-হিজর-২৭ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, জ্বিনদেরকে মানুষের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী কুরআনের সাতটি স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় (পূর্ব হতেই) শয়তান বর্তমান ছিল (তার অর্থ শয়তান মানুষের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে)। সূরা কাহাফ-৫০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ইবলীস জ্বিনদেরই একজন। সূরা আ'রাফ-এর ২৭ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, জ্বিনেরা মানুষকে দেখতে পারে; কিন্তু মানুষ জ্বিনদের দেখতে পায় না।

সূরা আল-হিজর ১৬-১৮ নম্বর আয়াতে, সূরা আস-সাফফাত ৬-১০ নম্বর আয়াতে ও সূরা মূলক-৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, জ্বিনেরা উর্ধলোক পানে উড়তে পারে বটে; কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সে সীমা লংঘন বা অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। সে সীমা লংঘন করতে চাইলে এবং তারও উর্ধে যেতে চেষ্টা করলে 'মালা-এ-আ'লা উর্ধ সাম্রাজ্যের লোকের গোপন তত্ত্ব শুনতে-জানতে চাইলে, তা প্রতিরোধ করা হয়। কোনরূপ গোপন উপায় অবলম্বন করে শুনতে চাইলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এসব কথা বলে আরবের মুশরিকদের একটা ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, 'জ্বিনেরা গোপন ইলম্ জানে অথবা খোদায়ী গোপন নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার ও সে পর্যন্ত পৌঁছাবার কোন না কোন ক্ষমতা বা সুযোগ তাদের আছে। সূরা সাবা-১৪ নম্বর আয়াতেও তার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সূরা আল-বাকারা ৩০-৩৪ নম্বর আয়াত ও সূরা কাহাফ-৫০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায়, পৃথিবীতে আল্লাহতা'য়ালা মানুষকেই খিলাফত দান করেছেন। আর মানুষ জ্বিনদের অপেক্ষা উত্তম সৃষ্টি, যদিও জ্বিনদেরকে কোন কোন অস্বাভাবিক-অসাধারণ শক্তি দান করা হয়েছে। সূরা নমল-৭ নম্বর আয়াতেও তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনুরূপ কিছু কিছু শক্তি মানুষের তুলনায় জন্তু -জানোয়ারদেরকেও অনেক বেশী দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ , তার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না কখনও।

কুরআন আরও বলেছে, জ্বিন্ মানুষের মতই এক ইচ্ছা ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টি। খোদানুগত্য বা নাফরমানী, কুফর বা ঈমান, যা ইচ্ছা গ্রহণ করার ক্ষমতা জ্বিনদেরও আছে- যেমন আছে মানুষের। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহকাফ, সূরা জ্বিন্-এ কোন কোন জ্বিনের ঈমান গ্রহণের ঘটনা হতে তা অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবেই জানা যায়।

কুরআনের বহু আয়াতে একটা বিরাট সত্য সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তা হলো- মানব সৃষ্টির সময় হতেই ইবলীস মানব প্রজাতিকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল। আর সে সময় হতেই জ্বিন্ শয়তানেরা মানুষকে গোমরাহ্ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় নিরত হয়ে আছে। কিন্তু মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তার উপর চড়ে বসে জোরপূর্বক তার দ্বারা কিছু করাবার ক্ষমতা ইবলীসের নেই। তাই নিছক অসঅসা দেয়াই তার একমাত্র কর্মপন্থা। শয়তান ইবলীস মানুষকে প্ররোচিত, প্রতারিত করে। ভুল ও মিথ্যা কথাকে সহীহ্ ও সত্য বলে তাদের মনে-মগজে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা চালায়। পাপ ও পথভ্রষ্টতাকে তাদের সম্মুখে খুবই চাকচিক্যময় আকর্ষণীয় ও মনোলোভা বানিয়ে উপস্থাপিত করে। এ পর্যায়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা আন্-নিসা ১১৭-১২০ নম্বর আয়াত, আল-আ'রাফ ১১-১৭ নম্বর আয়াত, ইবরাহীম ২২ নম্বর আয়াত, আল-হিজর ৩০-৪২ নম্বর আয়াত, আন-নহ্ল ৯৮-১০০ নম্বর আয়াত, বনী-ইসরাঈল ৬১-৬৫ নম্বর আয়াত, দ্রষ্টব্য।

কুরআন মজীদে আরও বলা হয়েছে, আরব মুশরিকরা জাহেলিয়তের যুগে জ্বিন্দেরকে খোদার সঙ্গে শরীক মনে করতো। তারা তাদের ইবাদত, পূজা-উপাসনা করতো এবং তারা বংশের দিক দিয়ে খোদার অধঃস্তন (নাউযুবিল্লাহ) মনে করতো (এ পর্যায়ে সূরা আল-আন'আম ১০০ নম্বর আয়াত, সাবা ৪-৪১ নম্বর আয়াত ও আস-সাফ্ফাত ১৫৮ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)।

উপরে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জ্বিন্ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন সত্তা। তা মানুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বতন্ত্র একটা প্রজাতীয় সৃষ্টি মাত্র। তাদের সত্তা ও অবয়ব মানবীয় দৃষ্টিতে গোচরীভূত নয়, এ কারণে জাহেল লোকেরা তাদের সত্তা ও ক্ষমতা সম্পর্কে নানারূপ অতিশয়োক্তি, আতিশয্য ও বাড়াবাড়িমূলক ধারণা নিজেদের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে ও প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এমন কি, তাদের পূজা-উপাসনা করতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু কুরআন মজীদ তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য এবং তাদের সম্পর্কে আসল তত্ত্বকথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছে, অজ্ঞাত রহস্য উদঘাটিত করে সাধারণের ধারণা পরিষ্কার ও প্রতিভাত করে দিয়েছে। ফলে তারা আসলে যে কি এবং কি নয় তা এখন দিবালোকের মতই স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সর্বজনজ্ঞাত।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটিতে প্রথম আয়াত হতে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে, জ্বিনদের একটা দল কুরআন মজীদ শুনতে পেয়ে

তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। পরে তারা নিজেদের বিশেষ এলাকায় ফিরে গিয়ে অন্যান্য জ্বিনদেরকে তার সংবাদ দেয়। এ পর্যায়ে তারা যত কথাই বলেছে ও পরস্পরে কথোপকথন করেছে, এখানে তা সবই আল্লাহতা'আলা উদ্ধৃত করেননি। করেছেন বিশেষ বিশেষ অংশ, যা তিনি উল্লেখযোগ্য গণ্য করেছেন। ফলে এখানকার বর্ণনাভংগী ধারাবাহিক কথোপকথনের মত হয়নি, তার বিভিন্ন অংশকে এখানে এমনভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা এটা বলেছে, ওটা বলেছে। জ্বিনদের জবানীতে উচ্চারিত এসব উক্তি মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনার সঙ্গে পাঠ করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, তাদের ঈমান গ্রহণের এ ঘটনা এবং তাদের জাতির অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের কথোপকথন কুরআন মজীদে উদ্ধৃত করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

এরপর ১৬-১৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত লোকদেরকে শিরক পরিহার করতে ও তা হতে বিরত থাকতে এবং সত্য সঠিক পথে অবিচল হয়ে চলতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা তা করলে তাদের প্রতি নি'আমতের বর্ষণ হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ-নসীহত প্রত্যাখান করলে ও মেনে না চললে তার পরিণতিতে কঠোর কঠিন আযাব ভুগতে তাদেরকে বাধ্য হতে হবে। ১৯-২৩ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে মক্কার কাফেরদের তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল (সঃ) যখন আল্লাহর দিকে লোকদেরকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহ্বান জানান, তখন তারা তার ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ভেঙ্গে পড়তে উদ্যত হয়। অথচ রসূলের (সঃ) কাজ হচ্ছে শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়া! লোকদেরকে ফায়দা বা ক্ষতি কিছু একটা করে দেয়ার নিরংকুশ ক্ষমতা তাঁর আছে বলে রসূল (সঃ) কখনই দাবী করেন না। ২৪-২৫ নম্বর আয়াতে কাফের সমাজকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ তারা রসূলকে (সঃ) সহায়হীন দেখে তাঁকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু সহায়হীন কে, তা জানবার সময় অবশ্যই একদিন আসবে। সময় নিকটে কি দূরে, তা রসূলের (সঃ) নিজের জানা নেই। কিন্তু সে সময়টি যে অবশ্যই আসছে তাকে আসতেই হবে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। শেষের দিকে লোকদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, গায়েব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত আলেম হচ্ছেন মহান আল্লাহতা'আলা। রসূল (সঃ) শুধু ততটুকুই জানতে পারেন, যতটুকু আল্লাহতা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন বা দিতে চান। আর সে জ্ঞানও হয় তা যা রিসালাত সংক্রান্ত কর্তব্যাদি সম্পর্কে অপরিহার্যরূপে গণ্য। এ জ্ঞান দেয়া হয় এমন সংরক্ষিত ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পন্থায় যাতে কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপ হওয়ার একবিন্দু সম্ভাবনা বা আশংকাও থাকতে পারে না।

সূরা আল–জ্বিন

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ২৮, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। হে নবী: বল, আমার প্রতি অহী করা হইয়াছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছে[১], (পরে নিজেদের এলাকায় গিয়া নিজেদের জাতির লোকদের নিকট) বলিয়াছে, আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শুনিয়াছি,

২। যাহা সত্য–সঠিক নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতঃপর আমরা আর কক্ষণই আমাদের খোদার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।

৩। 'আরও এই যে, আমাদের খোদার মান–মর্যাদা–সম্ভ্রম অতীব উচ্চ মহান। তিনি কাহাকেও স্ত্রী বা পুত্র–সন্তানরূপে গ্রহণ করেন নাই।

১। এর দ্বারা বুঝা যায় সে সময় জ্বিন রসূলুল্লাহর (সঃ) দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং তারা যে কুরআন–পাঠ শ্রবণ করছিল এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) জানতে পারেননি। বরং পরে অহীর মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা তাঁকে এ ঘটনার কথা জানান। এই কাহিনীর বর্ণনা দান করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও পরিষ্কাররূপে বলেছেন–'রসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদের সামনে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি' (মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ইবনে জরীর)।

وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ

ভেবেছিলাম আমরা যে এবং সীমাহীন মিথ্যা আল্লাহর উপর আমাদের নির্বোধরা বলত যে এবং
আমরা

اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ وَّ اَنَّهٗ كَانَ

যে এবং মিথ্যা আল্লাহ সম্পর্কে জিন্ন ও মানুষ বলবে কখনও না যে

رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ

তাদের বাড়িয়েছিল এভাবে জিন্নদের মধ্যের কিছু লোকের আশ্রয় চাইত মানুষের মধ্যে কিছু লোক

رَهَقًا ۝ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝

কাউকে (রাসূলরূপে) আল্লাহ পাঠাবেন কখনও না যে তোমরা ভেবেছ যেমন ভেবেছিল তারা যে এবং অহংকার

وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ

ও কঠোর পাহারাদারে পরিপূর্ণ তা আমরা পেয়েছি ফলে আসমানে আমরা তালাশ করেছি আমরা যে এবং

شُهُبًا ۝ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ

শুনবে যে কিন্তু শুনার জন্যে আসনগুলোতে সেখানে বসতাম আমরা যে এবং অগ্নিশিখা সমূহে

الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

পেতে রাখা অগ্নিশিখা তার জন্যে সে পাবে এখন

৪। 'আরও এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধ–মূর্খ লোকেরা[২] আল্লাহ সম্পর্কে অনেক কিছু অসত্য কথা–বার্তা বলিতেছিল।

৫। 'আরও এই যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলিতে পারে না।'

৬। 'আরও এই যে, মানুষের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক কিছু সংখ্যক জ্বিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিল। এইসব করিয়া তাহারা জ্বিনদের অহংকার ও অহমিকতা আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।'

৭। 'আরও এই যে, তোমরা যেমন ধারণা করিতেছিলে মানুষেরাও তেমনি ধারণা পোষণ করিতেছিল যে, আল্লাহ্ কাহাকেও রসূল বানাইয়া পাঠাইবেন না।'

৮। 'আরও এই যে, আমরা আকাশমন্ডল আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়াছি। ফলে দেখিয়াছি যে, উহা পাহারাদারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলির বর্ষণ হইতেছে।'

৯। 'আরও এই যে, পূর্বে আমরা কোন কিছু শুনিতে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আকাশমন্ডলে আসন গ্রহণ করার স্থান পাইয়া যাইতাম। কিন্তু এক্ষণে যে–ই লুকাইয়া গোপনে কিছু শুনিতে চেষ্টা করে সে নিজের জন্য ঘাটিতে একটি জ্যোতিষ্ক নিয়োজিত ও প্রস্তুত পায়।'

وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ

তাদের সাথে চান কিম্বা যমীনের উপর যারা সাথে অভিপ্রেত অকল্যাণ জানি আমরা না আমরা যে এবং

رَبُّهُمْ رَشَدًا ⑩ وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ

এ ছাড়াও (আছে) আমাদের আবার সৎলোক (কিছু) আমাদের মধ্যে (আছে) যে এবং কল্যাণ তাদের রব

كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ⑪ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ

আল্লাহকে অক্ষম আমরা করতে পারবো কখন না যে আমরা ভেবেছিলাম আমরা যে এবং বিভক্ত বিভিন্ন পথে আমরা ছিলাম

فِي الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ⑫ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا

আমরা শুনেছি যখন আমরা যে এবং পলায়ন করে তাঁকে পরাভূত করতে পারবো আমরা কখন না এবং পৃথিবীর মধ্যে

الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ

সে ভয় করবে না অতএব তার রবের উপর ঈমান আনবে যে অতএব তার উপর আমরা ঈমান এনেছি হেদায়াত

بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ⑬

জুলুমের না এবং অবিচারের

১০। 'আরও এই যে, আমরা বুঝিতে পারিতাম না, পৃথিবীবাসীদের প্রতি কোন খারাব আচরণ করার সংকল্প করা হইয়াছে, কিংবা তাহাদের খোদা তাহাদিগকে সঠিক-সরল পথ প্রদর্শন করিতে চাহেন[৩]?'

১১। 'আরও এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সদাচারী আছে, আর কিছু আছে উহাদের তুলনায় হীন, নীচ। আমরা বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত হইয়া আছি।'

১২। 'আরও এই যে, আমরা মনে করিতেছিলাম যে, না পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে অক্ষম করিতে পারি, না পালাইয়া গিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারি[৪]।'

১৩। 'আরও এই যে, আমরা যখন হেদায়াতের শিক্ষা শুনিতে পাইলাম, তখন আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। এক্ষণে যে কেহ তাহার খোদার প্রতি ঈমান গ্রহণ করিবে, তাহার কোন হক্ নষ্ট হওয়ার বা যুলুমের ভয় থাকিবে না।'

২। মূলে 'সাফীহুনা' سَفِيهُنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং একটি দলের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি এ শব্দকে এক মূর্খ ব্যক্তির অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে এর মর্ম হবে—ইবলীস এবং যদি একে একটি দলের অর্থে গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে—জ্বিনদের মধ্যে অনেক আহাম্মক ও নির্বোধ লোক এরূপ কথা বলতো।

৩। এর দ্বারা জানা গেল যে এ জ্বিন্ আসমানের এ অবস্থা দেখে এই অনুসন্ধান করতে বের হয়েছিলো যে, পৃথিবীর উপর এরূপ কি ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে যার সংবাদ সংরক্ষিত রাখার জন্যে এরূপ কঠোর ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে, যে জন্যে আমরা উর্ধ্বজগতের সামান্য কিছু শুনে নেয়ারও সুযোগ পাচ্ছি না এবং আমরা যে দিকেই যাই না কেন আমাদেরকে মেরে বিতাড়িত করা হচ্ছে।

৪। অর্থাৎ আমাদের এই ধারণা আমাদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করছে। যেহেতু আমরা আল্লাহ থেকে নির্ভয় ছিলাম না এবং আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তবে আমরা কিছুতেই তার পাকড়াও থেকে অব্যাহতি পাবো না; এ জন্যে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সত্য পথ দেখানোর জন্যে যে বাণী এসেছিল যখন আমরা তা শুনলাম তখন আমাদের এ সাহস হয়নি যে, সত্য জেনে নেয়ার পরও আমরা সেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো যা আমাদের অজ্ঞ লোকেরা আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছিল।

وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ط فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ

ঐসব লোক তারা | ইসলাম গ্রহণ করেছে | যে অতএব | সত্যবিমুখও (আছে) | আমাদের মধ্যে | আবার | মুসলমান (আছে) | আমাদের মধ্যে | যে | এবং

تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّ اَنْ

এবং | ইন্ধন | জাহান্নামের জন্যে | তারা অতঃপর হলো | সত্য বিমুখরা | অপরপক্ষে | সত্য পথ | বেছে নিয়েছে

لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ

তাদের পরীক্ষা আমরা যেন করি | প্রচুর | পানি | তাদের আমরা পান করতাম | অবশ্যই | সত্য পথের | উপর | তারা দৃঢ় থাকতো | যদি

فِيْهِ ط وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

দুঃসহ | আযাবে | তাকে প্রবেশ করাবে | তার রবের | স্মরণ | থেকে | মুখ ফেরাবে | যে এবং | তার মধ্যে

وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّ اَنَّهٗ لَمَّا

যখন | যে | এবং | কাউকে | আল্লাহর | সাথে | তোমরা ডেকো | না অতএব | আল্লাহরই জন্যে | মসজিদ সমূহ | যে | এবং

قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

ঘিরে ধরার | তার উপর | তারা উপক্রম করল (যেন) | তাঁকে ডাকছে | আল্লাহর | বান্দা | দাঁড়াল

১৪। 'আরও এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) আছে, আর কিছু সংখ্যক সত্য বিমুখ। ফলে যাহারা ইসলাম (খোদানুগত্যের পথ) অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ খুঁজিয়া লইয়াছে।'

১৫। 'আর যাহারা সত্য-বিমুখ, সত্য-পরিপন্থী পথ অবলম্বনকারী তাহারা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে অবশ্যম্ভাবীরূপে[৫]।'

১৬। 'আর (হে নবী, বল, আমার নিকট এই অহীও পাঠানো হইয়াছে যে,) লোকেরা যদি সত্য-সঠিক নির্ভুল পথে দৃঢ়তা সহকারে চলিত, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে প্রাচুর্য সহকারে পানি পান করাইতাম,

১৭। যেন আমরা এই নি'আমত দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি। আর যে-ই স্বীয় খোদার যিক্‌র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার খোদা তাহাকে কঠিন-কঠোর নির্মম আযাবে নিমজ্জিত করিবেন।'

১৮। 'আরও এই যে, মসজিদসমূহ কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য; কাজেই উহাতে আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ডাকিও না[৬]।'

১৯। 'আরও এই যে, আল্লাহর বান্দাহ যখন তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দাঁড়াইল, তখন লোকেরা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত হইল।'

৫। প্রশ্ন করা হয়, কুরআনের কথা অনুযায়ী জ্বিনতো নিজেরা অগ্নিজাত সৃষ্টি। সুতরাং জাহান্নামের আগুনে তাদের কি কষ্ট হতে পারে? উত্তরে বলা যেতে পারে— কুরআন অনুযায়ী মানুষ তো মাটি দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু যদি মানুষকে মাটি বা ঢেলা বানিয়ে মারা হয় তবে তার আঘাত লাগে কেন?

৬। অর্থাৎ আল্লাহর সংগে অন্য কারুর ইবাদত-উপাসনা -আনুগত্য করো না। অর্থাৎ কারুর কাছে প্রার্থনা জানাইও না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না।

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝٢٠ قُلْ إِنِّي

আমি নিশ্চয় বল কাউকে তার সাথে শরীক করি না এবং আমার রবকে আমি ডাকি মূলত বল

لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝٢١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي

আমাকে আশ্রয় দিতে পারে কখন না আমি নিশ্চয় বল কল্যাণের না এবং ক্ষতির তোমাদের জন্যে ক্ষমতা রাখি আমি না

مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝٢٢ إِلَّا بَلَاغًا

পৌঁছান এছাড়া নয় (আমার কাজ) আশ্রয়স্থল তাঁকে ছাড়া পাব আমি কখন না এবং কেউ আল্লাহ থেকে

مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ

তার জন্যে নিশ্চয় অতঃপর তার রসূলের ও আল্লাহর অমান্য করবে যে এবং তাঁর পয়গাম সমূহ ও আল্লাহ হতে

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝٢٣ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ

তাদের ওয়াদা করা হয়েছে যা তারা দেখবে যতক্ষণ না চিরকাল তার মধ্যে তারা স্থায়ী হবে জাহান্নামের আগুন

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝٢٤

সংখ্যায় অতি কম এবং সাহায্যকারী অধিক দুর্বল কে তারা জানতে পারবে শীঘ্রই অতঃপর

২০। হে নবী! বলঃ আমি তো আমার খোদাকে ডাকি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।

২১। বলঃ আমি তোমাদের জন্য না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি, না কোন কল্যাণ করার।

২২। বলঃ আমাকে আল্লাহর পাকড়াও হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারে না, আর না আমি তাঁহার আশ্রয় ছাড়া কোন আশ্রয় স্থল পাইতে পারি।

২৩। আমার কাজ শুধু ইহাই-এবং ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমি আল্লাহর কথা ও তাঁহার পয়গামসমূহ পৌঁছাইয়া দিব। 'এক্ষণে যে কেহই আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের কথা অমান্য করিবে, তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে। আর এই ধরনের লোকেরা উহাতে চিরকাল থাকিবে।'

২৪। (এই লোকেরা নিজেদের এই আচার-আচরণ হইতে বিরত হইবে না) যতক্ষণ না তাহারা সেই জিনিসটি দেখিতে পাইবে যাহার ওয়াদা তাহাদের নিকট করা হইতেছে। তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, কাহার সাহায্যকারী দুর্বল এবং বাহিনী কম সংখ্যক[৭]।

৭। কুরাইশ বংশের যেসব লোক সে সময় রসূলুল্লাহকে (সাঃ) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে শোনা মাত্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা এই ধারণায় মত্ত ছিল যে, তাদের দলবল বড় শক্তিশালী এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) সংগে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক, সুতরাং তারা খুব সহজেই তাঁকে দমন করে দেবে।

শব্দ- ২/১৮

২৫। বলঃ আমি জানি না, যে জিনিসটির ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হইতেছে উহা নিকটবর্তী, না আমার খোদা উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

২৬। তিনি তো গায়েব–অবহিত, স্বীয় গায়েব সম্পর্কে কাহাকেও অবিহত করেন না।

২৭। সেই রসূল ভিন্ন, যাহাকে তিনি (গায়েবী কোন জ্ঞান দেওয়ার জন্য) পছন্দ করিয়া লইয়াছেন[৮]। তখন তাহার সম্মুখে ও পিছনে তিনি প্রহরা লাগাইয়া দেন[৯]।

২৮। যেন সে জানিতে পারে যে, তাহারা তাহাদের খোদার পয়গামসমূহ পৌঁছাইয়া দিয়াছে[১০] এবং তিনি তাহাদের গোটা পরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করিয়া লইয়াছেন এবং এক একটি জিনিসকে তিনি গণিয়া রাখিয়াছেন[১১]।

৮। অর্থাৎ রসূল (সঃ) নিজে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না; আল্লাহতা'আলা যখন তাঁকে রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেন তখন অদৃশ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে যে জিনিসের জ্ঞান তিনি ইচ্ছা করেন রসূলকে (সঃ) দান করেন।

৯। প্রহরা অর্থ ফেরেশতাগণ। এর তাৎপর্য যখন আল্লাহতা'আলা অহী (প্রত্যাদেশ–বাণী) মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রসূলের (সঃ) কাছে প্রেরণ করেন তখন তা সংরক্ষণের জন্যে চারদিকে ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যাতে সে জ্ঞান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় রসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং তাতে কোনরূপ সংমিশ্রণ যেন ঘটতে না পারে।

১০। এর দ্বারা জানা গেল, রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে অদৃশ্য জগতের যে জ্ঞান দান করা আবশ্যক তা তাঁকে দেয়া হয় এবং রসূলের (সঃ) কাছে এ জ্ঞান যাতে সঠিক ও নির্ভুল অবস্থায় পৌঁছাতে পারে ও রসূল (সঃ) যাতে তাঁর প্রভুর বাণী প্রভুর বান্দাহদের কাছে ঠিক ঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারেন সেজন্যে ফেরেশতারা এ ব্যাপারে সংরক্ষণ করেন।

১১। অর্থাৎ রসূল (সঃ) এবং ফেরেশতাগণের উপর আল্লাহতা'আলার শক্তি–মহিমা এরূপ ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে যে, তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হলে তৎক্ষণাৎ ধৃত হবেন এবং যে বাণী আল্লাহতা'আলা প্রেরণ করেন তার প্রতিটি বর্ণ গনে রাখা হয়; তা থেকে একটি অক্ষরও কম–বেশী করার কোন ক্ষমতা রসূল (সঃ) বা ফেরেশতা কারুরই নেই।

সূরা আল–মুয্যামমিল

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ المزمل কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

এটা শুধু মাত্র নাম। এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে এ নামের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণে একে সূরার বিষয়বস্তু শিরোনাম মনে করা যেতে পারে না।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

এ সূরাটির দুটি রুকূ'। রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ মক্কাশরীফে নাযিল হয়েছে–এটা সর্বসম্মত কথা; এতে কারও দ্বিমত নেই। এর বিষয়বস্তু এবং হাদীসের বর্ণনাসমূহ এ উভয় দলীল হতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত; এটা মক্কী জীবনের কোন অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিলো? এ প্রশ্নের জওয়াব হাদীসের বর্ণনাসমূহে পাওয়া যায় না। তবে এ রুকূ'র আয়াতসমূহে আলোচিত মূল বিষয়গুলির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হ'তে এর নাযিল হওয়ার সময় নির্ধারণে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ এতে রাসূল করীম (সঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে আপনি রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠুন ও আল্লাহর ইবাদতে মন দিন। তাহলে নবুয়তের বিরাট দুর্বহ বোঝা বহন এবং তার ফলে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার শক্তি আপনার মধ্যে অর্জিত হবে। এ হতে জানা গেল, নবী করীমের (সঃ) প্রাথমিক নবী জীবনে এ নির্দেশ নাযিল হয়েছিল। কেননা, এ প্রাথমিক পর্যায়ে নবুয়ত পদের দায়িত্ব পালনের জন্য রসূলে করীম (সঃ)–কে আল্লাহর তরফ হতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এতে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত কিংবা তা হতে কিছুটা কম সময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ স্বতঃই জানিয়ে দেয় যে, রুকূ'র আয়াত কয়টি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন কুরআন মজীদের অন্তত এতটা অংশ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘ সময় ধরে পাঠ করা যায়।

তৃতীয়তঃ এ আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সঃ)–কে তার বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকারের অত্যাচারমূলক আচরণের মুকাবিলায় পরম ধৈর্য গ্রহণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর সে সংগে মক্কার কাফেরগণকে আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ হতে প্রমাণিত হয় যে এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় তার বিরুদ্ধতা প্রবলরূপ পরিগ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বহু সংখ্যক তফসীরকার যদিও এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তাও মক্কাতেই নাযিল হয়েছিলো; কিন্তু অপর কয়েক জন মুফাস্‌সীরের মতে তা মদীনায় নাযিল হয়েছিল। আয়াতসমূহের মূল বিষয়বস্তু হতেও এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, এ আয়াতসমূহেই আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মক্কায় যে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। এতে ফরয যাকাত আদায় করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যাকাত যে একটা নির্দিষ্ট হার ও ফরয হওয়ার পরিমাণ (নেসাব)সহ মদীনা শরীফেই ফরয হয়েছিল তা সর্বজন বিদিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরার প্রথম ৭টি আয়াতে রসূলে করীম (সঃ)–কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে বিরাট কাজের বোঝা আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে, তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। আর এ আত্মপ্রস্তুতির কর্ম পদ্ধতি স্বরূপ বলা হয়েছে যে, রাত্রিকালে আপনি শয্যা ত্যাগ করে উঠে অর্ধেক রাত্রিকাল বা তা

অপেক্ষা কিছুটা কম অথবা বেশী সময় ধরে নামায পড়ুন।

৮ নম্বর হ'তে ১৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই এক আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে যান, যিনি সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক। আপনার নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর ওপর অর্পণ করে আপনি নিশ্চিত হয়ে থাকুন। বিরুদ্ধবাদীরা আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু করে ও যা কিছু বলে, আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করে থাকুন, তাদেরকে তার জবাব দেবেন না। তাদের ব্যাপারটি আপনি খোদার উপর ন্যস্ত করুন, তিনিই তাদের সঙ্গে বুঝাপড়া করবেন।

এর পর ১৪ নম্বর হ'তে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মক্কার সে সব লোককে-যারা রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা করছিল-সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আমরা তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমন করে ফিরাউনের প্রতিও রসূল পাঠিয়ে ছিলাম। অতঃপর লক্ষ্য কর, ফিরাউন যখন আল্লাহর রসূলকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করলো, তখন সে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হলো। (তোমরাও রসূলকে অমান্য করলে তোমাদেরকেও অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে,) মনে কর, তোমাদের ওপর দুনিয়ায় কোন আযাবই এল না। তা হতে পারে; কিন্তু তাই বলে কিয়ামতের নিশ্চিত কঠিন দিনেও তোমরা এ পাপের শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তা কেমন করে হতে পারে?

এ পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ সম্পর্কেই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে প্রথম রুকূ'র নাযিল হওয়ার পূর্ণ দশটি বছর পর। হযরত সঈদ ইবনে যুবাইর এরূপই বর্ণনা করেছেন। এ রুকূ'তে প্রথম রুকূ'তে বলা তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশটি অনেকটা হালকা ও সহজ সাধ্য করে দেয়া হয়েছে। এ রুকূ'তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে পড়া যায়, সে চেষ্টাই করবে। কিন্তু মুসলমান জনগণকে সর্বাপেক্ষা বেশী সতর্কতা ও আয়োজন অবলম্বন করতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা ও সুষ্ঠুতা সহকারে আদায় করার জন্যে। যাকাতও ফরয, তাও যথাযথভাবে আদায় করতে হবে এবং নিজেদের ধনমাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকতে হবে খাঁটি নিয়েতের সঙ্গে। এ রুকূ'র শেষ দিকের আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তারা দুনিয়ায় যে যে ভাল ও শুভ কাজ সম্পন্ন করবে, তা কখনই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাবে না। বরং তা তো সেই সরঞ্জাম-সামগ্রী যা বিদেশযাত্রী স্বীয় স্থায়ী বাসস্থানে পূর্ব হতেই পাঠিয়ে দিয়ে সঞ্চয় করে রাখে। তোমরা আল্লাহর নিকট পৌঁছে সে সব কিছুই যথাযথভাবে মওজুদ পাবে যা তোমরা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছ! এ অগ্রিম পাঠানো সামগ্রী-সরঞ্জাম তোমাদের দুনিয়ায় রেখে যাওয়া দ্রব্য-সামগ্রীর তুলনায় শুধু উত্তমই নয়, আল্লাহর নিকট তোমরা তোমাদের প্রেরিত আসল সম্পদ হতে অনেক বেশী শুভ ফল পাবে।

أياتها ٢٠ (٧٣) سورة المزمل مكية ركوعاتها ٢

দুই তার রুকূ মক্কী মুয্যাম্মিল সূরা (৭৩) বিশ তার আয়াত

بسم الله الرحمن الرحيم

বড়ই মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু)

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ

কম কর বা তার অর্ধেক কিছু অংশ ব্যতীত রাতে (ইবাদত কর) উঠ বস্ত্রাবৃত হে

مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٤

তারতিলসহ কুরআন আবৃত্তিকর ধীরে ধীরে এবং তার উপর বাড়াও অথবা সামান্য তা থেকে

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ

তা রাত্রিকালের উত্থান (শয্যাত্যাগ) নিশ্চয় ভারী বাণী তোমার উপর অর্পণ করবো আমরা শীঘ্রই আমরা নিশ্চয়

أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٧

দীর্ঘ ব্যস্ততা দিনে তোমার জন্যে নিশ্চয় বাক্য স্ফুরণে সঠিকতর এবং দলনে (প্রবৃত্তি) প্রবলতর

সূরা আল–মুযযাম্মিল

(মক্কায় অবতীর্ণ)

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১। হে জড়াইয়া আবৃত শয়নকারী!

২। রাত্রিকালে নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া থাক; কিন্তু কম,

৩। অর্ধেক রাত্র কিংবা উহা হইতে কিছুটা কম করিয়া লও।

৪। অথবা উহাপেক্ষা কিছু বেশী বৃদ্ধি কর। আর কুরআন থামিয়া থামিয়া পড়।

৫। আমরা তোমার উপর একটা দুর্বহ কালাম নাযিল করিব।

৬। প্রকৃতপক্ষে রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশী কার্যকর এবং কুরআন যথাযথভাবে পড়ার জন্য যথার্থ।

৭। দিনের বেলায় তো তোমার খুব বেশী ব্যস্ততা।

৮। তোমার খোদার নামের যিক্‌র করিতে থাক, আর সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারই হইয়া থাক।

৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া কেহই খোদা নাই। কাজেই তাঁহাকেই নিজের উকিল[১] বানাইয়া লও।

১০। আর লোকেরা যেসব কথাবার্তা রচনা করিয়া বেড়াইতেছে সে জন্য তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আর সৌজন্য রক্ষা সহকারে তাহাদের হইতে সম্পর্কহীন হইয়া যাও[২]।

১১। এই সব অমান্যকারী সচ্ছল অবস্থার লোকদের সহিত বুঝাপড়া করার কাজটি তুমি আমার উপরই ছাড়িয়া দাও। আর এই লোকদিগকে কিছু সময়ের জন্য এই অবস্থার উপরই থাকিতে দাও।

১২। আমাদের নিকট (ইহাদের জন্য) দুর্বহ বেড়ি আছে, আর দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকা আগুন,

১৩। গলায় আটকিয়া যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব।

১। উকিল সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার উপর আস্থা স্থাপন করে কেউ নিজের ব্যাপারের দায়িত্ব তার উপর সমর্পণ করে। আমরা নিজ ভাষায়ও উকিল এমন ব্যক্তিকে বলে থাকি, যার উপর কেউ নিজের মামলা-মকদ্দমার দায়িত্বভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয় যে -তার পক্ষ থেকে তিনি উত্তমরূপে মকদ্দমা লড়বেন এবং সে ব্যক্তির পক্ষে নিজে মকদ্দমা পরিচালনার কোন প্রয়োজন হবে না।

২। 'সম্পর্কহীন হয়ে যাও' -এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের দ্বীন প্রচারের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর মর্ম হচ্ছে -তাদের সংগে কথাবার্তা বলো না বিতর্কে রত হয়ো না। তারা যেসব আজেবাজে অর্থহীন কথা বলে ও কাজ করে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে চলো। তারা যেসব বেয়াদবী ও অন্যায় আচার-আচরণ করে চলে তার কোন জবাবই তুমি দিও না। কিন্তু তোমার এই বিরত হওয়ারও যেন কোন ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিরক্তি-অস্থিরতার সংগে না হয়। একজন ভদ্র এবং সৌজন্য ও মর্যাদা বোধসম্পন্ন ব্যক্তি কোন বাউন্ডুলে লোকের গালমন্দ শুনে তা যেমন উপেক্ষা করে অন্তরে কোন মালিন্য আসতে দেয় না, তোমার সংযম সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৪। ইহা হইবে সেই দিন যখন পৃথিবী ও পর্বত কাঁপিয়া উঠিবে। আর পর্বতসমূহের অবস্থা এমন হইবে যেন বালুকাস্তূপ, যাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

১৫। তোমাদেরও[৩] নিকট আমরা তেমনিভাবে একজন রসূলকে তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা বানাইয়া পাঠাইয়াছি যেমন করিয়া আমরা ফিরাউনের প্রতি একজন রসূল পাঠাইয়াছিলাম।

১৬। (পরে দেখ, যখন) ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করিল তখন আমরা উহাকে শক্ত করিয়া পাকড়াও

১৭। তোমরাও যদি মানিয়া লইতে অস্বীকার কর তাহা হইলে সেই দিন কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে যে দিনটি বালকদিগকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিবে,

১৮। এবং যাহার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। আল্লাহর ওয়াদা তো পূর্ণ হইবে অবশ্যই,

১৯। ইহা একটি নসীহত মাত্র। অতঃপর যাহার দিল চাহিবে সে নিজের খোদার দিকে যাইবার পথ গ্রহণ করিয়া লইবে।

৩। মক্কার যেসব কাফের রসূলে করীমকে মিথ্যা অবিশ্বাস ও অমান্য করছিল এবং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর ছিল তাদের সম্বোধন করে এখন কথা বলা হচ্ছে।

রুকূ': ২

২০। হে নবী৪! তোমার খোদা জানেন যে, তুমি কখনও রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ সময়, আর কখনও অর্ধেক রাত্র এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্র ইবাদতে দাঁড়াইয়া থাক। আর তোমার সংগী-সাথীদের মধ্য হইতেও কিছু সংখ্যক লোক এই কাজ করে। রাত্র ও দিনের হিসাব আল্লাহই রাখিতেছেন। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখিতে পার না। এই কারণে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। এক্ষণে যতটা কুরআন তোমরা সহজে পাঠ করিতে পার ততটাই পড়িতে থাক৫। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রোগী হইতে পারে, অন্য কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করে; আর অন্য লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। কাজেই যতটা কুরআন খুব সহজেই পড়া যায় তাহাই পড়িয়া লও। নামায কায়েম কর। যাকাত দাও৬। আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক।

যাহা কিছু ভাল ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিবে, উহাকে আল্লাহর নিকট সঞ্চিত মওজুদরূপে পাইবে। উহাই অতীব উত্তম। আর উহার শুভ প্রতিফলও খুব বড়। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৪। এ রুকু' প্রথম রুকু'র ১০ বছর পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

৫। নামাযে দীর্ঘ সময় সাধারণত বিলম্বিত হয় দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াতের কারণেই। এ কারণেই বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামাযে যতটা কুরআন সহজে পড়তে পার ততটাই পড়। এর ফলে নামাযের দীর্ঘতা অনেকই হ্রাস পাবে।

৬। এই আয়াতটি দ্বারা ৫ ওয়াক্ত ফরয নামায ও ফরয যাকাত আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। এবিষয়ে সব তফসীরকার একমত।

সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির

নামকরণ

প্রথম আয়াতের المدثر শব্দটিকেই এ সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা নাম মাত্র। আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত মক্কা শরীফে এবং নবুয়্যতের প্রাথমিক সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে এতদূর বলা হয়েছে যে, এটা রসূলে করীমের (সঃ) প্রতি নাযিল হওয়া কুরআন মজীদের প্রাথমিক আয়াত। কিন্তু মুসলিম উম্মাতের নিকট এ কথা সর্বসম্মত ও সর্বসমর্থিত যে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি সর্ব প্রথম নাযিল হওয়া অহীর আয়াত হলোঃ اقرا باسم ربك الذى خلق হতে مالم يعلم পর্যন্ত। তবে সহীহ্‌ বর্ণনাসমূহ হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই প্রাথমিক অহীর পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলে করীমের (সঃ) প্রতি অহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকার পর নূতনভাবে অহী নাযিল হওয়া শুরু হলে সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির-এর এই প্রাথমিক আয়াত কটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল। ইমাম জুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দান করে বলেছেনঃ

একটা দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত নবী করীমের (সঃ) প্রতি অহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। এ সময়ে তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ জেগেছিল। ফলে তিনি কখনও পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতেও উদ্যত হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যখনই কোন পর্বত চূড়ায় আরোহণ করতেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলতেনঃ 'আপনি আল্লাহর নবী।' এটা শুনে তাঁর অস্থির মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করতো এবং অস্থিরতা ও উদ্বেগ জর্জরিত অবস্থার উপশম হয়ে যেত (ইবনে জরীর)।

'ফাত্‌রাতুল অহী' -অহী বন্ধ থাকা, এ সময়ের উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ 'একদা আমি পথে চলছিলাম! সহসা আমি উর্ধলোক হতে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। উপরের দিকে তাকালেই দেখতে পাই, সেই ফেরেশ্‌তা-যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটা আসনে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। এটা দেখে আমি ভয়ানক ভীত ও শংকিত হয়ে পড়লাম। অতঃপর ঘরে প্রত্যাবর্তন করে আমি বললামঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' ঘরের লোকেরা এ শুনে আমাকে কম্বল (বা লেপ) জড়িয়ে দিল। এ সময় আল্লাহতা'আলা অহী নাযিল করলেনঃ অতঃপর অব্যাহত ও ধারাবহিকভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরীর)।

সূরার অবশিষ্ট অংশ ৮ নম্বর আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে তখন, যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে যাওয়ার পর মক্কায় প্রথমবার হজ্জ পালন করার সুযোগ এসেছিলো। 'সীরাতে ইব্‌নে হিশাম' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। পরে আমরা তা উদ্ধৃত করবো।

মূল বিষয়বস্তু

উপরে যেমন বলা হয়েছে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি সর্বপ্রথম অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল সূরা আল-আলাক-এর প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত। তাতে শুধু এই কথাগুলো বলা হয়েছিলঃ

-"পড় তোমার নিজের খোদার নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক টুকরা মাংসপিন্ড হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। পড়, আর তোমার খোদা বড়ই বদান্যশীল; তিনি লেখনী দ্বারা জ্ঞান শিখাইয়াছেন। মানুষকে তিনি সেই

জ্ঞান দিয়াছেন যাহা সে জানিত না।"

অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতার এ ঘটনাটি সহসাই রসূলে করীমের (সঃ) সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তাঁকে কোন বিরাট মহান কাজের দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাঁকে কি কি করতে হবে, সে বিষয়ে এতে কিছুই বলা হয়নি। কেবলমাত্র একটা প্রাথমিক পরিচিতি ঘটিয়ে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দেয়া হ'ল, এই প্রথম অহী নাযিলের অভিজ্ঞতায় তাঁর মন-মগজ ও প্রকৃতির ওপর যে তীব্র কঠিন চাপ পড়েছে, এ সময়ের মধ্যে যেন তা দূর হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণের ও নব্যুয়তের কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে যেন প্রস্তুত হতে পারেন। এ অবসর কালটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার অহী নাযিল হওয়ার ধারা যখন শুরু হ'ল, তখন এ সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত নাযিল করা হ'ল। এতেই প্রথমবারের মত তাঁকে নির্দেশ দেয়া হ'ল আপনি উঠুন এবং বিশ্বমানব যে পথে ও পন্থায় চলছে, তার মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করুন-ভীত ও সচেতন করে তুলুন। আর এ দুনিয়ায় তখন যদিও অন্যান্যদের বড়ত্ব-প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের ডংকা বাজত সেখানে আপনি সার্বিকভাবে খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করে দিন। সে সংগে তাঁকে এ নির্দেশও দেয়া হ'ল যে, অতঃপর আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার প্রেক্ষিতে আপনার জীবন সর্বোতভাবে অতীব পবিত্র হতে হবে এবং আপনি সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থ ও সুবিধার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতা নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে মানব সাধারণের সার্বিক সংশোধন ও উন্নয়নের কর্তব্য পালন করুন। এ সূরার সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে উপদেশ দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কর্তব্য পালনে যে কঠিন অসুবিধা, সমস্যা, বন্ধুরতা ও কঠোরতার সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে সে সব ক্ষেত্রে আপনি অগাধ-অশেষ ধৈর্য ধারণ করুন।

আল্লাহর এ ফরমান যথাযথভাবে পালন করার জন্য নবী করীম (সঃ) যখন কার্যতঃ ইসলাম প্রচার শুধু করে দিলেন এবং কুরআন মজীদের পরপর নাযিল হওয়া সূরাসমূহ পাঠ করে লোকদেরকে শুনাতে শুরু করলেন, তখন মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ব্যাত্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ অবস্থার মধ্যে কয়েকটি মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের সময় এসে পৌঁছাল। তখন মক্কার লোকদের মনে চিন্তা-ভাবনা জেগে উঠলো, হজ্জের সময় সমস্ত আরব দেশ হতে হাজীদের কাফেলা এসে মক্কায় উপস্থিত হবে। মুহাম্মদ (সঃ) যদি এ সব কাফেলার অবস্থান স্থলে উপস্থিত হয়ে সমাগত হাজীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হজ্জ সংক্রান্ত সমাবেশসমূহে দাঁড়িয়ে কুরআনের ন্যায় তুলনাহীন ও মর্মস্পর্শী কালাম পাঠ করে শুনাতে শুরু করে দেন তাহলে সমগ্র আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর দাও'আত পৌঁছে যাবে। আর তার দরুন কত মানুষ যে প্রভাবিত হয়ে পড়বে তার কোন ইয়ত্তা থাকবেনা। এ কারণে কুরাইশ সরদাররা একটা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলো। তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল, হাজীদের মক্কায় উপস্থিত হতে শুরু হওয়ার সংগে সংগে মুহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও প্রোপগান্ডা শুরু করে দিতে হবে। এ কথায় সকলের এক মত হওয়ার পর অলীদ ইবনে মুগীরা সমবেত আরবদেরকে সম্বোধন করে বললো, তোমরা যদি মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা লোকদেরকে বল তাহলে আমাদের প্রতি কারও কোন আস্থা থাকবে না। কাজেই তার সম্পর্কে কোন একটা কথা আমাদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সে কথাটিই সকলের নিকট বলবে। তখন কয়েকজন বললো, আমরা বলবোঃ মুহাম্মদ (সঃ) গণক। অলীদ বললোঃ না, খোদার নামের শপথ, সে তো গণক নয়! গণক আমরা অনেক দেখেছি। তারা গুন গুন করে যেসব শব্দ উচ্চারণ করে, আর যে ধরনের বাক্য রচনা করে, কুরআনের সঙ্গে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। অন্য কিছু লোক বললোঃ তাঁকে জ্বিন্ প্রভাবিত বলে প্রচার করতে হবে। অলীদ বললো, 'জ্বিন্ প্রভাবিতও তিনি নন। পাগল ও মজনুন ধরনের লোকতো আর কম দেখিনি! এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের অসংলগ্ন ও অর্থহীন প্রলাপ বকতে থাকে, উদ্দেশ্যহীন কাজ-কর্ম করে, তা তো সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ) যে কালাম পেশ করছেন, তা পাগলের প্রলাপ কি বলবে? জ্বিন্ প্রভাবিত ব্যক্তির মুখ হতে যেসব অর্থহীন শব্দ উচ্চারিত হয়, কুরআনের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য আছে কি?' লোকেরা বললোঃ তাহলে আমরা বলব, তিনি কবি। অলীদ বললোঃ না, তিনি কবিও নন। যত প্রকার কবিতা হতে পারে-তা সবই আমাদের জানা আছে। কুরআনের কালামকে কাব্য বা কবিতা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। লোকেরা বললোঃ তাহলে তাঁকে জাদুকর বলতে হবে। অলীদ বললোঃ তাঁকে জাদুকর

বলার তো কোন অবকাশই নেই। জাদুকরদের আমরা জানি। তারা যে সব পন্থার উদ্ভাবন করে জাদুগিরি করবার জন্য, তাও আমাদের নখদর্পণে। মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি এ কথা কিছুতেই আরোপ করা যায় না। অতঃপর অলীদ বললোঃ এ সবের মধ্য হতে যা কিছুই তোমরা তাঁর সম্পর্কে বল না কেন, লোকেরা তাঁকে একটা অবাঞ্ছিত অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেবে। খোদার নামে শপথ করে বলি, এ কালামে খুব বেশী মাধুর্য রয়েছে। তার শিকড় অতিশয় গভীর। তার শাখা-প্রশাখা প্রচুর ফল ধারক। এ কথা শুনে আবু জেহেল অলীদের প্রতি সংশয় প্রকাশ করলো। বললো, তুমি নিজে যতক্ষণ মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তোমার নিজের অভিমত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করবে, তোমার জাতির জনগণ তোমার প্রতি ততক্ষণে কিছুতেই রাজী (আস্থাশীল) হতে পারে না। সে বললো, তাহলে আমাকে ভাবতে দাও। পরে চিন্তা-ভাবনা করে সে বললোঃ তাঁর সম্পর্কে গ্রহণ যোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে, তা হ'ল এই, তোমরা সমগ্র আরবদের নিকট বলবে, তিনি একজন জাদুকর। তিনি এমন কালাম পেশ করেন, যা ব্যক্তিকে তার পিতা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র ও গোটা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অলীদের এ কথাটি উপস্থিত সকলেই গ্রহণ করলো। পরে একটা পরিকল্পনার ভিত্তিতে হজ্জের মৌসুমে কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিদল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তারা দূরাগত হজযাত্রীদের আগামভাবে জানিয়ে দিতে লাগলো যে, এখানে একজন বড় জাদুকর মাথা জাগিয়েছে। তার জাদু পরিবারসমূহের মধ্যে বিচ্ছেদ্য-ব্যবধান, বিসম্বাদ-মনোমালিন্যের ও ভাঙনের সৃষ্টি করে। তার সম্পর্কে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু এরূপ প্রচারণার বিপরীত ফল দেখা দিল। কুরাইশের লোকেরা নিজেরাই হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সংবাদ সমগ্র আরব দেশে ছড়িয়ে ও বিস্তার করে দিল। (-সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, ২৮৮-২৮৯ পৃঃ। এ বিবরণের যে অংশে বলা হয়েছে যে, আবু জেহেলের দাবীতে অলীদ বললো, ইকরামার সূত্রে ইবনে জরীর স্বীয় তফসীরে এটা উদ্ধৃত করেছেন) আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার বিষয়বস্তুর বিন্যাস এইঃ

৮-১০ নম্বর আয়াতে সত্য দ্বীন অমান্যকারীদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ তা তারা যা কিছু করছে তার মারাত্মক পরিণতি তারা নিজেরাই কিয়ামতের দিন দেখে নেবে।

১১-২৬ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে অলীদ ইবনে মুগীরার নাম না নিয়েই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ লোকটিকে অফুরন্ত নি'আমত দিয়েছিলেন; কিন্তু তার বিনিময়ে সে কি নির্লজ্জভাবে সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধতায় মেতে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে লোকটির মানসিক দ্বন্দ্বের স্পষ্ট চিত্র অংকিত হয়েছে। একদিকে লোকটি মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআন মজীদের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু অন্যদিকে সে নিজ জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় প্রাধান্য আধিপত্য ও কর্তৃত্বকেও বিপন্ন করে দিতে প্রস্তুত ছিলনা। এ কারণে সে কেবল ঈমান গ্রহণ হতে বিরত রয়েছে তাই নয়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকার পর শেষ পর্যন্ত একটা কথা রচনা করে বললোঃ মানব সাধারণকে এ কালামের প্রতি ঈমান আনা হতে বিরত রাখার জন্যে তাকে জাদু নামে অভিহিত করতে হবে। লোকটির এই জঘণ্য মানসিকতার বীভৎস রূপকে এখানে উদঘাটিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিজের এসব হীন কার্যকলাপের পরও আরও অসংখ্য নি'আমতসমূহ তাকে দেয়া হোক বলে দাবী জানাতে এ ব্যক্তি কোনরূপ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেনা। অথচ এখন লোকটি কোন পুরস্কার পাওয়ার নয়, দোযখের কঠিন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য হয়েছে।

এরপর ২৭-৪৮ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে দোযখের ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন্ সব চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী লোকেরা এ দোজখের যোগ্য সাব্যস্ত হবে!

৪৯-৫৩ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে কাফেরদের রোগের আসল কারণের ও মূল্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হ'ল এই, তারা পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভীক ও বেপরোয়া। এ দুনিয়ার জীবনকেই তারা মনে করে সব কিছু; বিশ্বাস করে এখানেই সব শেষ। এ কারণে তারা কুরআন হতে দূরে-অতি দূরে পালিয়ে যায়, ঠিক বন্য গর্দভ যেমন ব্যাঘ্রকে ভয় করে দূরে সরে যায় তেমনভাবে। এরা ঈমান গ্রহণের জন্যে নানা প্রকারের অযৌক্তিক শর্তসমূহ পেশ করে। অথচ তাদেরই উপস্থাপিত শর্তের মধ্যে কোন একটি শর্তও যদি পূরণ করে দেয়া হয়, তবুও তারা পরকাল অস্বীকৃতি করে ও ঈমানের পথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারেনা।

সূরার শেষভাগে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো কারও ঈমানের মুখাপেক্ষী নন, কেউ ঈমান গ্রহণ করুক আর নাই করুক তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। কাজেই তিনি সকলের দাবী অনুযায়ী কেবল শর্ত পূরণ করে বেড়াবেন, এমন কথা যুক্তিসংগত নয়। কুরআন সর্বসাধারণের জন্য নসীহতের কিতাব। তা সকলের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা হবে না ঈমান আনবে না। তবে আল্লাহর নাফরমানী করার ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করা উচিৎ। যে ব্যক্তিই তাকওয়া ও খোদাভয়ের আচরণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন, পূর্বে সে যতবারই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।
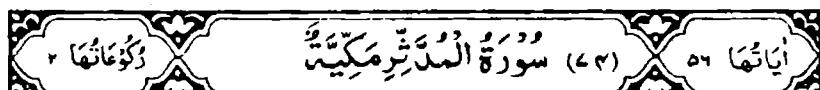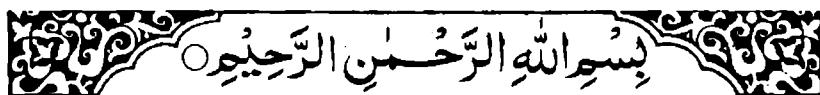
সূরা আল–মুদ্দাসসির

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৫৬

মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। হে আবৃত শয্যা–গ্রহণকারী[১]!

২। উঠ, আর সাবধান কর

৩। ও তোমার খোদার শ্রেষ্ঠত্ব–বড়ত্বের ঘোষণা কর।

৪। আর নিজের কাপড় পবিত্র রাখ।

৫। আর মলিনতা পূতিগন্ধময়তা হইতে দূরে থাক।

৬। আর অনুগ্রহ করিও না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

৭। আর নিজের খোদার জন্য ধৈর্য ধারণ কর।

১। এই সূরার প্রাথমিক ৭টি আয়াতেই রসূলুল্লাহ (সঃ)কে সর্ব প্রথম ইসলাম প্রচারের আদেশ দেয়া হয়। "একরা বিসমে..." "তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ কর"ঃ এরপর এই হচ্ছে দ্বিতীয় অহী যা রসূলুল্লাহর (সঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩ عَلَى

উপর কঠিন দিন (হবে) দিন সেই অতএব সিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে যখন অতঃপর

الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝١١ وَ

এবং একেলা আমি সৃষ্টি করেছি যাকে আর আমাকে ছাড় সহজ নয় কাফিরদের

جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝١٢ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝١٣ وَمَهَّدْتُ

আমি সুগম করেছি এবং সদা উপস্থিত সন্তানাদি এবং বিপুল সম্পদ তার জন্যে আমি বানিয়েছি

لَهُ تَمْهِيدًا ۝١٤ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝١٥ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ

হল সে নিশ্চয় কক্ষণও না অধিক দিব আমি যে লালসা করে সে এরপর প্রচুর স্বচ্ছলতা তার জন্যে

لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝١٦ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝١٧ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ

এবং চিন্তা করল সে নিশ্চই কঠিন চড়াইয়ে তাকে চড়াব আমি শীঘ্রই শত্রুতা ভাবাপন্ন আমাদের নিদর্শনাদির প্রতি

قَدَّرَ ۝١٨ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩

সে সিদ্ধান্ত নিল কেমন সে নস্যাৎ তাই হয়েছে সে সিদ্ধান্ত নিল

৮। স্মরণ কর, যখন[২] শিংগায় ফুঁ দেওয়া হইবে,

৯। সেই দিনটি বড়ই কঠোর সাংঘাতিক হইবে,

১০। কাফেরদের জন্য কিছু মাত্র সহজ হইবে না।

১১। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আমি একলা সৃষ্টি করিয়াছি।

১২। বিপুল পরিমাণ ধন-মাল তাহাকে দিয়াছি,

১৩। তাহার সহিত সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্র দিয়াছি।

১৪। আর তাহার জন্য নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের পথ সুগম করিয়া দিয়াছি।

১৫। তাহা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এই জন্য যে, আমি তাহাকে আরও অধিক দিব।

১৬। কক্ষণও নয়, আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি সে অত্যন্ত শত্রু মনোভাবসম্পন্ন।

১৭। আমি তো তাহাকে শীঘ্রই একটা কঠিন চড়াইতে চড়াইব।

১৮। সে চিন্তা করিয়াছে এবং কিছু কথা-বার্তা রচনার চেষ্টা চালাইয়াছে।

১৯। ফলে খোদার মার তাহার উপর, কি রকমের কথা রচনার জন্য চেষ্টা করিয়াছে!

২। এ অংশ প্রাথমিক আয়াত কয়টির কয়েক মাস পরে সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়ে যাবার পর প্রথমবার হজ্জের মৌসূম উপস্থিত হয়েছিল এবং কুরাইশ সরদাররা একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সিদ্ধান্ত করেছিল যে, বাহির থেকে আগত হাজীদের মধ্যে কুরআন ও মুহাম্মদ সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টির জন্য প্রোপাগান্ডার এক প্রচণ্ড অভিযান চালাতে হবে।

২০। হ্যাঁ, খোদার মার তাহার উপর, কি রকমের কথা রচনার চেষ্টা করিয়াছে[৩]।

২১। পরে (লোকদের প্রতি) তাকাইল,

২২। পরে কপোল সংকোচিত করিল, মুখ বাঁকা করিল,

২৩। পরে ফিরিয়া গেল ও অহংকারে পড়িয়া গেল।

২৪। শেষ পর্যন্ত বলিল, ইহা কিছুই নয়, শুধু জাদু মাত্র, ইহা তো পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে,

২৫। ইহা তো একটা মানবীয় কালাম।

২৬। খুব শীঘ্রই আমি তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিব।

২৭। আর তুমি কি জান, সে দোযখটি কি?

২৮। উহা অবশিষ্ট রাখে না, ছাড়িয়াও দেয় না[৪];

২৯। চামড়া ঝলসাইয়া দেয়।

৩০। উনিশ জন কর্মচারী তাহার উপর নিয়োজিত।

৩। এখানে অলীদ-বিন-মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন যে খোদার কালাম এ কথা সে অন্তরে অন্তরে বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কায় নিজের সরদারী কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সে উক্ত সম্মেলনে হযুরকে (সঃ) জাদুকর ও কুরআনকে জাদু বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্যে কাফেরদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল।

৪। অর্থাৎ আযাব পাওয়ার যোগ্য একজন ব্যক্তিকেও বাকী থাকতে দেবে না যে তার পাকড়াওয়ের মধ্যে না এসে থেকে যাবে। আর যে ব্যক্তিই তার পাকড়াওয়ের মধ্যে আসবে তাকে সে আযাব না দিয়ে ছাড়বে না।

وَ مَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّ مَا جَعَلْنَا

আমরা বানিয়েছি | না | এবং | ফেরেশতাদের | ছাড়া | দোজখের | কর্মচারী দেরকে | আমরা বানিয়েছি | না | এবং

عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

দেয়া হয়েছে | যাদের (তারা) | দৃঢ় বিশ্বাস করে যেন | কুফরী করেছে | তাদের জন্যে (যারা) | পরীক্ষা | এছাড়া | তাদের | সংখ্যা

الْكِتٰبَ وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ

যাদের | সন্দেহ করে | না | এবং | ঈমান (তাদের) | ঈমান এনেছে | যারা | বাড়ে | এবং | গ্রন্থ

اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَ لِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

তাদের অন্তরসমূহের | মধ্যে (রয়েছে) | যারা | বলেযেন | এবং | মুমিনরা | এবং | কিতাব | দেয়া হয়েছে

مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ

এভাবে | উদাহরণ | এই দ্বারা | আল্লাহ | ইচ্ছে রাখেন | কি | কাফিররা | এবং | রোগ

يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا يَعْلَمُ

কেউ জানে | না | এবং | ইচ্ছে করেন | যাকে | হিদায়াত দেন | এবং | ইচ্ছে করেন | যাকে | আল্লাহ | গুমরাহ করেন

جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ مَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾

মানুষের জন্যে | উপদেশ | এছাড়া | তা | নয় | এবং | তিনি | ছাড়া | তোমার রবের | সৈন্যদের

৩১। আমরা[৫] দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতা বানাইয়াছি। আর তাহাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা ফিতনা বানাইয়া দিয়াছি। যেন আহ্‌লি-কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে পারে এবং ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমান যেন বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহ্‌লি-কিতাব ও মু'মিন জনগণ কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে[৬] এবং দিলের রোগী ও কাফেরগণ বলিবে, 'এই ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলিয়া আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহেন'; এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন গুমরাহ করিয়া দেন, আর যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। আর তোমার খোদার সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেহই জানেন না।–আর এই দোযখের উল্লেখ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে যে, লোকদের পক্ষে ইহা হইতে নসীহত লাভ সম্ভব হয়।

৫। এখান থেকে শুরু করে "তোমার খোদার সৈন্যবাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না" পর্যন্ত সমগ্র অংশটি ভাষণের মধ্যে বাক্যের পারম্পর্য ছিন্ন করে মাঝখানে বলা কথা হিসাবে সেই অভিযোগকারীদের উত্তরে বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহর (সঃ) মুখ থেকে এই কথা শুনে যে, দোযখের কর্মচারীদের সংখ্যা হবে ১৯, এ কথার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এ কথা তাদের কাছে বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল; একদিকে তো আমাদের শোনানো হচ্ছে -আদমের (আঃ) সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে যত লোক কুফরী ও বড় বড় পাপ করছে তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আবার অন্যদিকে আমাদের এ খবর দেয়া হচ্ছে যে এত বড় বিরাট বিশাল দোযখের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন মানুষের আযাব দেয়ার জন্যে মাত্র ১৯ জন কর্মচারীই নিযুক্ত থাকবে!"

৬। যেহেতু আহলি-কিতাব ও মু'মিনরা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তির কথা জানে, সুতরাং দোযখের ব্যবস্থাপনার জন্যে ১৯ জন ফেরেশতা যথেষ্ট। এ বিষয় তাদের সন্দেহ থাকতে পারে না।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى

একটি নিশ্চয় তা নিশ্চয় উজ্জ্বল হয় যখন প্রভাতের এবং প্রত্যাবর্তন করে যখন রাতের শপথ চাঁদের শপথ কক্ষণ নয়

الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

পিছিয়ে যাবে অথবা অগ্রসর হবে যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছে করে (তার) যে জন্যে মানুষের জন্যে সতর্ককারী বড়গুলোর

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي

মধ্যে ডানদিকস্থ ব্যক্তিগণ ছাড়া দায়ে আবদ্ধ অর্জন করেছে যা বিনিময়ে ব্যক্তি প্রত্যেক।

جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾

দোজখের মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিয়েছে কিসে অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা পরস্পরে করবে বেহেশতের

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

মিছকিনকে খাওয়াতাম আমরা না এবং নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম আমরা না তারা বলবে

৩২। কক্ষণও নয়[৭]! চন্দ্রের শপথ,

৩৩। শপথ রাত্রের–যখন উহা প্রত্যাবর্তন করে,

৩৪। আর প্রভাতকালের–যখন উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

৩৫। এই দোযখ বড় বড় জিনিসগুলির মধ্যের একটি[৮]

৩৬। মানুষের জন্য ভীতি প্রদানকারী।

৩৭। তোমাদের মধ্যকার এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভীতিপ্রদ, যে সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহে; কিংবা পিছনে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছুক।

৩৮। প্রতিটি প্রাণী স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে রেহনবন্দী?
৩৯। দক্ষিণ বাহওয়ালা লোকদের ব্যতীত।

৪০–৪১। ইহারা জান্নাতসমূহে থাকিবে। তথায় তাহারা অপরাধী লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেঃ

৪২। কোন্ জিনিসটি তোমাদিগকে জাহান্নামে লইয়া গিয়াছে[৯]?

৪৩। তাহারা বলিবেঃ 'আমরা নামায পড়া লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না,

৪৪। মিসকীনদিগকে খাবার খাওয়াইতে ছিলাম না,

৭। অর্থাৎ এ কোন আজগুবি কথা নয়, এইভাবে যার ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা যেতে পারে।

৮। অর্থাৎ চাঁদ, রাত, দিন যেরূপ আল্লাহতা'আলার শক্তি–মহিমার মহান নিদর্শনাবলী সেইরূপ দোযখও আল্লাহর শক্তি মহিমার মহান নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি বস্তু।

৯। অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে বসে বসে সে দোযখের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলবে ও এই প্রশ্ন করবে।

৪৫। আর প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সহিত মিলিত হইয়া আমরাও অনুরূপ কথা–বার্তা রচনা করার কাজে মশগুল হইয়াছিলাম।

৪৬। সেই সংগে প্রতিফল দেওয়ার দিনটিকে আমরা মিথ্যা–অসত্য মনে করিতাম।

৪৭। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই দৃঢ় প্রত্যয়মূলক জিনিসটিরই সম্মুখীন হইয়া পড়িলাম।'

৪৮। এই সময় সুপারিশকারী লোকদের সুপারিশ তাহাদের কোন কাজেই আসিবে না।

৪৯। বলতো, এই লোকদের কি হইয়াছে যে, ইহারা এই নসীহত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আছে?

৫০। যেন ইহারা বন্যগাধা,

৫১। ব্যাঘ্রের ভয়ে পালাইয়া যাইতে ব্যতিব্যস্ত[১০]।

১০। এটা আরবীভাষার একটি বাগধারা। বন্য গাধার স্বভাব হলো, বিপদের একটু আঁচ পেলেই এরা দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে। অন্য কোন জন্তুই এমন করে পালায় না।

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

বরং | চায় | প্রত্যেক | ব্যক্তি | তাদের মধ্যে | যে | দেয়া হোক | গ্রন্থ সমূহ | উন্মুক্ত

كَلَّا ۖ بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ

কক্ষনো | বরং | না | তারা ভয় করে | আখেরাতকে | কক্ষণনা | তা নিশ্চয় | উপদেশ | যে অতএব

شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ

ইচ্ছা করে | তার শিক্ষানিক | এবং | না | তারা শিক্ষা নেবে | এ ছাড়া | যে | ইচ্ছা করেন | আল্লাহ | তিনিই

أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

যোগ্য | ভয়ের | এবং | অধিকারী | মাফ করার

৫২। বরঞ্চ ইহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চাহে যে, তাহার নামে খোলা চিঠি প্রেরিত হউক[১১]।

৫৩। কক্ষণই নয়, আসল কথা হইল, এই লোকেরা পরকালকে মাত্রই ভয় করে না।

৫৪। কক্ষণই নয়[১২]। ইহা একটি উপদেশ মাত্র।

৫৫। এক্ষণে যাহার ইচ্ছা, ইহা হইতে সে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

৫৬। আর ইহারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করিবে না –তবে আল্লাহই যদি তাহা চাহেন। তিনিই ইহার উপযুক্ত যে, তাঁহার প্রতি তাক্ওয়া পোষণ করা হইবে। আর তিনিই ইহার যোগ্য যে, (তাক্ওয়া পোষণকারী লোকদিগকে) তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন।

১১। অর্থাৎ এরা চায়, আল্লাহতা'আলা সত্য সত্যই যদি মুহাম্মদকে (সঃ) নবী মনোনীত করে থাকেন তবে মক্কার প্রতিটি সরদার ও প্রতিটি শেখের নামে তিনি এক একটি পত্র এই মর্মে লিখে পাঠান যে–'মুহাম্মদ আমার নবী' তোমরা সকলে তার আনুগত্য গ্রহণ করো।'

১২। অর্থাৎ তাদের এরূপ কোন দাবী কষ্মিনকালেও পূর্ণ করা হবে না।

সূরা আল-কিয়ামাহ্

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের শব্দটিকেই القيمة এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আর কার্যতঃ এটা এ সূরার কেবল নামই নয়, এ সূরায় আলোচিত বিষয়ের শিরোনামও এটাই। কেননা, এ সূরায় কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হাদীসের কোন বর্ণনা হতে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায় না। কিন্তু তাতে আলোচিত বিষয়ে এমন একটি অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হতে জানা যায়, এ মক্কার প্রাথমিক কালে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের একটি । ১৫ নম্বর আয়াতের পর কথার ধারাবাহিকতা চূর্ণ করে সহসাই রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছেঃ 'এই অহীকে দ্রুত স্মরণ করিয়া লওয়ার জন্য স্বীয় জিহ্বাকে নাড়াইও না। ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া ও পড়াইয়া দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পড়িতে থাকি, তখন তুমি উহার পাঠকে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাক। পরে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্ব।' এর পর ২০ নম্বর আয়াত হতে পুনরায় সে বিষয়ে কথা বলা শুরু হয়ে যায় যা শুরু থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলে আসা হচ্ছিল। এই মাঝখানে বলা বাক্যটি ক্ষেত্র ও স্থান উভয় দিক দিয়ে এবং হাদীসের বর্ণনাসমূহের দৃষ্টিতেও প্রসঙ্গতঃ ভাবে বলা হয়েছে। যে সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এ সূরাটি নবী করীম (সঃ) কে পড়ে শুনাচ্ছিলেন, তখন পরে তা ভুলে না যান এই ভয়ে তিনি তার শব্দসমূহ স্বীয় মুবারক মুখে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছিলেন। এ হ'তে জানা যায়, এ ঘটনাটি সেই সময়ের যখন নবী করীম (সঃ) অহী নাযিল হওয়ায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছিলেন এবং অহী গ্রহণের অভ্যাস পুরোপুরিভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন হয়ে আসেনি কুরআন মজীদে এর আরও দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত সূরা ত্বা-হা-র। তাতে রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰىٓ اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

-'কুরআন পাঠে তুমি যেন তাড়াহুড়া না কর যতক্ষণ না তোমার প্রতি উহার অহী পূর্ণতায় পৌঁছিয়া যায়' (১১৪ নম্বর আয়াত)

আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সূরা আলা আ'লায়। তাতে নবী করীমকে (সঃ) সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এই বলেঃ

سنقرئك فلا تنسى

-'আমরা শীঘ্রই তোমাকে পড়াইয়া দিব। উহার পর তুমি উহা ভুলিয়া যাইবে না' (৬ নম্বর আয়াত)।

উত্তরকালে নবী করীম (সঃ) অহী গ্রহণে যথেষ্ট এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তখন আর এ ধরনের হেদায়াত দেয়ার কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট ছিল না। এ কারণেই কুরআনে এ তিনটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও এর অপর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরা হ'তে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলি সূরা আছে, তার অধিকাংশই বিষয়-বস্তু ও বাচনভঙ্গীর দৃষ্টিতে সেই সময়কালে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়, যখন সূরা মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কুরআন নাযিল হওয়ার ধারা বৃষ্টি বর্ষণের মত অব্যাহতভাবে পুনরায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরপর নাযিল হওয়া এ সূরাসমূহে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ও প্রভাবশালী পন্থায় অতীব ব্যাপক ও সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর সঙ্গে

ইসলাম ও তার মৌল আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক শিক্ষার আর্দশসমূহ পেশ করা হয়েছে। মক্কাবাসীদেরকে তাদের গুমরাহী সম্পর্কে প্রচন্ডভাবে সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছে। এ শুনে কুরাইশ সরদাররা ঘাবড়ে গেল এবং প্রথম হজ্জমৌসুম আসার পূর্বেই রসূলে করীম (সঃ)-কে বাধাগ্রস্থ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে তারা সম্মেলনে মিলিত হ'য়ে শলা-পরামর্শ করেছিল। এ সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর প্রথম আলোচনায় দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় পরকাল অবিশ্বাসী-অমান্যকারী লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে কথা বলা হয়েছে। তাতে তাদের এক একটা সন্দেহ ও প্রশ্ন-আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। খুবই অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাব্যতা সংগঠণ ও অপরিহার্যতা প্রকট ক'রে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট ক'রে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারাই পরকালকে অস্বীকার করে, তার আসল কারণ এ নয় যে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অসম্ভব মনে করে। তার আসল কারণ হ'ল এই-তাদের মনের কামনা-বাসনাই তা মেনে নিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়। এ প্রসঙ্গে লোকদেরকে সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো, সে সময়টি অবশ্যই আসবে। তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদের সম্মুখেই উদঘাটিত ক'রে দেয়া হবে। আর নিজ নিজ আমলনামা নিজ চোখে দেখার পূর্বেই প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতঃই জানে যে, সে দুনিয়ায় কি কর্ম ক'রে এসেছে। কেননা, কোন ব্যক্তিই নিজ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত নয়। দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এবং স্বীয় মনকে প্রবোধ দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় কাজ-কর্মের সমর্থনে যতই বাহানা দেখাতে চেষ্টা করুক না কেন, যতই যৌক্তিকতা দেখাক না কেন, নিজেকে চিনতে কারও দেরী হয় না, বাকী থাকে না।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় ও আসল বক্তব্য হ'ল দুনিয়ায় মানুষের প্রকৃত স্থান ও মর্যাদা (Position) সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি নিজেদের এ প্রকৃত স্থান ও মর্যাদার কথা হৃদয়ংগম ক'রে খোদার শোকর আদায়মূলক আচরণ অবলম্বন্ করে তাহলে তার পরিণতি অত্যন্ত কল্যাণময় হবে এবং কুফর ও অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক ও ধ্বংসমূলক। কুরআন মজীদের বড় বড় সূরাসমূহে এ বিষয়টি তো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু প্রাথমিককালের মক্কী পর্যায়ের সূরাসমূহের বিশেষ বাচনভংগী হ'ল, যেসব কথা পরবর্তীকালে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে তাই এ পর্যায়ে অতি সংক্ষেপে অথচ অতীব মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে হৃদয়-মনে দৃঢ় মূল করে দেয়া হয়েছে, এবং এমন ছোট ছোট বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে যে তা শ্রবণকারীদের খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেতে পারে।

এ সূরায় সর্বপ্রথম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের উপর দিয়ে এমন একটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে যখন তারা উল্লেখ্য কিছুই ছিল না। উত্তরকালে একটি সংমিশ্রিত শুক্র হতে তার অস্তিত্বের অত্যন্ত হীন সূচনা হয়েছিল। তখন তার গর্ভধারিণীও তার অস্তিত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার কথা জানতেও পারেনি। তখনকার সে অনুবীক্ষণী অস্তিত্ব দেখে তা কোন মানবীয় সত্তা এবং পরে এ পৃথিবীর বুকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হয়ে দাঁড়াবার মত কোন সত্তা বলে ধারণা হওয়াও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এর পর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ পন্থায় তোমার সৃষ্টি-কর্ম সুসম্পন্ন করে তোমাকে এখন যা কিছু বানিয়ে দিয়েছি তার পশ্চাতে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং সে উদ্দেশ্য হ'ল, আমরা তোমাদেরকে দুনিয়ায় রেখে তোমার পরীক্ষা নিতে চাই। এ কারণেই দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে কান্ডজ্ঞান ও চেতনাবিবেক সম্পন্ন বানানো হয়েছে এবং তোমার সম্মুখে শোকর ও কুফর এ দু'টি পথ সমানভাবে সুসমতল ও-সুগম করে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে! যেন এখানে কাজ করার যে অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা তোমাকে দেয়া হয়েছে তাতে এ পরীক্ষায় তুমি শোকরকারী বান্দাহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে, না কাফের বান্দাহ হয়ে,-তা তুমি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হও।

অতঃপর মাত্র একটি আয়াতে স্পষ্ট-অকাট্য নিয়মে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরীক্ষায় যারা কাফের প্রমাণিত হবে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

৫ নম্বর আয়াত থেকে ২২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে সে সব নি'আমতের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে, যা দিয়ে খোদার বন্দেগী পালনের দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় আদায়কারী লোকদেরকে ধন্য করা হবে। এসব আয়াতে তাদের কেবলমাত্র সর্বোত্তম শুভ প্রতিফলের কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়নি, সংক্ষেপে তাদের সেসব আমলের কথাও বলে দেয়া হয়েছে যার দরুন তারা এ নামের শুভ ফল পাওয়ার অধিকারী হবে। মক্কী পর্যায়ের প্রাথমিক সূরাসমূহের সর্বাধিক প্রকট ও স্পষ্ট বিশেষত্ব হ'ল, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বলার সংগে সংগে কোথাও ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্ববহ নৈতিক গুণাবলী ও নেক আমলসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, আর কোথাও যেসব খারাব আমল ও চরিত্র হতে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায় যে সবের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ দু'টি বিষয়ে ভাল বা মন্দ পরিণতি এ দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনে কি হবে সে দিক দিয়ে কিছুই বলা হয়নি; পরকালের চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনে তার স্থায়ী ফল ও পরিণতি কি হবে, সে দৃষ্টিতেই এ দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কোন খারাপ গুণ কল্যাণকর কিনা এবং কোন ভাল গুণ ক্ষতিকর কিনা সে প্রশ্ন এখানে তোলা হয়নি।

এ পর্যন্ত প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের উল্লেখ করা হ'ল। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। একটি হ'ল, তোমার প্রতি অল্প অল্প করে যে কুরআন মজীদ নাযিল করা হচ্ছে তা এই আমিই করছি, অন্য কেউ নয়। এ কথাটির আসল লক্ষ্য নবী করীম (সঃ)-কে নয়-কাফেরদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিজে কুরআন মজীদ মনগড়াভাবে রচনা করছেন না, তার নাযিল করার মূলে আমি রয়েছি-আমিই তা নাযিল করেছি এবং একেবারে নয় বারে বারে অল্প অল্প করে নাযিল করা আমার কর্মকৌশলেরই অনিবার্য দাবী। রসূলে করীম (সঃ) কে সম্বোধন করে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে, তা হ'ল তোমার খোদার ফয়সালা প্রকাশিত হতে যত বিলম্বই হোক এবং এ সময়ে তোমার উপর দিয়ে বিপদ-আপদের যে ঝড়-ঝঞ্ঝাই প্রবাহিত হোক, সর্বাবস্থায় তুমি পরমত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে থাকবে। এসব দুরাচার ও সত্য অমান্যকারী লোকদের কোন চাপের মুখে একবিন্দু নতি স্বীকার করবে না।

তাঁকে তৃতীয় কথা এ বলা হয়েছে যে, রাত দিন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। নামায পড় এবং রাত্রিকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত কর। কেননা, কুফরীর আকাশ-ছোঁয়া তুফানের বিরুদ্ধে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের দৃঢ়তা ও স্থিতি লাভের এটাই হ'ল একমাত্র উপায় ও অবলম্বন এর সাহায্যেই তা লাভ করা সম্ভব।

পরে একটি বাক্যে কাফেরদের ভুল আচার-আচরণের আসল কারণ বলে দেয়া হয়েছে। তা হ'ল, তারা পরকালকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে পড়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমরা নিজেরাই হয়ে যাওনি, আমরাই তোমাদরকে সৃষ্টি করেছি। চেপ্টা-চওড়া বুক ও দৃঢ় শক্ত বাহু ও হাত-পা তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে বানিয়ে লওনি। তার আসল নির্মাতা তো আমরাই। তোমাদের সাথে যে আচরণই আমরা করতে চাইব তা আমরা সহজেই করতে পারি, করার সাধ্য ও ক্ষমতা পুরোপুরিই আমাদের রয়েছে। আমরা তোমাদের আকার-আকৃতিসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিতও করতে পারি। তোমাদেরকে ধ্বংস করে অপর কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদেরকে মেরে পুনরায় যে আকার-আকৃতিতেই চাই, আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারি।

সর্বশেষে এই বলে কথা শেষ করা হয়েছে যে, এ হচ্ছে নসীহতের বাণী। এখন যার ইচ্ছা এ কবুল করে খোদাকে পাওয়ার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে পারে-তা তার করা উচিৎ। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের চাওয়াটাই আসল কথা নয়-তাই সব কিছু নয়। আল্লাহ-ই যদি না চাহেন, তা হলে মানুষের চাওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু

আল্লাহর চাওয়াও তো অন্ধ অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যদি কিছু চানই তা হলে তা স্বীয় 'ইলম্ ও বিশেষ কর্মকৌশলের ভিত্তিতে চান। সে 'ইলম ও কর্মকৌশলতার ভিত্তিতে যাকে তিনি তাঁর রহমত পাওয়ার উপযুক্ত মনে করবেন তাকে স্বীয় রহমতে শামিল করে নেবেন এবং যাকে তিনি তিনি যালেম দেখতে পান, তাঁর জন্যে তিনি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উৎপীড়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

সূরা আল–কিয়ামাহ্

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. না[১], আমি কসম খাইতেছি কিয়ামতের দিনের[২]।

২. আর না, আমি কসম খাইতেছি তিরস্কারকারী মনের[৩]।

৩. মানুষ কি মনে করিয়া বসিয়াছে যে, আমরা তাহার অস্থিগুলি একত্রিত করিতে পারিব না?

৪. – কেন নয়? আমরা তো তাহার অংগুলি গুলির গিড়া গিড়া পর্যন্ত যথাযথ বানাইয়া দিতে সক্ষম।

৫. কিন্তু মানুষ চায় যে, ভবিষ্যতেও কুকর্মসমূহ করিতে থাকিবে[৪]।

১। কথা শুরু করা হয়েছে 'না' দিয়ে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় পূর্ব হতে কোন কথা চলছিল, যে কথার প্রতিবাদে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখানে 'না' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে–'যা কিছু তোমরা বুঝছো তা ঠিক নয়, আমি শপথ করে বলছি– আসল কথা হচ্ছে এই।'

২। কিয়ামতের সংঘটন সুনিশ্চিত–তাই কিয়ামত আসার ব্যাপারে খোদ কিয়ামতেরই কসম খাওয়া হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব–ব্যবস্থা সাক্ষ্য দিচ্ছে–এ বিশ্ব অনাদিও নয়, চিরস্থায়ীও নয়। এই বিশ্ব এক সময় নাস্তি থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং এক সময় একে অবশ্য শেষ হতেই হবে।

৩। অর্থাৎ বিবেকের যা মানুষকে অন্যায়ের জন্যে তিরস্কার করে, এবং মানুষের মধ্যে যার বিদ্যমানতা; এই সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ নিজের কাজের জন্যে দায়ী–তার জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪। অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকার করার আসল কারণ হচ্ছে এই। এরূপ কোন যুক্তিগত ও জ্ঞান–গত প্রমাণ এর কারণ নয় যার ভিত্তিতে মানুষ বলতে পারে–কিয়ামত কিছুতে সংঘটিত হবে না বা কিয়ামতের সংঘটন অসম্ভব।

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨

চাঁদ আলোকহীনহবে এবং চক্ষু স্থীর হয়ে যাবে যখন অতঃপর কিয়ামতের দিন কবে সেজিজ্ঞেস করে

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠

পালাবার জায়গা কোথায় সেইদিন মানুষ বলবে চাঁদ ও সূর্য একত্রিত করাহবে এবং

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ

মানুষকে জানিয়েদেয়া হবে অবস্থানস্থল সেদিন তোমাররবের দিকে আশ্রয়স্থল নাই কক্ষণ না

يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ

তার নিজের সম্পর্কে মানুষ বরং পিছে ছেড়েছে এবং সে আগে পাঠিয়েছে যা ঐ বিষয়ে সেদিন

بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ

তোমার জিহ্বা এর সাথে নাড়াবে না তার অজুহাতসমূহ পেশ করে সে যদিও এবং খুব অবগত

لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦

এর সাথে তাড়াতাড়ির জন্যে

৬. জিজ্ঞাসা করেঃ 'আচ্ছা, কবে পর্যন্ত আসিবে সেই কিয়ামতের দিনটি?

৭. পরে দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হইয়া যাইবে।

৮. এবং চাঁদ আলোহীন হইয়া যাইবে

৯. এবং চাঁদ ও সূর্য মিলাইয়া একাকার করিয়া দেওয়া হইবে,

১০. তখন এই মানুষই বলিবেঃ কোথায় পালাইয়া যাইব?

১১. কক্ষণই নয় ! তথায় কোনই আশ্রয় স্থল হইবে না।

১২. সেই দিন তোমার খোদারই সম্মুখে যাইয়া অবস্থান গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩. সেই দিন মানুষকে তাহার আগের পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজেকে খুব ভালভাবে জানে,

১৫. সে যতই অক্ষমতা[৫] পেশ করুক না কেন।

১৬. –হে নবী[৬]। এই অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিয়া লওয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াইও না।

৫। অর্থাৎ মানুষের নামাযে আমল (কর্মতালিকা) তার সামনে পেশ করার আসল উদ্দেশ্য অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে জানানো নয়। প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূর্ণ হয় না- এ কারণেই এটা আবশ্যক। নতুবা প্রত্যেক–মানুষ খুব ভাল করেই জানে–সে নিজে কি।

৬। এখান থেকে আরম্ভ করে পরে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্বে" রহিয়াছে পর্যন্ত সমস্ত কথাই মাঝখানে বলা একটা কথা। পূর্ব থেকে বলে আসা কথার ধারাবাহিকতা ভংগ করে নবীকে সম্বোধন করে এ কথাটি বলা হয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) যখন হযুরকে এ সূরা শুনাচ্ছিলেন সে সময় তিনি 'পাছে ভুলে না যাই' –এই আশংকায় যবান দ্বারা তা পুনঃ আবৃত্তির চেষ্টা করছিলেন।

১৭. উহা মুখস্ত করাইয়া দেওয়া ও পড়াইয়া দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

১৮. কাজেই আমরা যখন উহা পড়িতে থাকি, তখন তুমি উহার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাক।

১৯. পরে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রহিয়াছে।

২০. কক্ষণ–ও নয়[৭] আসল কথা হইল, তোমরা খুব দ্রুত ও অবিলম্বে অর্জনযোগ্য জিনিস (অর্থাৎ ইহজগত)-কে ভালবাস,

২১. আর পরকালকে উপেক্ষা কর।

২২. সেই দিন কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল সুস্মিত হইবে,

২৩. নিজেদের খোদার দিকে দৃষ্টিমান হইবে।

২৪. আর কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উদাস–ম্লান হইবে।

২৫. মনে করিতে থাকিবে যে, তাহাদের সহিত কোমর চূর্ণকারী আচরণ করা হইবে।

২৬. কক্ষণও নয়[৮]। প্রাণ যখন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে,

২৭. এবং বলা হইবে যে, ঝাড়–ফুঁক দেওয়ার কেহ আছে কি?

২৮. মানুষ মনে করিবে, দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইহাই সময়।

৭। মাঝখানে বলা কথা শেষ হয়ে যাবার পর আবার পূর্ব প্রসংগের সংগে ভাষণের ধারাবাহিকতা যুক্ত হয়েছে। এখানে 'কক্ষণ–ও–নয়' –কথাটির তাৎপর্য হলো বিশ্ব লোকের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে তোমরা কিয়ামত সৃষ্টি করতে ও মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম মনে করার কারণে যে পরকালকে অস্বীকার করছো তা নয়। বরং আসল কারণ হলো এই।

৮। উপর থেকে চলে আসা ভাষণের প্রসংগের সংগে এই 'কক্ষণ–ও নয়' কথাটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ 'তোমরা মৃত্যুতে নাস্তি হয়ে যাবে নিজেদের প্রভুর সমীপে ফিরে যেতে হবেনা' –তোমাদের এ ধারণা মিথ্যা।

২৯. আর পা পায়ের সাথে জড়াইয়া যাইবে।

৩০. সেই দিনটি হইবে তোমার খোদার পানে যাত্রা করার

৩১. কিন্তু সে সত্য না মানিয়া লইল, না নামায পড়িল;

৩২. বরং সত্যকে মিথ্যা মনে করিল এবং ফিরিয়া গেল।

৩৩. পরে অহমিকতা সহকারে নিজের ঘরের লোকদের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল।

৩৪. এইরূপ আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়।

৩৫. হ্যাঁ, এই আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়।

৩৬. মানুষ কি মনে করিয়া লইয়াছে যে, তাহাদিগকে এমনিতেই[১] ছাড়িয়া দেয়া হইবে?

৩৭. সে কি নিকৃষ্টতম পানির একটি শুক্র ফোঁটা ছিল না, যাহা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়?

৩৮. পরে উহা একটি মাংসপিন্ড হইল। পরে আল্লাহ উহার দেহ বানাইলেন, উহার অংগ-প্রত্যংগ সুসমান ও সংগতিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

৩৯. পরে উহা হইতে পুরুষ ও নারী দুই ধরণের (মানুষ) বানাইলেন।

৪০. এই খোদা কি মৃতদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

১। মূল سدى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সেই উটকে 'ইবিলুন সুদা' বলা হয় যা এমনি ছাড়া থাকে, যেদিকে ইচ্ছা বিচরণ করে, কেউ তার তত্ত্বাবধায়ক বা দেখাশুনা করার থাকে না। আমরা 'লাগামহীন উট'-কথাটি এই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি।

সূরা আদ-দাহর

নামকরণ

এ সূরাটির একটি নাম الدهر আর একটি নাম الانسان- এ দু'টি নামই এর প্রথম আয়াত হতে গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, এ সূরাটি মক্কী। আল্লামা জামাখশারী, ইমাম রাযী, কাযী বাইযাবী, আল্লামা নিযামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেজ ইবনে কাসীর ও অন্যান্য বহু তফসীরকার-ই লিখেছেন, এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আ'লুমী'র মতে এটাই সর্বসাধারণ সমর্থিত কথা। কিন্তু অন্যান্য কিছু সংখ্যক তফসীরকার গোটা সূরাটিকেই 'মদীনী' বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সূরাটি আসলে তো মক্কী, তবে ৮-১০ নম্বর আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছিল।

সূরাটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বাচনভংগী হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বরং বিষয়টি গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এ কেবল মক্কী-ই নয়, মক্কাশরীফেও এ নাযিল হয়েছিল। সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর প্রাথমিক সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়। ৮-১০ নম্বর আয়াতে - অর্থাৎ ويطعمون الطعام হতে يوما عبوسا قمطريرا পর্যন্ত- সমগ্র সূরার বর্ণনা ধারাবাহিকতায় পুরোপুরি সংগতির সঙ্গে মিলে-মিশে আছে। পূর্বাপর সহকারে তা পাঠ করলে তার পূর্বের ও পরের কথা ১৫-১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং তার এত বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে ইচ্ছামত বসিয়ে দেয়া হয়েছে- এমন কথা আদৌ মনে হয় না।

এ সূরাটিকে কিংবা এর কোন কোন আয়াতকে 'মদীনী' মনে করার কারণ হ'ল হাদীসের একটি বর্ণনা। আতা ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত হাসান ও হোসাইন একবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ) এবং বহু সংখ্যক সাহাবী তাদেরকে দেখবার জন্যে উপস্থিত হলেন। কোন কোন সাহাবী হযরত 'আলী (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন, আপনি বাচ্চা দু'টির নিরাময়তার জন্যে আল্লাহর নামে কিছু মানত করুন। এ পরামর্শনুযায়ী হযরত 'আলী, হযরত ফাতিমা এবং তাদের সেবিকা 'ফিযযা' (রা) মানত করলেন এই বলে যে, আল্লাহ বাচ্চা দু'টির রোগ সারিয়ে দিলে এ তিনজন তার শোকর স্বরূপ তিনটি রোযা রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন, দুটি বাচ্চাই সুস্থ ও নিরাময় হয়ে গেলেন। ফলে এ মানতকারী তিনজন-ই এক সংগে মানতের রোযা রাখতে শুরু করলেন। হযরত আলীর ঘরে আহার্য কিছুই ছিল না। তারা কিছু পরিমাণ গম ধার স্বরূপ গ্রহণ করলেন (একটি বর্ণনা মতে শ্রম করে মজুরীস্বরূপ উপার্জন করলেন)। প্রথম রোযাটির ইফতার করে তারা যখন খেতে বসলেন, তখন একজন মিসকিন এসে খাবার চাইল। তাঁরা সমস্ত আহার্য ভিখারীকে দিয়ে দিলেন, আর নিজেরা পানি পান করে শুয়ে রইলেন। দ্বিতীয় রোযার ইফতার করার পর খাবার খেতে বসলে একটি এতীম এসে খাবার চাইল। সেদিনও সমস্ত খাবার তাঁরা তাকে দিয়ে দিলেন এবং পানি পান করে শুয়ে থাকলেন। তৃতীয় দিন রোযা খুলে খেতে বসেছেন এমন সময় একজন 'কয়েদী' খাবার চাইল। তাঁরা সমস্ত খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। চতুর্থ দিনে হযরত আলী (রাঃ) বাচ্চা দু'জনকে সংগে নিয়ে রসূলে করীমের (সঃ) খেদমতে হাজির হলেন। তিনি দেখতে পেলেন, পিতা-পুত্র তিনজনই ক্ষুধার তীব্র দুঃসহ যাতনায় জর্জরিত। তিনি তাদেরকে সংগে নিয়ে হযরত ফাতিমার ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ঘরের এক কোণে পড়ে ক্ষুধায় ছটফট করছেন। এ অবস্থা দেখে রসূলে করীম (সঃ) কান্নাভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেনঃ গ্রহণ করুন, আল্লাহ'আলা আপনার ঘরের লোকদের প্রতি মোবারকবাদ জানিয়েছেন। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেটা কি? এর জবাবে হযরত জিবরাঈল এই গোটা সূরা পাঠ

করে তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। (ইবনে সিহ্‌ব্যানের বর্ণনায় বলা হয়েছে, ان الابرار يشربون হতে শেষ আয়াত পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক ইবনে 'আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ويطعمون الطعام আয়াতটি হযরত 'আলী ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ঘটনার তাতে উল্লেখ নেই। 'আলী ইবনে আহমাদ আল্-ওআহেদী তাঁর تفسير البسيط গ্রন্থে এ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন। জামাখ্‌শারী, রাযী ও নীশাপুরী প্রমুখ সম্ভবতঃ এ হতেই এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন।')

ওপরে উদ্ধৃত এ বর্ণনাটি সনদের বিচারে অত্যন্ত দুর্বল, গ্রহণ অযোগ্য। বৈজ্ঞানিক ও বিবেক-বুদ্ধি বিচারে প্রশ্ন উঠে, একজন মিসকীন, একটি এতীম ও একজন কয়েদী খাবার চাইলে ঘরের পাঁচ ব্যক্তির জন্য তৈরী আহার্য সম্পূর্ণ রূপে তাকে দিয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? একজন লোকের খাবার প্রার্থীকে দিয়ে অবশিষ্ট চারজনের খাবার পাঁচজনে মিলে খেয়ে অতি সহজেই পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারতেন, ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত থাকার কোন কারণই থাকতে পারে না। এতদ্ব্যতীত সদ্য রোগমুক্ত অতিশয় দুর্বল নিঃশক্তি দুজন বালককে ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত ও ক্ষুধা কাতর করে রাখাকে হযরত 'আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-র ন্যায় দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয় সওয়াবের কাজ মনে করতে পারেন, তা বোধগম্য হতে পারে না। উপরন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কয়েদীকে ভিক্ষা চাইবার জন্যে ছেড়ে দেয়ার নিয়ম কখনই ছিল না। কয়েদী সরকারী ব্যবস্থাধীন থাকলে সরকারই তার খাওয়া পরার জন্য দায়ী হ'ত। কোন ব্যক্তির উপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলে, সেই ব্যক্তিই তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী থাকতো। এ কারণে মদীনা শরীফের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন কয়েদীর ভিক্ষা করার জন্যে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। মন্দ ও যৌক্তিক বিচারে ধরা পড়া এই সব দুর্বলতা বাদ দিয়ে এই গোটা কাহিনীকে সত্য ও সঠিক মেনে নিলেও তাতে বেশীর পক্ষে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ঘরের লোকদের দ্বারা যখন এরূপ একটি তুলনাহীন মানবতাবাদী ঘটনা সংঘটিত হ'ল তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলে করীম (সঃ)-কে তাঁর ঘরের লোকদের এ মহতি কাজটি মহান আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে সুসংবাদ দিলেন। কেননা, তাঁরা যে মহান নেক কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন সূরা 'দাহর'-এর আলোচ্য আয়াত ক'টিতে তারই প্রশংসা করেছেন ও শুভ প্রতিফলের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ আয়াত ক'টিও এ ঘটনার উপলক্ষে নাযিল হয়েছে বলে কিছুতেই মনে করা যেতে পারে না। 'শানে নুযুল' পর্যায়ে বর্ণিত অনেক ঘটনার অবস্থাই এরূপ। কোন আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, এ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তখন তার অর্থ এই হয় না যে, এ ঘটনাটি যখন সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। তার অর্থ হয়, এ আয়াত এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে বা তা এ ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। ইমাম 'সূয়ূতি তাঁর আল্-ইত্‌কান গ্রন্থে হাফেয ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেনঃ বর্ণনাকারী যখন বলে, এ আয়াত অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কখনও তার অর্থ হয়, এ ঘটনাই তার নাযিল হওয়ার কারণ; আর কখনও তার তাৎপর্য হয়, এ ব্যাপারটি এ আয়াতের ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত, যদিও তার নাযিল হওয়ার এটাই কারণ নয়। পরে তিনি ইমাম বদ্‌রুদ্দীন যারকাশী লিখিত 'আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' 'গ্রন্থ' হতে তাঁর এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ সাহাবী ও তাবেঈন-এর প্রচলিত ও সর্বজন পরিচিত অভ্যাস ছিল, তাঁদের মধ্যে হতে কেহ যখন বলতেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের ঘোষণা এ ব্যাপারের ওপর খাটে। এ ঘটনার কারণেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে, এমন অর্থ বুঝায় না। আসলে এর তাৎপর্য হয়, এ আয়াতটির ঘোষণা দ্বারা এ বিষয়ের দলীল পেশ করা যায়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ, তা নয়।
খন্ড ১: পৃষ্ঠা ১৩)

সূরা আদ–দাহর

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১. মানুষের উপর কি সীমাহীনকালের একটা সময় এমন-ও অতিবাহিত হইয়াছে, যখন তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না[১]?

২. আমরা মানুষকে এক সংমিশ্রিত শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন আমরা তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারি। আরও এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তাহাদিগকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন বানাইয়াছি[২]।

৩. আমরা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছি- ইচ্ছা হইলে শোকরকারী হইবে; কিংবা হইবে কুফরকারী[৩]।

১। উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে এ কথার স্বীকৃতি আদায় করা যেঃ হাঁ তার উপর দিয়ে এরূপ এক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এছাড়া তাকে এ চিন্তা করতে বাধ্য করা যে- যদি এর পূর্বে তাকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা হয়ে থাকে, তবে তার পক্ষে দ্বিতীয় বার পয়দা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

২। অর্থাৎ তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছি।

৩। অর্থাৎ অবাধ্যতা-অকৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করার স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে অবাধ্যতা-অকৃতজ্ঞতার পথ কোনটি ও কৃতজ্ঞতার পথ কোনটি।

৪. কুফরকারীদের জন্য আমরা শিকল, কন্ঠকড়া ও দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৫. নেক্কার লোকেরা (জান্নাতে) শরাবের এমন সব পাত্র পান করিবে যাহার সহিত কর্পূর সংমিশ্রণ হইবে।

৬. ইহা একটি প্রবহমান ঝর্ণা হইবে, যাহার পানির সংগে আল্লাহর বান্দাহরা শরাব পান করিবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই উহার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া লইবে।

৭. ইহারা সেই লোক হইবে যাহারা (দুনিয়ায়) মানত[৪] পূরণ করে, এবং সেই দিনটিকে ভয় করে যাহার বিপদ সর্বত্র বিস্তৃত হইবে,

৮. এবং আল্লাহর ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়।

৯. (আর তাহাদিগকে বলে,) আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহর জন্যই খাওয়াইতেছি। আমরা তোমাদের নিকট হইতে না কোন প্রতিদান চাহি, না কৃতজ্ঞতা।

৪। 'মানত' অর্থ খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফরযের অতিরিক্ত কোন সৎকার্য সম্পন্ন করার জন্যে খোদার কাছে প্রতিশ্রুতি দান করা।

১০. আমরা তো খোদার প্রতি সেই দিনের আযাবের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, যে দিনটি কঠিন বিপদের অতিশয় দীর্ঘ দিন হইবে।

১১. অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তাহাদিগকে সেই দিনের অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে সতেজতা ও আনন্দ-সুখ দান করিবেন।

১২. আর তাহাদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতার[৫] বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করিবেন।

১৩. তথায় তাহারা উচ্চ আসন-সমূহে ঠেশ দিয়া বসিবে। তাহাদিগকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করিবে, না শীতের প্রকোপ।

১৪. জান্নাতের ছায়া তাহাদের উপর অবনত হইয়া থাকিবে এবং উহার ফলসমূহ সর্বদা তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকিবে (তাহারা ইচ্ছামত উহা পাড়িতে পারিবে)।

৫। ঈমান আনার পর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খোদার আদেশ-নিষেধ পালন করার এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার অর্থে এখানে 'সবর' (ধৈর্য-সহিষ্ণুতা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দ - ৯/২২

১৫. তাহাদের সম্মুখে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হইবে। সেই কাঁচ যাহা রৌপ্য জাতীয় হইবে[৭]

১৬. এবং সেগুলিকে (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মত ভর্তি করিয়া রাখিবে।

১৭. তাহাদিগকে তথায় এমন সূরা পান করানো হইবে যাহাতে শুঁটের সংমিশ্রণ থাকিবে[৮]।

১৮. ইহা হইবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, উহাকে 'সাল্‌সাবীল' বলা হয়।

১৯. তাহাদের সেবাকার্যে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিতে থাকিবে যাহারা চিরকালই বালক থাকিবে। তোমরা তাহাদিগকে দেখিলে মনে করিবে, ইহারা যেন মুক্তা-ছড়াইয়া দেওয়া।

২০. তথায় যেদিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, শুধু নি'আমত আর নি'আমতই- এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তুমি দেখিতে পাইবে।

৬। সূরা যুখরুফের ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছে তাদের সামনে স্বর্ণপাত্র আবর্তিত করানো হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল কখনও সেখানে স্বর্ণপাত্র ব্যবহৃত হবে এবং, কখনও রৌপ্য পাত্র।

৭। অর্থাৎ রৌপ্য নির্মিত হবে, কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ ঝকঝকে।

২১. তাহাদের উপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোষাক, কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকিবে। তাহাদিগকে রৌপ্যের কংকন[৯] পরানো হইবে এবং তাহাদের খোদা তাহাদিগকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাইবেন।

২২. ইহাই হইল তোমাদের শুভ প্রতিফল। আর তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবানরূপে গৃহীত হইয়াছে।

২৩. হে নবী! আমরাই তোমার প্রতি এই কুরআন অল্প-অল্প করিয়া নাযিল করিয়াছি[১০]।

২৪. অতএব তুমি তোমার খোদার আদেশ-নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ কর[১১]। আর ইহাদের মধ্য হইতে কোন দুষ্কৃতিকারী কিংবা সত্য অনান্যকারীর কথা মানিও না।

২৫. তোমার খোদার নাম সকাল সন্ধ্যা স্মরণ কর।

৮। আরববাসীরা মদের সংগে শুটমিশ্রিত পানির সংমিশ্রণ খুব পছন্দকরতো। এ কারণে বলা হয়েছে তাদের সেখানে সেই ধরনের শরাব পান করানো হবে যাতে শুটের সংমিশ্রণ থাকবে।

৯। সূরা হজ্জের ২৩নং আয়াত ও সূরা ফাতেরের ৩৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে তাদের সোনার কংকন পরানো হবে। এর থেকে জানা গেল তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী কখনও সোনার কংকন পরিধান করবে, কখনও রূপার কংকন পরিধান করবে এবং কখনও উভয়কে মিলিয়ে পরিধান করবে।

১০। এখানে বাহ্যতঃ নবীকে (সঃ) সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে কাফেরদের একটি আপত্তির উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা বলতো – 'মুহাম্মদ (সঃ) চিন্তা ক'রে ক'রে এই কুরআন নিজে রচনা করেছে, যদি সেরূপ না হ'য়ে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে কোন আদেশ অবতীর্ণ হ'তো তবে তা একসংগে একত্রে অবতীর্ণ হ'তো।

১১। অর্থাৎ তোমার প্রভু যে মহান কাজের দায়িত্বে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, সে পথের কাঠিন্যে ও বিপদ আপদে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। যা কিছু ঘটুক না কেন অবিচলভাবে তা সহ্য ক'রে যাও কোন ক্রমেই বিচলিত ও পদস্খলিত হ'য়োনা।

২৬. রাত্রেও তাহার সমীপে সিজদায় অবনত হও, আর রাত্রির দীর্ঘ সময়ে তাঁহার তস্‌বীহ করিতে থাক[১২]।

২৭. এই লোকেরা তো দ্রুত অর্জিতব্য জিনিস, (বৈষয়িক স্বার্থ) ভালবাসে। আর পরে যে ভয়াবহ দিন আসিতেছে উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

২৮. আমরাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের জোড়াসমূহ মজবুত করিয়া দিয়াছি। আমরা যখনই চাহিব, তাহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া ফেলিব।

২৯. ইহা একটি নসীহত বিশেষ। এক্ষণে যাহার ইচ্ছা নিজের খোদার নিকট যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করিতে পারে।

১২। যখন সময় নির্ধারণসহ আল্লাহর 'যিক্‌রের' কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ– নামায। আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে– "তোমরা খোদার নাম সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ কর"। আরবী ভাষায় 'বোক্‌রা' উষাকালকে বলা হয়। আর 'আসিলা' শব্দটি মধ্যাহ্ন সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত সময় বুঝায়। যোহর ও আসরের সময় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর বলা হয়েছেঃ 'রাত্রেও তাঁহার সমীপে সিজদায় অবনত হও'। রাত্রিকাল সূর্যাস্তের পর শুরু হয়। সুতরাং রাত্রিকালে 'সিজদা করার নির্দেশের মধ্যে মাগরিব ও এশা এই দুই ওয়াক্তের নামায অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর বলা হয়েছে, 'রাত্রির দীর্ঘ সময়ে তাঁহার তসবীহ্ করিতে থাক' –এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে।

৩০. আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ চাহিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।

৩১. স্বীয় রহমতের মধ্যে যাহাকে চাহেন গ্রহণ করেন। আর যালেমদের জন্য তিনি বড় পীড়াদায়ক আযাব নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সূরা আল-মুরসালাত

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ المرسلت কেই এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার গোটা বিষয়বস্তু হতেই এ কথা প্রকাশ পায় যে, এ সূরাটি মক্কাশরীফের প্রাথমিক পর্যায়েই নাযিল হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দু'টি সূরা, সূরা আল কিয়ামাহ্ ও সূরা দাহর এবং এর পরবর্তী দু'টি সূরা-নাবা ও সূরা নাযিয়াত এক সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা হলে স্পষ্ট মনে হয়, এ সব ক'টি সূরা-ই একই সময়-কালে অবতীর্ণ এবং এ সূরা ক'টির মাধ্যমে মূলতঃ একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে লোকদের মনে দৃঢ়মূল ক'রে দিতে চাওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও পরকাল-প্রমাণ এবং এসব মহা সত্য অস্বীকার করা ও মেনে নেয়ার যে ফলশ্রুতি অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে, সে বিষয়ে সকলকে অবহিত করা।

প্রথম সাতটি আয়াতে বায়ু-ব্যবস্থাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত ক'রে এ মহা সত্য উৎঘাটিত করতে চাওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও মুহাম্মদ (সঃ) যে কিয়ামতের দিনের আগমনের আগাম সংবাদ দিচ্ছেন তা অবশ্যই আসবে, অনিবার্য রূপেই সংঘটিত হবে। তা অমোঘ, তা থেকে নিষ্কৃতি নেই'। এ যুক্তিটির বিশ্লেষণ এই যে, যে মহা শক্তিমান সত্তা পৃথিবীর ওপর এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা সংস্থাপিত করেছেন, কিয়ামত সৃষ্টি করতে সেই মহাশক্তি কিছুমাত্র অক্ষম ও অসমর্থ হতে পারেন না। এতে একটা সুস্পষ্ট কর্মকুশলতা ও যৌক্তিকতা পরিদৃশ্যমান। পরকাল যে অবশ্যই হবে, হওয়া একান্তই অনিবার্য, এ তারই অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা সুবিজ্ঞানী ও কুশলী সত্তার কোন কাজই অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হ'তে পারে না। পরকাল সংঘটিত না হলে এই গোটা বিশ্বলোক-কারখানাটি নিতান্তই অর্থহীন ও তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।

মক্কাবাসীরা বার বার বলতো, তুমি যে কিয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো তাকে এনে আমাদের দেখাও। তা দেখালেই আমরা তার বাস্তবতা মেনে নেব। ৮-১৫ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে তাদের এ আবদারের কথা উল্লেখ না ক'রে এর জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তা কোন খেলা-তামাসার ব্যাপারতো নয়। কোন অর্বাচীন তা দেখবার আবদার করলেই তৎক্ষণাৎ তা ঘটিয়ে দেখানো যেতে পারে না। মূলতঃ তা সমগ্র মানবজাতি ও প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষের সব মামলা-মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচারের দিন। তার জন্যে আল্লাহতা'আলা একটা বিশেষ দিন বহু পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তা সেই পূর্বনির্দিষ্ট সময়ই সংঘটিত হবে। আর যখন সংঘটিত হবে, তখন তা এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হ'য়ে আসবে যে, আজ যারা তামাসাচ্ছলে তার জন্যে আবদার করছে, তখন তারা দিশেহারা হ'য়ে যাবে। তারা যে রসূলগণের আজকের দিনে দেয়া আগাম সংবাদকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মিথ্যা মনে ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছে কিয়ামতের দিন সেই রসূলগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তাদের মামলার ফয়সালা করা হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন কেমন ক'রে সুসম্পন্ন ক'রে নিয়েছে তা সেদিন সুস্পষ্টরূপে জানা যাবে।

১৬-২৮ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও পরকাল সংঘটিত হওয়ার ও তার অনিবার্যতার দলীল প্রমাণ উল্লেখিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তাদের নিজেদের জন্ম, এবং যে জমির ওপর তারা জীবন-যাপন করছে তার নির্মাণ প্রক্রিয়া অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কিয়ামত হওয়া এবং পরকালীন জীবন সংঘটিত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি আল্লাহ্র সৃষ্টি কুশলতার অনিবার্য দাবীও তা।

মানবীয় ইতিহাস হ'তে জানা যায় যে, যে জাতিই পরকাল অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, ধ্বংসের মুখে পৌছেছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পরকাল এক মহাসত্য। কারও জীবন-ধারা ও আচার-আচরণ তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হ'লে, তার অনিবার্য পরিণতি হবে সেই অন্ধের ন্যায় যে সম্মুখদিক হ'তে দ্রুত বেগে আগমণকারী রেলগাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছে। এর আরও একটা তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্বলোক-রাজ্যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আইনেরই (Physical Laws) রাজত্ব নয়। সে সঙ্গে একটা নৈতিক বিধান (Moral Law) পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়ে আছে। আর এ আইনের কারণে এ দুনিয়ায়ও কার্যফল প্রদানের রীতি সদা কার্যরত হ'য়ে চালু রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ার জীবনে এ কার্যফল প্রদান-রীতিটি পূর্ণাংগভাবে সংঘটিত হয় না। এ কারণে বিশ্বলোকে বিরাজিত নৈতিক বিধানের অনিবার্য দাবী হ'ল, এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন তা পুরোপুরিভাবে কার্যকর হবে। যেসব ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল এ দুনিয়ায় পূর্ণমাত্রায় দেয়া হয়নি-দেয়া যেতে পারে না, তা সে সময় পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যারা এখানে অপরাধের শাস্তি পাওয়া হ'তে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে, তারা সকলেই সেখানে পুরো মাত্রার শাস্তি পেয়ে যাবে। আর এ জন্যেই এখানে মৃত্যু সংঘটিত হবার পর আর একটা জীবন হওয়া একান্তই অপরিহার্য। এ দুনিয়ায় মানুষের জন্ম যেভাবে সংঘটিত হয়, তা গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করলে এ কথা অস্বীকার করা কারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না যে, যে খোদা একটা নগণ্যসামান্য ফোঁটা শুক্র হ'তে শুরু করে একটা পূর্ণাবয়ব মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন সে খোদার পক্ষে সে মানবদেহটিকে পুনরায় বানিয়ে দেয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়; বরং পুরোপুরি সম্ভব। মানুষ যে যমীনে সারাটি জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সে মানব দেহের অংশসমূহ এই যমীন ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। তার এক একটা বিন্দু এ পৃথিবীতেই বর্তমান থাকে। এ যমীনের সম্পদ ও উপকরণ হ'তেই তা গড়ে উঠে, লালিত-পালিত ও স্ফীতি-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পরে তা এ যমীনেরই ভান্ডারে সঞ্চিত হ'য়ে যায়। যে খোদা প্রথমে তাকে এ যমীনের ভান্ডার সমূহ হ'তে বের ক'রে এনেছিলেন, তা এখানে সঞ্চিত হবার পর তাকে পুনরায় বের ক'রে আনা সেই খোদার পক্ষে কোনই কঠিন কাজ নয়। খোদার অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে এ যে কিছুমাত্র কঠিন নয়, তা খোদার কুদরত চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। যে খোদা পৃথিবীতে মানুষকে কর্মের যে ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রয়োগের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা মানুষ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছে, না ভুল ভাবেও ভুল পথে ব্যবহার করেছে, তার পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ ও যাচাই-পরখ করা আল্লাহর কর্মকুশলতা ও যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে একান্তই অপরিহার্য। এ হিসাব-নিকাশ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া কোনক্রমেই যুক্তি সংগত বিবেচিত হতে পারে না।

এর পর ২৮-৪০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে পরকাল অমান্যকারীদের এবং ৪১-৪৫ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে পরকাল বিশ্বাস ক'রে তাকে বিপদ মুক্ত করার জন্যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায়ই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকারী লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেসব আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণ অত্যন্ত খারাব, তা দুনিয়ায় সুখ-শান্তি বিধানে যতই সহায়ক হো'ক, পরকালের দিক দিয়ে তা অত্যন্ত মারাত্মক,-তা যারা পরিহার ক'রে চলেছে, তাদেরও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির কথা এ প্রসংগেই বলা হয়েছে।

সূরার শেষভাগে পরকাল অমান্যকারী ও খোদার বন্দেগী বিমুখ লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যত ইচ্ছা স্বাদ আস্বাদন ক'রে নাও, আনন্দ-স্ফূর্তি ক'রে নাও তোমাদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মারাত্মক হবে। আর কথা শেষ করা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআন হ'তেও যে লোক হেদায়াত পেল না, তাকে হেদায়াত দিতে পারে এমন কোন জিনিসই এ দুনিয়ায় নেই।

সূরা আল–মুরসালাত

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ্'র নামে

১. শপথ সেই (বাতাস সমূহের), যারা পর পর ও ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়,

২. পরে প্রচন্ড ঝড়ের বেগে চলিতে থাকে

৩. এবং (মেঘমালাকে) উর্ধে লইয়া (মহাকাশে) ছড়াইয়া দেয়।

৪. পরে (উহাকে) টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া আলাদা করিয়া দেয়,

৫. পরে (লোকদের মনে খোদার) স্বরণ জাগাইয়া দেয়

৬. ওযর হিসাবে, কিংবা ভয় প্রদর্শন রূপে[১]।

৭. তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হইতেছে, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে[২]।

১। অর্থাৎ কখনও বাতাস রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ও দূর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় মানুষের অন্তর দ্রবীভূত হয় ও তারা অনুতাপ-অনুশোচনাসহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ও তাদের পাপ ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে শুরু করে; আর কখনও এই বাতাস আল্লাহর করুণায় যখন বৃষ্টি আনয়ন করায় লোকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আবার কখনও এই বাতাসের প্রবল ঝটিকার প্রচন্ডতা দেখে মানুষের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

২। অর্থাৎ বাতাসের এই ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দেয়–এক সময় কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। বাতাস যদিও সৃষ্টির জীবন রক্ষার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, কিন্তু আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন এই বাতাসকেই ধ্বংসের কারণ স্বরূপ করতে পারেন, এবং তা ক'রে থাকেন।

৮. পরে যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হইয়া যাইবে,

৯. আকাশ বিদীর্ণ করা হইবে,

১০. পাহাড় ধুনিয়া ফেলা হইবে

১১. এবং রসূলগণের উপস্থিতির সময় আসিয়া পড়িবে[৩]

১২. (সেই দিনই সে জিনিস সংঘটিত হইবে)। কোন্ দিনের জন্য এই কাজটি তুলিয়া রাখা হইয়াছে?

১৩. চূড়ান্ত বিচার ফয়সালার দিনের জন্য।

১৪. সেই ফয়সালার দিনটি কি, তাহা কি তোমার জানা আছে?

১৫. সেই দিন চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হইবে অমান্যকারী লোকদের জন্য।

১৬. আমরা কি আগের কালের লোকদিগকে ধ্বংস করি নাই?

১৭. পরে উহাদের পিছনে আমরা পরবর্তী লোকদিগকে চালাইয়া দিব।

১৮. অপরাধীদের সহিত আমরা এইরূপ আচরণই গ্রহণ করিয়া থাকি।

৩। মহান কুরআনের মধ্যে কয়েক স্থানে এ কথা বলা হয়েছে যে-হাশরের ময়দানে মানব জাতির মকদ্দমা যখন খোদার আদালতে পেশ হবে তখন সাক্ষ্যদানের জন্য প্রত্যেক মানব গোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত রসূলকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত করা হবে, এবং রসূল সাক্ষ্য দান করবেন যে-আল্লাহর পয়গাম তিনি তাদের নিকট পৌছে দিয়েছেন।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (১৯) اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ (২০)

ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য নাই কি আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করি থেকে পানি তুচ্ছ

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ (২১) اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (২২)

অতঃপর তা আমরা আটকে রেখেছি মধ্যে স্থানের সংরক্ষিত পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ (২৩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

অতএব আমরা ক্ষমতাবান ছিলাম অতএব কত উত্তম ক্ষমতার অধিকারী ধ্বংস সেদিন

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (২৪) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا (২৫) اَحْيَآءً وَّ

মিথ্যারোপকারীদের জন্যে নাই কি সৃষ্টি করি আমরা পৃথিবীকে ধারণকারীরূপে জীবিতদের ও

اَمْوَاتًا (২৬) وَّ جَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسْقَيْنٰكُمْ

মৃতদের এবং আমরা বানিয়েছি তার মধ্যে পর্বতমালা সুদৃঢ় উচ্চ ও তোমাদেরকে পান করিয়েছি

مَّآءً فُرَاتًا (২৭)

পানি সুমিষ্ট

১৯. ধ্বংস নিশ্চিত সেই দিন অমান্যকারীদের জন্য[৪]।

২০. আমরা কি নগণ্য–সামান্য পানি হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করি নাই?

২১–২২. একটা নির্দিষ্ট সময়–কাল পর্যন্ত উহাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে কি আটক করিয়া রাখি নাই?

২৩. লক্ষ্য কর, আমরা এইরূপ করিতে ক্ষমতাবান ছিলাম। অতএব, মনে রাখিও, আমরা অতীব উত্তম ক্ষমতার অধিকারী।

২৪. ধ্বংস সেই দিন অমান্যকারী–অবিশ্বাসীদের জন্য[৫]।

২৫. আমরা কি পৃথিবীকে সামলাইয়া গুটাইয়া রাখিতে সক্ষম বানাই নাই,

২৬. জীবিতদের জন্যও, মৃতদের জন্যও?

২৭. আর উহাতে উচ্চশির পর্বতমালা গাড়িয়া শক্ত করিয়া বসাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদিগকে সুমিষ্ট পানি পান করাইয়াছি।

৪। এখানে এ বাক্যাংশের অর্থ–দুনিয়াতে তাদের যা পরিণাম ঘটেছে অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের উপর আসল শাস্তি বা ধ্বংস তো পরকালে শেষ সিদ্ধান্তের দিনে অবতীর্ণ হবে।

৫। অর্থাৎ মৃত্যুপর জীবনের সম্ভাবনার এই সুস্পষ্ট যুক্তি–প্রমাণ সামনে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা আজ তাকে মিথ্যা বলছে সেদিন তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ

ধ্বংস | সেদিন | মিথ্যারোপকারীদের জন্যে | তোমরা চলো | (তার) দিকে | যা | তোমরা | সে সম্পর্কে

تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

মিথ্যারোপ করতে | তোমরা চলো | দিকে | ছায়ার (সেই) | বিশিষ্ট | তিন | শাখা

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ

না (যা) | শৈত্যদাতা | আর | না | রক্ষা করবে | থেকে | আগুনের শিখা | তা নিশ্চয় | নিক্ষেপ করবে

بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

স্ফুলিংগকে | প্রাসাদের ন্যায় | তা যেন | উট সমূহ | হলুদ বর্ণের | ধ্বংস | সেদিন

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ

মিথ্যারোপকারীদের জন্যে | (সেই) এই | দিন | না | তোমরাকথা বলবে | আর | না | অনুমতি দেওয়া হবে | তারেদকে

فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

তারা ওজর পেশ যে করবে

২৮. ধ্বংস সেই দিন অমান্যকারীদের জন্য অনিবার্য[৬]।

২৯. চলিতে থাক[৭] এক্ষণে সেই জিনেসের দিকে যাহাকে তোমরা মিথ্যা ও অসত্য মনে করিতেছিলে।

৩০. চল সেই ছায়ার পানে যাহা তিনটি শাখা[৮] সমন্বিত।

৩১. না শৈত্যদাতা, না আগুনের লেলিহান হলকা হইতে রক্ষাকারী

৩২. সে আগুন প্রসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করিবে।

৩৩. উহা লাফাইতে থাকিবে, মনে হইবে৷ যেন উহা হলুদ বর্ণের উষ্ট্র।

৩৪. ধ্বংস অনিবার্য সেইদিন অমান্যকারীদের জন্য।

৩৫. ইহা সেই দিন, যে দিন তাহারা কিছু বলিবে না,

৩৬. তাহাদিগকে কোনরূপ ওযর পেশ করারও সুযোগ দেওয়া হইবে না[৯]।

৬। অর্থাৎ যারা খোদার শক্তি-মহিমা ও জ্ঞান-কৌশলের বিস্ময়কর ক্রিয়াকান্ড দেখেও পরকালের সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করে, তারা নিজেদের এই খাম-খেয়ালীর মধ্যে নিজেরা মগ্ন থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু যেদিন তাদের ধারণার বিপরীত এ সব কিছু সংঘটিত হবে সেদিন তারা এ কথা জানতে পারবে যে, তাদের মূর্খতার জন্যে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে।

৭। পরকালের সত্যতার যুক্তিপ্রমাণ দেয়ার পর এখন জানানো হচ্ছে, যখন তা সংঘটিত হবে তখন সেখানে অমান্যকারীদের কি অবস্থা ঘটবে।

৮। ছায়া বলতে ধূঁয়ার ছায়া বোঝানো হয়েছে। তিনটি শাখার অর্থঃ-যখন খুব বৃহদাকার কোন ধূম্র-পিন্ড উত্থিত হয়, তখন উর্ধ্বে গিয়ে তা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হ'য়ে পড়ে।

৯। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা এরূপ মজবুত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তারা সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং তাদের জন্য নিজেদের অনুকূলে কোন ওযর-ওজুহাত পেশ করার কোন অবকাশই বাকী থাকবে না।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۳۷﴾ هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ

ধ্বংসে সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে এটা দিন ফয়সালার তোমাদেরকে আমরা একত্র করেছি

وَ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۳۸﴾ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ ﴿۳۹﴾

ও (তোমাদের) পূর্ববর্তীদেরকে যদি এখন হয়(সম্ভব) তোমাদের পক্ষে কৌশল কোন তবে কর তোমরা কৌশল

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۰﴾ اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِيۡ ظِلٰلٍ وَّ

ধ্বংসে সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে নিশ্চয় মুত্তাকীরা মধ্যে (হবে) ছায়ার ও

رکوع ۲ ২১

عُيُوۡنٍ ﴿۴۱﴾ وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿۴۲﴾ كُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـئًا

প্রস্রবণে এবং ফলমূল (পাবে) যা (তা) থেকে তারা চাইবে তোমরা খাও ও পানকর স্বাদ নিয়ে

بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِي الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۴۴﴾

যা বিনিময়ে তোমরা করতে আমরা নিশ্চয় এরূপে প্রতিফলদেই আমরা নেকলোকদের

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۵﴾ كُلُوۡا وَ تَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ

ধ্বংসে সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে তোমরা খাও ও আস্বাদন কর কিছুকাল তোমরা প্রকৃত পক্ষে

مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿۴۶﴾

অপরাধী

৩৭. ধ্বংস সেইদিন অমান্যকারীদের জন্য

৩৮. ইহা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়া যাওয়া লোকদিগকে একত্রিত করিয়া দিয়াছি।

৩৯. এক্ষণে তোমরা যদি আমার বিরুদ্ধে কোন কৌশল অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখ।

৪০. ধ্বংস সেই দিন আবশ্বাসকারাদের জন্য। রুকু' ঃ ২

৪১. মুত্তাকী লোকেরা আজ ছায়া ও প্রস্রবনে অবস্থান করিতেছে।

৪২. তাহারা যে ফলই চাহিবে (তাহাই তাহাদের নিকট উপস্থিত)।

৪৩. তোমরা খাও, পান কর স্বাদ লইয়া লইয়া, সেই সব কাজকর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতেছিলে।

৪৪. বস্তুতঃ আমরা নেক লোকদিগকে এই রকমেরই প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪৫. ধ্বংস এই দিন অমান্যকারীদের জন্য নির্ধারিত।

৪৬. খাইয়া লও[১০], আর স্বাদ আস্বাদন করিয়া লও কিছু কাল পর্যন্ত; প্রকৃতপক্ষে তোমরা অপরাধকারী।

১০। ভাষণের সমাপ্তিতে মাত্র মক্কার কাফেরদের নয়, বরং দুনিয়ার সমস্ত কাফেরদের সম্বোধন ক'রে . ক.. কা; হয়েছে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ

ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে এবং যখন বলা হয় তাদেরকে

ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

তোমরা অবনত হও না তারা অবনত হয় ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

তাহলে আর কোন কালাম (থাকতে পারে) পর তার (কুরআনের) তারা ঈমান (যার উপর) আনবে

৪৭. ধ্বংস এইদিন অমান্যকারীদের জন্য অবধারিত।

৪৮. ইহাদিগকে যখন বলা হয় যে, (আল্লাহর সম্মুখে) অবনত হও, তখন তাহারা অবনত হয় না।

৪৯. ধ্বংস এই দিন অবিশ্বাসীদের জন্য।

৫০. এক্ষণে এই (কুরআনের) পরে আর কোন্ কালাম এমন থাকিতে পারে, যাহার প্রতি ইহারা ঈমান আনিবে?

———— × ———— × ————

"সমাপ্ত"